বাংলাদেশের ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্ব (১৯৪৭-৭১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল, ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
শেখ মোঃ আমানুল্লাহ

Dhaka University Library
403510

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক সাঈদ -উর রহমান
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403510

এম, ফিল অভিসন্দর্ভ
ফেব্রুয়ারী ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

403510

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক শেখ মোঃ আমানুল্লাহ আমার তত্ত্বাবধানে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য **'বাংলাদেশের ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্ব (১৯৪৭-৭১)'** শিরোনামের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। এটি বা এর কোন অংশ পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

১১।৩।০৬

(অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান)

তত্ত্বাবধায়ক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ - কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্যে- উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ "বাংলাদেশের ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ১৯৪৭-৭১"- আমার ছয়বছরের পরিশ্রমের ফল।

২০০০ সালের মার্চমাসে আমি প্রথম বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফরের সাথে গবেষণা শুরু করি। নানা কারণে তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন করে ২০০৪ সালের অক্টোবরে অধ্যাপক সাঈদ- উর রহমানের তত্ত্বাবধানে পুনরায় গবেষণার কাজ শুরু করি। অধ্যাপক সাঈদ উর রহমানের সাহায্য ছাড়া আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক আহমদ কবির ও অধ্যাপক সৈয়দ অজিজুল হক তথ্য ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া বিশ্ববিদালয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের আব্দুল হাই স্মৃতি পাঠাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ আমাকে বই পুস্তক দিয়ে সহায়তা করেছে। আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-

ফেব্রুয়ারী- ২০০৬

শেখ মোঃ আমানুল্লাহ্

রেজিঃ ১৬/১৯৯৭-১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্রঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও থিসিসের অধ্যায় পরিকল্পনা।	১-৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাসাহিত্য শ্রেণীচেতনা	৬-১৪
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহ্য	১৫-২৯
চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের ছোটগল্পে শ্রেণী দ্বন্দ্ব (১৯৪৭-'৭১)	৩০-১২৯
উপসংহারঃ	১৩০-১৩৭
পরিশিষ্টঃ	১৩৮-১৪০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ; এবং থিসিসের অধ্যায় পরিকল্পনা

প্রথম রচিত বাংলা ছোটগল্প কোনটি তা নিয়ে একমত হওয়া সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' (১৮৭২) ও 'যুগলাঙ্গরীয়' (১৮৭৩) কে আধুনিক গল্পের ধারায় প্রথম প্রয়াস বলে কোন কোন সমালোচক মত দিলেও ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে রচনাটি আমরা প্রথমে পাই-সেটা ১৮৮০ সালে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতি'।[১]

উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলা ভাষায় ছোটগল্প রচনার মোটামুটি একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। একদিকে বঙ্গদেশের ইংরেজী শিক্ষিতরা পরিচিত ছিলেন বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে; অপরদিকে নতুনভাবে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজে আনয়ন করেছিল গতিশীলতা। শহুরে নতুন সমাজের সাথে যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন সেকালের সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তেমনিভাবে পদ্মা নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পারিবারিক জমিদারী দেখাশোনার জন্যে। পদ্মা নদীতে 'পদ্মা বোটে' জনজীবনের স্পর্শ তেমন পাওয়া না গেলেও ইছামতি, চিত্রা, গড়াই, করতোয়া- প্রভৃতি ছোট নদীতে চলাচলের সময় দুইতীরের হাসিকান্নায় মেশানো জীবন রবীন্দ্রনাথের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই বাস্তব ও কল্পনায় মেশানো ছোটগল্প রচনা করার প্রেরণা লাভ করেছিলেন তিনি। 'সোনার তরী' কাব্যের 'সূচনায়' তিনি লিখেছেন- "বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দর মহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদবোধন এনেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়।"[২]

বিদেশী ছোটগল্পের প্রভাব বাংলা ছোটগল্পে পড়েছিল ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদের সূত্র ধরে। একে আরো বেগবান করেছিল 'সাপ্তাহিক হিতবাদী', 'সাধনা', সবুজপত্র', 'ভারতী,' ইত্যাদি পত্রিকা।

বিশ্ব সাহিত্যে গোটা উনিশ শতক ধরে ছোটগল্প সৃষ্টির যে আয়োজনটি চলেছে পুরোদমে, রবীন্দ্রনাথ মাত্র শেষ দশকেই বাংলা ছোটগল্পের সে আয়োজনটি সম্পূর্ণ করলেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। এভাবেই বিশেষভাবে চিহ্নিত হলো ১৮৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায়-'ভারতী'- তে প্রকাশিত তাঁর 'ভিখারিণী' গল্পটি।

১। শ্রী ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প (কলকাতা: ১৯৬২), পৃ. ৪৮

২। রবীন্দ্ররচনাবলীঃ- তৃতীয় খন্ড (বিশ্বভারতী-১৩৭৬) সূচনা: "সোনারতরী"

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথকে অগ্রদূতের ভূমিকায় স্থান দিয়ে তার সমসাময়িক গল্পকাররা এগিয়ে চললেন 'কল্লোল' (১৯২৩), ' কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যে সব বিশিষ্ট ছোটগল্পকার বাংলা ছোটগল্প রচনা ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল তাঁরা হলেন ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) - (নবকথাঃ ১৮৯৯, ষোড়শীঃ ১৯০৬, দেশী ও বিলাতীঃ ১৯০৯, গল্পাঞ্জলিঃ ১৯১৩, গল্পবীথিঃ ১৯১৬, প্রভৃতি); ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) - ('ভূত ও মানুষ': ১৮৯৬, মুক্তামালাঃ ১৯০১, মজার গল্পঃ ১৯০৬, ডমরু চরিতঃ ১৯২৩ প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ)। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) - (চারইয়ারী কথা : ১৯১৩, নীল লোহিতের আদি প্রেম, ঘোষালের ত্রিকথা : ১৯১৭ প্রভৃতি); ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) - 'রিয়ালিষ্ট' ১৯৩৩; নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮১-১৯৪০) - (মিলন, হীরার মূল্য, ঘরের অলক্ষ্মী, পুজার পোষাক, ছোট বৌ, প্রতিশোধ প্রভৃতি); সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯ - ১৯২৯) - ('মঞ্জুষা' : ১৩১০, 'চিত্তরেখা' : ১৩১৭, 'চিত্রালী' :১৩২২ প্রভৃতি)।

দুই

রবীন্দ্রনাথ- পরবর্তী যেসব লেখক ছোটগল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গল্পকার, গল্প ও গ্রন্থের নাম এখানে দেওয়া হলো।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাদ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) - (বিলাসী, মহেশ, হরিচরণ, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, হরিলক্ষ্মী, মামলার ফল, রামের সুমতি প্রভৃতি),ইন্দিরা দেবী (১৮৮৯-১৯২২)- (খাতা, দুটি, রাজকন্যা, জ্যোতিঃহারা, মিলন- প্রভৃতি); রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)- গড্ডলিকা : ১৩৩১, কজ্জলী : ১৩৩৫, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প : ১৩৪৪, লঘুগুরু : ১৩৪৬, গল্পকল্প : ১৩৫৭, কৃষ্ণকলি : ১৩৪৪ প্রভৃতি), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-'৭৬) (-টুটা -ফুটা : ১৯২৮, ইতি : ১৩৩৮, অকাল বসন্ত :১৩৩৯, অধিবাস :১৩৩৯, কাঠ খড়-কেরোসিন : ১৩৫২, হাড়ি-মুচি-ডোম :১৩৫৫; বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)- (অভিনয়, অভিনয় নয় :১৯৩০, রেখাচিত্র :১৯৩১, অদৃশ্য-শত্রু :১৯৩৩,- প্রেমপত্র :১৯৭৯; প্রেমেন্দ্রমিত্র (১৯০৫-১৯৯৮৮)- (পঞ্চশর : ১৩৩৬, বেনামীবন্দর :১৩৩৭, পুতুল ও প্রতিমা :১৩৩৯, মৃত্তিকা :১৯৩২, নিশীথনগরী :১৯৩৮, মহানগর :১৯৪৩, মানিকবন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) - (অতসীমামী : ১৯৩৫, প্রাগৈতিহাসিক :১৯৩৭, মাটির মাশুল :১৯৪৮, ছোটবকুলপুরের যাত্রী :১৯৪৯, ফেরিওয়ালা :১৯৫৩, লাজুকলতা :১৩৬০, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০- ১৯৭৬) - (মেঘমল্লার :১৯৩২, মৌরীফুল :১৯৩২, যাত্রাবদল :১৯৩৪, বেনীগির ফুলবাড়ী : ১৯৯৪১, বিধুমাস্টার :১৯৪৫; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) - (ছলনাময়ী :১৯৩৬, জলসাঘর :১৯৩৭, দিল্লীকা লাড্ডু :১৯৪৩, মিছিল :১৩৭৬, রূপসী বিহঙ্গিনী :১৩৭৭ঃ জগদীশগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)- (বিনোদিনী :১৩৩৪, অঞ্জন শলাকা, রূপের বাহিরে :১৯২৯, শ্রীমতী :১৯৩০, উদয়লেখা :১৯৩২; বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) - (বনফুলের গল্প :১৯৩৬, বিন্দু বিসর্গ: ১৯৪৪, বাহুল্য ১৯৪৩, অদৃশ্যলোকে :১৯৪৬, অদ্বিতীয়া :১৯৭৫; অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-) (প্রকৃতির পরিহাস : ১৯৩৪, মনপবন :১৯৪৬, যৌবনজ্বালা ১৯৫০, কামিনী কাঞ্চন ১৯৫৪; শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) - (জাতিস্মর :১৯৩৩, ডিটেকটিভ

Dhaka University Institutional Repository

:১৯৩৭, চুয়াচন্দন :১৯৪২, কাঁচামিঠে :১৯৪২, কালকুট ১৩৫১; প্রমথনাথ বিশী (জন্ম -১৯০২-) (ভগবান কি বাঙলী, শিবুর শিক্ষানবিশী, ধনে পাতা), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) - (রানুর প্রথম ভাগ, হাসিও অশ্রু :১৩৬২), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)- (বনমর্মর :১৯৩২, নরবাঁধ :১৯৩৩, দেবী কিশোরী ১৯৩৪)।

তিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষে কম হয়নি। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ক্রমেই দানা বেধে উঠেছে- ভারত তথা বাংলায়। দেশের জনগণ তখন স্বাধীনতা অর্জনের উন্মাদনায় মত্ত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ কলকাতায় এসে পড়ল। জাপানী বোমা হামলার ভয়ে কলকাতায় শহর জনশূন্য হয়ে গেল। জনজীবন হলো বিপর্যস্ত । এই বিভীষিকাময় প্রেক্ষাপটে কিছু প্রতিশ্রুতিশীল গল্পকারের আবির্ভাব ঘটে। সেই সব গল্পকার, গল্প ও গল্পগ্রন্থের উল্লেখ করা হলো এখানেঃ সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)- (ফসিল :১৯৪০, গ্রাম যমুনা :১৯৪৪, জতুগৃহ :১৯৬২, নিকষিত হেম :১৯৬৩, রূপনগর :১৯৬৪;) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) - (রূপমতী :১৯৫৯, কালাবদর :১৩৫৫, গন্ধরাজ :১৯৫৭, শিলাবতী :১৯৬৪, ভাটিয়ালী :১৩৬৪, শুভক্ষণ :১৩৬৭), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২) - (বুটকি ছুটকি, বনের রাজা, নদী ও নারী, তারিণীর বাড়ীবদল, পালিশ, চশমখোর); সমরেশবসু - (১৯২৪-১৯৮৮) - (মরেছে প্যালগা ফর্সা, মরসুমের একদিন, অকালবৃষ্টি, ছেড়াতমসুক, রজকিনীপ্রেম, যৌবন, ধর্ষিতা প্রভৃতি)।

চার

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পূর্ববাংলা নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্গত হয় । কলকাতায় যেসব মুসলিম লেখক ছিলেন- তারা অনেকেই পূর্ববাংলায় চলে আসেন এবং তাঁদের সাহিত্যসাধনা অব্যাহত রাখেন। তাদের সাথে যুক্ত হয় এই অঞ্চলের নতুন প্রজন্মের নবীন সাহিত্যিকেরা। সাহিত্যের অন্য সব শাখায় বিচরণ করলেও ছোটগল্প রচনায় তাদের অবদান তুচ্ছ করার মত নয়। ওদের মধ্যে বিশিষ্ট ছ'জন হলেন -- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯১২-'৭১); শওকত ওসমান (১৯১৮-'৯৮); সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-'৮৬); আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩); আলাউদ্দীন আল আজাদ (জন্ম-১৯৩২) ও হাসান আজিজুল হক (জন্ম ১৯৩৯)।

এই গবেষণা মূলত এই ছয়জন গল্পকারের রচিত ছোটগল্পে বিধৃত শ্রেণীদ্বন্দ্ব নিয়ে। তাঁদের সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। এদের বাইরেও প্রতিষ্ঠিত, সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল অনেক গল্পকার আছেন। তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে উনিশ জন আলোচিত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। আমাদের গবেষণা সীমিত আকারের এবং বিশেষ দৃষ্টিকোণ অবলম্বিত বলে সবার আলোচনা আমরা করিনি। তবে তাদের নাম উল্লেখ করার মত। নিম্নে বিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেছেন তেমন কয়েকজন গল্পকার নাম এবং তাদের বিশিষ্ট গল্প গ্রন্থগুলোর নাম দেয়া হলঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)- (মাটির পৃথিবী :১৩৪৭, আয়ষা :১৩৫৮, শ্রেষ্ঠ গল্প :১৩৭১, মৃতের আত্মহত্যা :১৯৭৮);

২. আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮)- (জীবন :১৯৪৮, শেষ রাত্রির তারা :১৯৭৮, এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য :১৯৩৮, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা :১৯৭৮);

৩. আবু রুশ্‌দ - (জন্ম ১৯১৯)- (রাজধানীতে ঝড় :১৯৩৮, প্রথম যৌবন :১৯৪৮, শাড়ি বাড়ি গাড়ি :১৯৬৩, মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভান্ডার :১৯৮৫);

৪. সোমেন চন্দ (১৯২০-'৪২)- (সংকেত ও অন্যান্য গল্প :১৯৪২, বনস্পতি: ১৯৪৩);

৫. শাহেদ আলী (জন্ম- ১৯২৫)- (জিব্‌রাইলের ডানা :১৯৫৩, একই সমতলে :১৯৬৩, শা'নজর ১৯৮৬, অমর কাহিনী ১৯৮৭);

৬. আব্দুল হক (জন্ম - ১৯২৫) - (রোকেয়ার নিজের বাড়ী :১৯৬৭, ছিন্ন পত্রিকার কাহিনী :১৯৮১);

৭. শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬- ১৯৯৭) - (পথ জানা নেই :১৯৫৩, অনেক দিনের আশা :১৯৫২, ঢেউ :১৯৫৩, পুঁই ডালিমের কাব্য :১৩৭৮);

৮. হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) - (আরো দুটি মৃত্যু :১৯৭০);

৯. জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২) - (সূর্যগ্রহণ :১৩৬২);

১০. সৈয়দ শামসুল হক (জন্ম ১৯৩৫) - (শীত বিকেল :১৯৫৯, রক্ত গোলাপ :১৯৬৪, আনন্দের);

১১. মৃত্যু :১৯৬৭, প্রাচীন বংশের নি:স্ব সন্তান :১৯৮২, প্রেমের গল্প :১৯৯০);

১২. রাবেয়া খাতুন (জন্ম - ১৯৩৫) - (আমার এগারোটি গল্প :১৯৮৩, মুক্তি যোদ্ধার স্ত্রী :১৯৮৬);

১৩. শহীদ আখন্দ (জন্ম - ১৯৩৫)- (জনতায় নির্জন :১৩৮০, অনিবার্য বান্ধব :১৯৭৯);

১৪. আল মাহমুদ (জন্ম ১৯৩৬)- (পানকৌড়ির রক্ত :১৯৭৫, ময়ূরীর মুখ :১৯৯৪);

১৫. শওকত আলী (জন্ম- ১৯৩৬) - (উন্মুল বাসনা :১৯৬৮, লেলিহান সাধ :১৯৭৭, শুনহে লখিন্দর :১৯৮৬);

১৬. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (জন্ম ১৯৩৬) - (অবিচ্ছিন্ন :১৯৬০, দক্ষিণে :১৯৭০);

১৭. বশীর আল হেলাল (জন্ম ১৯৩৬) - (স্বপ্নের কুশীলব :১৯৬৭, প্রথম কৃষ্ণচূড়া :১৯৭২);

১৮. আব্দুল গাফফার চৌধুরী (জন্ম - ১৯৩৮) - (কৃষ্ণপক্ষ :১৩৬৬, সম্রাটের ছবি :১৯৫৯, সুন্দর হে সুন্দর :১৩৬৭);

১৯. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত (জন্ম - ১৯৩৯) - (দুর্বিনীত কাল :১৩৭২, বহেনা সুবাতাস :১৯৬৭);

২০. রাহাত খান (জন্ম - ১৯৩৯) - (অনিশ্চিত লোকালয় :১৩৮০, অন্তহীন যাত্রা :১৩৮২);

২১. রিজিয়া রহমান (জন্ম - ১৯৩৯) - (অগ্নি - স্বাক্ষরা :১৯৭৪)।

পাঁচ

পশ্চিম বাংলার এবং পূর্ব বাংলার তথা সমগ্র ছোটগল্পের ধারা নিয়ে কিছু আলোচনা এবং সমালোচনা হয়েছে। সাধারণভাবেও কোন কোন সমালোচক গ্রন্থ রচনা করেছেন ছোট গল্প নিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রীর জন্যে কেউ কেউ গবেষণা করেছেন। মোটামুটি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গবেষণা কর্মের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১. ড. সরোজমোহন মিত্র- 'ছোটগল্পের বিচিত্র কথা', (১৩৭১)। ১৪০৪ সালে বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প নামে প্রকাশিত হয়।

২. বীরেন্দ্র দত্ত - বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ ; (কলকাতা : ১৯৮৫)।

৩. শ্রীভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার । (কলকাতা : ১৯৬২), ।

৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়- কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের নব্বই বছর : ১৮৯১-১৯৮০। (কলকাতা : ১৯৮২)।

৫. আনোয়ার পাশা- রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা: দুই খন্ড - (ঢাকা: ১৩৭০)।

৬. উদয় চাঁদ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ঃ প্রেক্ষিত বাস্তবতা, । (কলকাতা: ১৯৯৬)।

৭. আজহার ইসলাম- বাংলাদেশের ছোটগল্প ঃ বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য। (ঢাকা: ১৯৯৬) ।

পিএইচ, ডি গবেষণার মধ্যে রয়েছে----

৮. ড. চন্দ্রাঘোষ সিন্‌হা - বিংশ শতাব্দীর ছোটগল্পে সমাজ বিদ্রোহ (১৯০১-১৯৮০), (১৯৯৩), কলকাতা।

৯. মোহম্মদ জাহিদ হোসেন- বাংলাদেশের ছোটগল্প ঃ জীবন ও সমাজ। (১৯৯৭), ঢাকা।

১০. খালেদা হানুম- বাংলাদেশের ছোটগল্প। (১৯৮৫), ঢাকা।

১১. সৈয়দ আজিজুল হক - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজ চেতনাও জীবনের রূপায়ণ। (১৯৯৮), ঢাকা। এম.ফিল গবেষণার মধ্যে রয়েছে দুটি:

১২. উৎপলেন্দু কীর্ত্তনীয়া- সুবোধঘোষের ছোটগল্প - (ঢাকা:২০০২)। (অপ্রকাশিত)

১৩. মিল্টন বিশ্বাস- তারাশঙ্করের ছোটগল্প - (ঢাকা : ১৯৯৮)। (অপ্রকাশিত)

ছয়

বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষকেরা ছোটগল্পকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন; তবে ছোটগল্পে বিধৃত শ্রেণীদ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে তেমন মনে হয় না। ড.চন্দ্রাঘোষ সিন্‌হা, ড. সৈয়দ আজিজুল হক এবং ড. সরোজ মোহন মিত্রের আলোচনা অনেকটা মার্কসীয় দৃষ্টির অনুসারী।

আমি এই গবেষণায় কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রতিফলন অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। আমার পরিকল্পিত অধ্যায় বিভাগ হচ্ছে নিম্নরূপ:

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যে শ্রেণীচেতনা।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহ্য।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্ব (১৯৪৭-'৭১)।

উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী-চেতনা

কোন সমাজ বা রাষ্ট্র শ্রেণীহীন নয়। সমাজের ভিতরেই থাকে বিভিন্ন শ্রেণী। শ্রেণী গড়ে ওঠে অর্থবিত্ত ও সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে। সাহিত্যে বিধৃত হয় সমাজ। সমাজে যেমন শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব থাকে–কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষে- তেমনি সাহিত্যেও শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়। লেখক সচেতন ভাবেই লেখেন আর অচেতন ভাবেই লেখেন, তাঁর রচিত সাহিত্যে শ্রেণীচেতনা অবশ্যই রূপায়িত হয়। কোথাও সেটা প্রচ্ছন্ন থাকে, কোথাও প্রত্যক্ষ হয়।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব সব সময় যে সম্পদের মালিকানার অথবা সমাজের আধিপত্য কায়েমের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে তা নয়। বিভিন্ন সময়ে সেটা বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। কখনও সংস্কৃতি-রক্ষার, কখনও রুটি–রুজি কামাই, কখনও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কখনও শিক্ষা লাভের সুযোগ অর্জন ইত্যাদি উপলক্ষ করে শ্রেণীবিদ্বেষ বা শ্রেণী লড়াই প্রকাশিত হতে পারে। সেগুলো অবশ্য উপলক্ষ, সর্বশেষ লক্ষ্য থাকে রাষ্ট্র বা সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা কুক্ষিগত করা।

'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস'। ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো'র এ অভিমতটি সমাজের উপরি-কাঠামোর বিভিন্ন শাখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। সাহিত্যের বেলাও সেটি মোটামুটিভাবে সত্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সাধারণভাবে তিন যুগে ভাগ করা যায়ঃ প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগের রচনা তেমন বেশী নেই, মাত্র পঞ্চাশটি পদ পাওয়া গেছে,- এগুলো চর্যাপদ নামে পরিচিত। চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্ব ও সাধন প্রণালী 'সন্ধ্যা-ভাষার' মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। সন্ধ্যা-ভাষার খোলস ভেদ করে প্রকৃত অর্থ বের করা সহজ নয়। তবুও তত্ত্ব কথার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সমাজের দু:সহ চিত্র দেখা যায়।

"টালত মোর ঘর, নাহি পড়বেসী,
হাড়ীত ভাত নাহি, নিতি আবেশী"[১]

এই চরণটি চর্যাপদের। ঢেন্ডন পার রচিত এ চরণটিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উদাহরণ নেই,কিন্তু শ্রেণী শোষণজনিত হতাশা, ক্ষোভ ও দু:খের পরিচয় আছে। চর্যাপদের এ চরণেও আভিজাত্যের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে–

নগর বাহিরিরে ডোম্ব তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাসি বামহণ নাড়িআ॥[২]

১। Dr. Muhammad Shahidullah: Buddhist Mystic Songs, (Dacca: Bengali Academy. 1966). ঢেন্ডন পাদানাম, পদসংখ্যা-৩৩।

২। পূর্বোক্ত, কৃষ্ণ পাদানাম, পদ সংখ্যা-১০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন যুগের পর আসে মধ্যযুগ। প্রচলিত ইতিহাস বইয়ে ১২০১ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত বিস্তৃত ছয়শত বছরকে মধ্যযুগের আওতায় রাখা হয়েছে। সেই সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য কবি, রচিত হয়েছে নতুন নতুন আঙ্গিকের সাহিত্য- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শূন্যপুরাণ, চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, বৈষ্ণব পদাবলী, রোমান্স কাব্য প্রভৃতি। সবগুলিই ধর্মবিষয়ক রচনা কিন্তু ধর্মের আবরণের মধ্য দিয়ে শ্রেণীচেতনার উপস্থিতি আবিষ্কার করা তেমন কঠিন নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নামে অসহায় ও নিম্ন শ্রেণীর গোপবালাদের উপর যৌন নির্যাতন করেছে। কৃষ্ণের অত্যাচার প্রতিরোধে অসমর্থ রাধা মর্মভেদী আর্তনাদ করে বলেছে-

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥[৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমসাময়িককালে রামাই পণ্ডিতের লেখা 'শূন্যপুরাণ'- এর অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক কবিতায়- বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 'সদ্ধর্মী'দের উপর জাজপুর, উড়িষ্যা ও মালদহবাসী- 'বৈদিকব্রাহ্মণ'দের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মালদহে লাগে কর, নাচিনে আপন পর
জালের নহিক দিশপাশ।
কনিষ্ঠ হইয়া বড়, দশ বিশ হৈয়্যা জড়,
সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ !!
বেদ করি উচ্চারণ, বেব্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনা কে করে প্ররিত্রাণ!![৪]

নির্যাতনের মুখে বৌদ্ধরা তাদের উপাস্য নিরঞ্জনের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে। তাদের কাতর আবেদনে নিরঞ্জন বিচলিত হলেন এবং ব্রাহ্মণদের শাস্তি দেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর ইঙ্গিতে আকাশের দেবতারা হযরত মোহাম্মদ, পয়গম্বর, আদম, কাজী ও ফকীর প্রভৃতি রূপধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় এবং ব্রাহ্মণদের ধবংস করে।

ব্রহ্মা হৈলা মহাম্মদ বিষ্ণু-হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হইলা শূলপানি।
গণেশ হইলা গাজী কার্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা জথ মুনি।।
তেজিআ আপন ভেক, নারদ হইলা শেক,
পুরন্দর হইলা মলনা।[৫]

৩। বড়ু চন্ডীদাস-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (দান খন্ড)। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত (কলকাতা: দ্বিতীয় সং-১৩৪২), পৃ. ৪১।

৪। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত-শূন্যপুরাণ- (কলকাতা;১৯৭৭), পৃ.১৫৯-৬০

৫। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মনসামঙ্গলকাব্য একান্তভাবে পূর্ববাংলার নিজস্ব সাহিত্য। কোনো কোনো আলোচক একে মধ্যযুগের বাংলাদেশের জাতীয় কাব্য বলেও অভিহিত করতে চান। এই কাব্যের পুরোটাই বলতে গেলে দ্বন্দ্বনির্ভর, সেই দ্বন্দ্ব আধিপত্যকামী মনসার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর নেতা বণিক চাঁদ সওদাগরের। সেই দ্বন্দ্বে চাঁদ সওদাগরের যে ক্ষতি হয়েছে তা অভাবনীয়। শেষপর্যন্ত বা-হাতে মনসাকে ফুল দিয়ে চাঁদ সওদাগর আত্মরক্ষা করেছে, কিন্তু তার মহিমা হয়েছে অভ্রভেদী।

মধ্যযুগে রচিত মুকুন্দরামের কবিতায়ও জীবন-জীবিকার চিত্র পাওয়া যায়। "তৈল বিনা কৈলু স্নান, করিলু উদক পান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে"- এ কবিতায় তেলসহ বা তেল মেখে গোছল করার একটা বাসনা আছে। ভাতের জন্য শিশু কাঁদছে, ক্ষুধা নিবারণ করছে জল পান করে,–এগুলো পরোক্ষভাবে শ্রেণী নিপীড়নকে নির্দেশ করে।

আর দ্বন্দ্ব আছে বলেইতো শিশু কাঁদে ওদনের (অন্ন) তরে' –প্রভৃতি অপ্রাপ্তিসুলভ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্পষ্টভাবে অন্ন-সংস্থানের বিষয়টি সাহিত্য বিশিষ্ট স্থান নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'–উচ্চারণ করে, ঈশ্বরী পাটুনী দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছে। ঈশ্বরী পাটুনীর আর কিছুর দরকার নেই। সন্তানের দুধভাতের নিশ্চয়তাই তাঁর বড়ো চাওয়া-পাওয়া। এখানেও দুধভাতের নিশ্চয়তা কামনা থেকে অন্ন-ঘাটতির বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। অন্নের ঘাটতি যে শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে হয়েছে তা সহজে অনুমান করা যায়।

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালে রচিত হয়েছে 'রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যে'র শিবায়ন কাব্য। কাব্যটি শিবের মাহাত্ম্যপ্রচারের কাহিনী নিয়ে রচিত। সেখানে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠানোর প্রাক্কালে জামাতার হাত ধরে শাশুড়ীর যে অনুরোধ তা যেমনই মর্মস্পর্শী, তেমনি শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর অধিপতি শ্রেণীর নির্যাতন-শোষণের অতি বিশ্বস্ত দলিল।

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি
কন্যার শতেক দোষ ক্ষমা কর তুমি
হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও প্যাট ভরা ভাত
পীরিতি কইরো যেন জানকী রঘুনাথ।[৬]

এখানে দেখা যাচ্ছে সন্তানের জন্য দুধভাত নয়, মাতা মেয়ের জন্য কামনা করেছেন, এমন একটি শাড়ী, যা হাঁটুর নীচ পর্যন্ত যায়, এবং ক্ষুধায় পেট ভরে খেতে পারে, তেমন প্রয়োজনীয় ভাত। এখানে শ্রেণীদ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু আছে শ্রেণী দ্বন্দ্বজাত শোষিত শ্রেণীর মর্মভেদী আর্তনাদ ও তার নিঃসংশয় চিত্র। সে অবস্থায় প্রতিরোধ কিংবা প্রতিহত করা অবশ্যই জরুরী ছিল, কিন্তু শত শত বছর ধরে শ্রেণীপীড়িত মানুষ এমন অবস্থায় গিয়েছিল যে, প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তার ছিলো না। শুধু ছিল অশ্রুজলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ও আর্তনাদ করা।

Dhaka University Institutional Repository

এইখানে শেষ হয়ে গেল আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীপীড়নের আলোচনা। কিন্তু কথার পিঠে কথা আসে। ওইকালে একদিকে চলছিল ধর্মকেন্দ্রিক লিখিত সাহিত্যের চর্চা,এর পাশাপাশি নিস্তরঙ্গ পল্লী জীবনে ছিলো মুখে মুখে রচিত-প্রেম, ভালবাসা, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে রচিত স্বল্পালোকিত লোক সাহিত্যের একটি ধারা। দীনেশচন্দ্র সেন সেই সব সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যে একটি প্রায় হারিয়ে যাওয়া জগতকে উদ্ধার করেছেন। সেখানে আছে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, রূপবতী, কাজল রেখা, দেওয়ানা মদিনার কিস্‌সা। কোন কোন পালায় লেখকের অজ্ঞাতসারে ধরা পড়েছে শ্রেণীচেতনার বিশ্বস্ত চিত্র। দেওয়ানা মদিনা পালার এ স্তবকটিতে শ্রেণী চেতনার রূপ ধরা পড়েছে। .....

-'শুনিয়া আলাল কয় 'শুন দুলাল ভাই'।
তালাক্‌নামা লেখ্যা গেলে অধর্ম্ম কিচু নাই।।
জাতি নাই-সে থাকে আর এইখানে থাকিলে-
কিসের সংসার কও জাতি না রহিলে।।
.....
দেওয়ানগিরি কর্‌্যা তারার সুখে দিন যায়।
দিন ফির্‌্যাছে আল্লা কইরাছে উপায়।[৬]

উপরিউক্ত চরণে যে শ্রেণীচেতনা প্রকাশ পেয়েছে, সেটা 'দেওয়ানা মদিনা'র কাহিনী আলোচনা করলেই অনুমান করা যাবে। এক দেওয়ানের দুই বেটা ছিল- আলাল দুলাল। দুই বেটা রেখে মা মারা যায়।

দেওয়ান পুনরায় বিয়ে করলে দেওয়ানের নতুন স্ত্রী ছেলে দুটোকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। ভাগ্যচক্রে তাঁরা প্রাণে বেঁচে যায়। দুলাল পালিয়ে গিয়ে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নেয় ও গৃহস্থের কন্য মদিনাকে বিয়ে করে। আলাল- দুলালের সন্ধান পেয়ে গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে দুলালের স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে-নিজেদের দেওয়ানী রক্ষা করার জন্য। শেষপর্যন্ত দুলাল দেওয়ানী রক্ষা করল মদিনাকে তালাক দিয়ে বাড়ি ফিরে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের ১৭৬০ সালে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ সমাপ্ত হয়। তারপরও চল্লিশ বছর ধরে বিভিন্ন জাতীয় কাব্য রচিত হয়েছে। নাম করা যায়-'কবিওয়ালা' ও 'শায়ের'দের রচনা। এগুলো অবক্ষয়ের প্রমাণ ও পরিণতি ধারণ করেছে। উনিশ শতকের শুরু থেকে সাধারণভাবে ধরা হয়- আধুনিক কালের সূত্রপাত। ১৮১৫ সালে রাজা রামমোহন রায়'র কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করা থেকে আধুনিককালের সূত্রপাত হয় বলে কারো কারো ধারণা।

৬। মৈমনসিংহ গীতিকা শ্রীদীনেশচন্দ্রসেন কর্তৃক সঙ্কলিত। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:১৯৭৩), পৃ. ৩৭৬-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ধরনের সাময়িকপত্র প্রকাশ, সর্বোপরি ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বাংলা গদ্যরচনা শুরু, আধুনিকতার দিকে অগ্রসরের পথে এক একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই সময় থেকে ঊনিশ শতকের তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত যে ভাবাদর্শ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে নবজাগ্রত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে ও বহুকাল ধরে শক্তি সঞ্চয়কারী প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-শ্রেণীটির বিবাদ ও সংঘর্ষ। নতুন শ্রেণীটি চাচ্ছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মূল্যবোধের আলোকে স্বীয় সমাজের সংস্কার করা-বহুবিবাহ রোধ,বিধবা বিবাহের প্রচলন, সতীদাহপ্রথা বিলোপ, পৌত্তলিকতা দূর করা প্রভৃতি।

এ সময়ে নব্য ইংরেজি শিক্ষিত অগ্রসর শ্রেণীটির সাথে প্রতিষ্ঠিত ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন-শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের বিষয়গুলোকে শ্রেণীচেতনা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী-চেতনার বিশ্লেষণে রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২ -১৮৮৬) প্রথম রচিত গ্রন্থ 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৪) কে স্মরণ করতেই হয়। এ গ্রন্থে তিনি সেকালের নারী সমাজের দুর্গতি ও তার প্রতিকার কামনা করেছেন। তবে তাঁর বিখ্যাত প্রহসন 'কুলীন- কুল সর্বস্ব' (১৮৫৪)। এই প্রহসনের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি-সমাজ সংস্কার মূলক সাহিত্য রচনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বল্লাল সেনের আমল থেকে চলে আসা বহুবিবাহ নামক কুপ্রথাকে রামনারায়ণ তর্ক রত্ন- 'কুলীন কুল সর্বস্ব'তে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে 'ফুলকুমারীর বৃত্তান্ত' অংশে কুলীন স্বামীর অর্থগৃধনুতার প্রতি ফুল কুমারীর নারী হৃদয়ের বেদনা ও জিজ্ঞাসা, শ্রেণীচেতনায় ভাস্বর বলে মনে হয়।

'কুল পালকের' চার কন্যার একসাথে বুড়ো বরের সথে বিয়ের আয়োজন ও কন্যাদের প্রতিবাদ- "কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ?"- শ্রেণী চেতনাকে প্রকট করেছে। এখানে কন্যাদের কটাক্ষ ও বিশেষ ভাবে চিহ্নিত কর যায়। - "ও মা, তুই কি কুল রক্ষা কর্ব্যি , তবে জাতি রক্ষা কে কর্ব্যে মা।" কৌলীন্যের দোহায় দিয়ে কিশোরীকে ষাট বছরের, কানা, বধির - বৃদ্ধ বরের সাথে বিয়ে দেয়ার আয়োজন কতই না হাস্যকর!

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' প্রহসনের সূত্র ধরে পরবর্তী কালে শ্রেণীচেতনার প্রকাশ ঘটেছে মাইকেল মধুসুদন দত্তের (১৮২৪-'৭৩) 'একেই কি বলে সভ্যতা ' (১৮৬০), বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)। দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-'৭৩) 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) মীর মশাররফ হোসনের (১৯৪৭-১৯১২)- 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) প্রভৃতি প্রহসন ও নাটকে ।

'একেই কি বলে সভ্যতা' - য় কলকাতা শহরকেন্দ্রিক ইয়ংবেঙ্গলদের ইংরেজীয়ানা ও আত্মঅহমিকার আস্ফালন শ্রেণীবিভেদেরই নামান্তর। কলকাতা নগরকেন্দ্রিক সমাজের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে এখানে।

'বুড় শালিকের ঘাড়েরোঁ' তে কলকাতার বাইরে পল্লী সমাজের ভন্ডামী ও অনৈতিকতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামীণ সমাজে ধর্মের আবরণে যে নৈতিক ব্যভিচার ও শোষণ, নির্যাতন চলে তার জ্বলন্ত

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত এ প্রহসনটি। শুধু যে ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে মিথ্যা অহঙ্কার জেঁকে বসে ছিল তা নয়, সমাজের সর্বত্রই তখন উঁচু-নিচু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়া চলছিল।

'নীলদর্পণ' নাটকে শ্রেণীচেতনা প্রকট আকারে প্রতিফলিত হয়েছে। ভূস্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দুর্ভাগা, অসহায় কৃষকেরা নীলচাষ বন্ধ করে দেয়। নীলকরদের অত্যাচারের দৃশ্য এ নাটকের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে 'তোরাপ' চরিত্রের মধ্যে সে নির্যাতনের নমুনা বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।- "ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না"

'তোরাপের' ওই উক্তিতেও শ্রেণীচেতনা প্রকাশ পেয়েছে। 'জমীদার দর্পণ' নাটকে তৎকালীন সমাজের ভূস্বামীদের অত্যাচারের কাহিনী বি ধৃত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' বিদেশী শাসক ও নীলকরদের অত্যাচার- নির্যাতনের চিত্র ব্যক্ত হলেও 'জমীদারদর্পণ' নাটকে এদেশীয় জমিদারদের অত্যাচার প্রাধান্য পেয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় জমীদার দর্পণ নাটকে শ্রেণীচেতনা ও দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে।

লম্পট জমিদার - 'হায়ওয়ান আলী' - আবুমোল্লার যুবতী স্ত্রীকে জোরপূর্বক সম্ভোগ করতে চায়। আবুমোল্লার স্ত্রী নূরুন্নাহার জীবন দিয়ে রক্ষা করেছে তাঁর সতীত্ব। জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা হলেও সাক্ষীদের বশ করে জমিদার মামলা থেকে রেহাই পায়। তাছাড়া এনাটকে সাধারণ কৃষকদের জমিদারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার ঘটনা - শ্রেণীচেতনারই ইঙ্গিত দেয়।

বাংলা উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়- প্যারিচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহে'র (১৮৪০-১৮৭০) হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২), ইত্যাদি রচনায় সমাজের অসঙ্গতি ও বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে, যুগধর্মের চাহিদায় এ শ্রেণীচেতনা পরোক্ষ অবস্থা থেকে প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)বিড়াল, বঙ্গদেশের কৃষক-প্রবন্ধে ও 'সাম্য' গ্রন্থে শ্রেণীবৈষম্যের উল্লেখ করেছেন। 'বিড়াল' প্রবন্ধে-বিড়ালের কথা -"ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচমত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"[৭]

'বঙ্গদেশের কৃষক' - প্রবন্ধেও শোষক শ্রেণীকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে। -"দেশ শুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল না সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহার ও নিষ্প্রোজনীয় ধন নাই, সে ভাল?" [৮]

---

৭ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বিড়াল", 'কমলাকান্তের দপ্তর', বঙ্কিম রচনাবলী- ২য় খন্ড, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৪); পৃ. ৮৭।

৮ পূর্বোক্ত, বঙ্গদেশের কৃষক, পৃ. ৩১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮১) উপন্যাস - ইতিহাসের আলোকে রচিত। রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনের ট্র্যাজেডিই প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। প্রতাপাদিত্যকে বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্র রূপে দাঁড় করানোর অভিপ্রায় ছিল তাঁর। অত্যাচারী, নিষ্ঠুর দিল্লীশ্বর কে উপেক্ষা করার মত সাহসী ভূমিকা, প্রতাপাদিত্য চরিত্রকে মহিমা দান করেছে। তাছাড়া রাজা প্রতাপাদিত্যের 'যবন বিদ্বেষ' ও শ্রেণী চেতনায় উজ্জ্বল হয়েছে বলা যায়।

'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনীতে হিংসা -অহিংসার মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সূত্রে নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব বিধৃত হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের শাক্ততন্ত্রের ক্রূর দিকটাকে এখানে কটাক্ষ করা হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মের দোহাই দিয়ে করা - 'বলিপ্রথা' র বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রতিবাদ করে, হিন্দু ধর্মের আচারনিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। 'পূজারিণী' কবিতার মতো এখানেও রবীন্দ্রনাথ মানব মহিমাকে অহিংসার চূড়ায় নিয়ে গেছেন। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রাঙ্কনে 'রাজর্ষি'র প্রারম্ভেই তা ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

"কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? ---- শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সমগ্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহন করো, সহস্রলোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণীসচেতন কবি না হলে ও তার কিছু কবিতায় শ্রেণীচেতনার প্রকাশ ঘটেছে।-

ক. এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কা ঙালের ধন চুরি!! (দুইবিঘা জমি)

খ. এই সব মূঢ় ম্লান-মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা। (এবার ফিরাও মোরে)

এ ছাড়া ও সমকালে রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাসের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।-----

শরৎচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়ের - 'পল্লী সমাজ' (১৩২২), দেনা পাওনা (১৩২৭), পথের দাবী (১৯২৬),
গোপাল হালদারের - একদা (১৩৩৯), অন্যদিন (১৯৫০), পঞ্চাশের পথ (১৯৪৪);
বনফুলের - দ্বৈরথ (১৩৪৪); জগদীশগুপ্তের - 'লঘুগুরু' (১৩৩৮) মহিষী (১৯২৯), রোমন্থন (১৩৩৮), তাতল সৈকতে (১৩৩৮); তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের- 'ধাত্রী দেবতা' (১৩৪৬), কালিন্দী (১৩৪৭),গণদেবতা (১৩৪৯), সন্দীপন পাঠশালা (১৩৫২), পদচিহ্ন (১৩৫৭) 'হাসুলিবাঁকের উপকথা (১৯৪৭); নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের - পদসঞ্চার (১৩৫২), অমাবস্যার গান (১৩৫৭); মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের - পদ্মানদীর মঝি (১৯৩৮); সতীনাথ ভাদুড়ীর -(১৯০৬-'৬৫) জাগরী (১৯৪৫); কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) -মৃত্যুক্ষুধা (১৯৭১) সত্যেন সেনের - (১৯০৭-১৯৮১) -'পদচিহ্ন' (১৩৭৫), 'উত্তরণ' (১৯৭০) 'মা' (১৯৭০)শওকত ওসমানের (১৯১৭-'৯৮) -'বনি আদম' (১৯৪৩), 'জননী' (১৯৬১), 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬৩); সরদার জয়েনউদদীনের (১৯১৮-'৮৬)-'আদিগন্ত'

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৫৯) 'অনেক সূর্যের আশা' (১৯৬৭), শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৬-'৭১) -'সারেং বৌ'-(১৯৬২) 'সংশপ্তক' (১৯৬৬); শামসুদদীন আবুল কালামের (১৯২৬-'৯৭)- 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) 'আলমনগরেরউপকথা ' (১৯৫৫); আবু ইসহাকের – (১৯২৬-২০০৩) 'সূর্যদীঘল বাড়ি' (১৯৫৫)আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) 'সূর্য তুমি সাথী' (১৯৬৭)।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কাব্যে শ্রেণীচেতনা প্রকাশিত হয়।- (কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'প্রলয় শিখা' (১৯৬০), 'ঝড়' (১৯৬০) প্রভৃতি কাব্য রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত হলেও শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে।- 'অগ্নিবীণা'র -'আগমনী', 'রক্তাম্বর ধারিণী মা', ধূমকেতু', কমাল পাশা', রণভেরি', কবিতার মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামী শক্তির উথ্থান কামনা করেছেন। বিশেষ করে 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে চেতনা আরো বেগবান হয়েছে।-

"আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবেহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে।
মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত- আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত - আমি সেইদিন হব শান্ত।"

বিষ্ণুদের (১৯০৯-১৯৮), পূর্বলেখ (১৯৪১), সাতভাই চম্পা (১৯৪৫) কাব্যে মার্কসবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের বৈষম্যের অবসান হবে।

"দীপ্ত বিশ্বজয়ী! বর্শা তোলো। কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠা পড়া? চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি?
হৃদয়ে আমার চড়া?.....
হলকা হাওয়ায় হৃদয়ে আমার ধরো হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত
ঘোড়সওয়ার"। (ঘোড়সওয়ার, চোরাবালী)।

সমরসেন (১৯১৬-'৮৭) এর নিজের কথা -"আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্কসিস্ট"। কবিতায় তার প্রমান দিয়েছেন। --

"শুনছি ধর্মঘটে করপোরেশন বেহাল
কলেরা বসন্ত প্লেগের আসন্ন উৎসব"। ('ব্রতচারী, নানা কথা)
"সমজে মধ্যপদ ধীরে ধীরে লোপ পায় বণিকেরা প্রাকার বানায়,
দিনে দিনে চক্রবৃদ্ধি হারে
নিরন্ন বেকারের মজুরের ভিখিরির সংখ্যা বাড়ে"।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় - (জন্ম - ১৯১৯)- বিষ্ণুদে, সমরসেনদের মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধু চেতনায় মার্কসিস্ট ছিলেন না। মার্কসবাদী দলের কর্মীও ছিলেন। কবিতায় তার প্রতিফলন দেখা যায়।--

"হাত পাতবে কার কাছে কে - গাঁয়ে সবার দশা এক
তিন সন্ধ্যে উপোষ দিয়ে খাচ্ছি ক'দিন বুনোশাক। (চিরকুট, চিরকুট)

Dhaka University Institutional Repository

"প্রভু, যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোন দ্বিরুক্তি করব না;
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক। (প্রস্তাব, পদাতিক)

"শানানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে সোজা জিঙ্গাসা
দুশো বছরের রক্ত শুষেও মেটেনি পিপাসা?" (জবাব চাই', চিরকুট)

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-'৪৭) কম্যুনিস্ট পাটির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন । - " আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি কেননা এই দলবল বাড়তে বাড়তে একদিন এ দেশের অধিকাংশ হবে।" ১ ড. অনিক মাহমুদ সুকান্তকে 'শ্রেণীচেতনার দীপ্তরানার' বলে অভিহিত করেছেন।২ তাঁর কিছু শ্রেণীচেতনামূলক কবিতা উল্লেখ করা হলো।--

ক. "আমি এক ক্ষুধিত মজুর, আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু, একলাপথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।" (শত্রু এক, ছাড়পত্র)

খ. রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা বয়ে ?
কি হবে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে? (রানার, ছাড়পত্র)

৯.। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সুকান্ত - সমগ্র, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

১০। অনীক মাহমুদ :আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, প্রথম প্রকাশ –১৯৯৫, প্রকাশক সামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী , ঢাকা। পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহ্য

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের সার্থক প্রবর্তক। কবিতার মতো লিরিকধর্মিতা তাঁর ছোটগল্পেও লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ প্রসিদ্ধ গল্প রচিত হয়েছিল ১২৯৮ থেকে ১৩১০ সালের মধ্যে। সে সময়ে তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গে, জমিদারী-দেখাশোনার কাজে। ঠাকুর বাড়ির গন্ডি ছেড়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন অদৃষ্টপূর্ব পরিবেশে-পদ্মা, গড়াই, ইছামতি, যমুনা, বড়াল, চিত্রা বিধৌত সাধারণ মানুষের জনপদে। উপভোগ করলেন প্রকৃতি-লালিত নদনদী- বিধৌত কোলাহল-মুখরিত জনপদকে। সাধারণ মানুষ সরাসরি এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। কবির অজ্ঞাতসারে বদলে গেল তাঁর জীবনবোধ ও সমাজচেতনা। বিরতিহীনভাবে তিনি লিখে চললেন কবিতা, কাব্যনাট্য, ছিন্নপত্রাবলী, সর্বোপরি ছোট গল্প।

১২৯৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প পোষ্টমাষ্টার। তার পূর্বে তিনি রচনা করেছিলেন পাঁচটি গল্প-ভিখারিণী (১২৮৪) করুণা (১২৮৫) ঘাটের কথা (১২৯১) রাজপথের কথা (১২৯১) ও মুকুট (১২৯২)। অর্থাৎ আট বছরে পাঁচটি গল্প। কিন্তু পূর্ববঙ্গে আগমনের পর গল্প লেখায় যেন বান ডাকল। ১২৯৮ সালে এগারটি, ১২৯৯ সালে বারটি, ১৩০০ সালে সাতটি, ১৩০১ সালেও সাতটি, ১৩০২ সালে ছয়টি, তারপর দুই বছর কোন গল্প নেই, আবার ১৩০৫ সালে ৭টি এবং ১৩০৭ সালে ৫টি প্রকাশিত হয়।[১]

এই নয় বছরের মধ্যে রচিত হয়েছিল ৫০টি গল্প। তারপরেও বিভিন্ন সময়ে তিনি গল্প লিখেছেন। সবশুদ্ধ তাঁর রচিত ছোট গল্পের সংখ্যা ৯৫টি। এগুলির মধ্যে পনেরটি গল্পে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের লাল রং কিছুটা লেগেছে। সেগুলি হল পোষ্টমাষ্টার (১২৯৮), দেনা পাওনা (১২৯৮), ত্যাগ (১২৯৯), খাতা (১৩০০), শাস্তি (১৩০০), মেঘ ও রৌদ্র (১৩০১), মানভঞ্জন (১৩০২), রাজটীকা (১৩০৫), নষ্টনীড় (১৩০৮), হৈমন্তী (১৩২১), হালদারগোষ্ঠী (১৩২১), স্ত্রীর পত্র (১৩২১), চিত্রকর (১৩৩৬) ও রবিবার (১৩৪৬)।

'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে শ্রেণীচেতনার প্রকাশ পেয়েছে অনেকটা প্রচ্ছন্ন অবস্থায়। আবাল্য কলকাতায় বেড়ে উঠা পোষ্টমাষ্টারের গণ্ডগ্রামের নির্বান্ধব পরিবেশের দুঃখ বহুলাংশে কেটে গিয়েছিল বারো-তেরো বছরের অনাথা গ্রাম্য বালিকা-রতনের উপস্থিতিতে। রতন ঘরের কাজে সাহায্য করত। পোষ্টমাষ্টারের অসুখে নার্স ও বোনের ভূমিকা পালন করেছিল। চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে কলিকাতায় ফিরে যাবার সময়ে নিরাশ্রয় রতন বলেছিল, "দাদা বাবু আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে"? দাদা বাবুর উত্তর দিতে দেরী হয়নি। হেসে বললেন-'সেটা কী করে হবে'!

১। গল্পগুচ্ছের পরিশিষ্ট থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারটা কি কি কারণে অসম্ভব সেটা তিনি বালিকাকে বোঝানো আবশ্যক বোধ করলেন না। অবশ্য রেখে যাওয়া বালিকাটির জন্য প্রবল মমতা ও করুণা একবার তার মনে জেগেছিল। একবার ভেবেছিলেন তাকে নিয়ে যাবেন, কিন্তু পরক্ষণেই করুণা ও সহানুভূতি উবে যায়। নদীর প্রবল স্রোত তথা প্রকৃতি তাঁর পাশে দাঁড়ায়, দর্শন চিন্তাও সহায়ক হয়। 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ-কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী! পৃথিবীতে কে কাহার'।

১৮৯৪ সালের ২৭ জুন শিলাইদহ থেকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন "আজকাল মনে হচ্ছে যদি আমি আর কিছুই না করে ছোটগল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি, এবং কৃতকার্য হতে পারলে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। ..... আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনা রাজ্যে অবতরণ করা গেছে"[২]।

মেঘ ও রৌদ্র

গিরিবালা মেঘ ও রৌদ্র গল্পের প্রধান চরিত্র। আর অপর প্রধান চরিত্র শশিভূষণ-এম.এ. বি.এল। মূলত শশীভূষণই গল্পের আগাগোড়া জুড়ে আছে। সে ওকালতি পাশ করছে অথচ আইন ব্যবসায় তার কোন উৎসাহ নেই। কিন্তু আত্মসম্মানবোধ ও জাতীয়তাবোধ তার মধ্যে অত্যন্ত প্রখর। তিনি পর পর তিনটি মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং সেগুলো জাতিগত মান-সম্মানের প্রশ্নকে ঘিরে। একটিতে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, আর একটিকে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, তৃতীয়টিতে ষ্টিমার কোম্পানীর ম্যানেজার ছিল বিবাদী।

বাদী ছিল দেশের তিনজন ব্যক্তি, একজন জমিদারের নায়েব, আরেকজন মহাজন। তিনটাতেই বিবাদীরাই অপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকলেও তাদের ভয়ে কেউই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে যায়নি। বরং নানাভাবে শশিভূষণের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। শশিভূষণ শুধু ব্যর্থ হয়নি তাকে জেলেও যেতে হয়েছিল সে কারণে।

লেনিন লিখেছেন-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজই ভারতবর্ষ দখল করেছিল। শশিভূষণ এদের বিরুদ্ধে তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে নেমেছিল। এবং বলার অপেক্ষা রাখে না আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার মামলার গুণ থাকা সত্ত্বেও সে হেরে যায়। শেষপর্যন্ত এই আত্মসম্মান ও জাতীয় সম্মানবোধ- সাম্রাজ্যবাদী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে হেরে যায়। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ তেমন বোঝেননি তা নয়, তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন আকার ইঙ্গিতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তিনি শ্বেতাঙ্গ আমলার বিরুদ্ধে দেশের জনগণের প্রতিবাদ নিয়ে গল্প লিখেছেন –কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা ক্ষমতাসীন পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ইংরেজের অনুগ্রহে সৃষ্ট মধ্যবিত্তের আইনবিশারদ দেশী উকিলের লড়াই। এই করুণ পরিণতি সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় লোকের নিন্দনীয় ভূমিকা উপসংহারকে করুণ করে তুলেছে।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: (ছিন্নপত্র, বিশ্ব ভারতী-১৩৭৫) পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

হালদারগোষ্ঠী

'হালদার গোষ্ঠী' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প। জমিদার মনোহরলালের দুই ছেলে–বনোয়ারীলাল ও বংশীলাল। বনোয়ারীলাল অনেকদিন বিয়ে করেছে কিন্তু তার কোন সন্তান নেই। ফলে জমিদারী শেষমেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কার হাতে গিয়ে পড়বে সেই ভেবে সবাই উদ্বিগ্ন ছিল। এ গল্পে আছে "ভাগ্যদেবতা মাঝে মাঝে 'অসঙ্গত' কিছু সৃষ্টি করে যার ফলে সমাজে 'নাট্যলীলা' জমিয়া উঠে সংসারের দুই কূল ছাপাইয়া হাসি কান্নার মধ্যে তুফান চলিতে থাকে"। এই গুনটি বনোয়ারীলালের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আছে। সে জমিদার নন্দন কিন্তু জমিদার পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলি তার মধ্যে নেই। সে মধু কৈবর্ত্যকে নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে যায়, নায়েব নীলকণ্ঠকে জেলে ঢোকায়, মধূ কৈবর্ত্যকে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করতে দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে। তার এই আচরণ,– তার স্ত্রীকেও বিস্মিত করে। তার স্ত্রী কিরণ জমিদারীপ্রথার একনিষ্ঠ অনুরাগী ও সেজন্যে স্বামীর আচরণ সে মেনে নিতে পারেনা। গল্পকারের উক্তি–"কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়ো অবাক। একী কান্ড! বাড়ীর বড়ো বাবু-বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ। তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া। তাও এই এক সামান্য মধু কৈবর্তকে লইয়া। অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড় বাবু জন্মিয়াছে এবং কোনোদিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লাইয়াছে আর বড়ো বাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশ গৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিরপীত ব্যাপারতো কোনোদিন ঘটে নাই"।

এই ধরনের আরো একটি উক্তি করেছে কিরণ। "বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি। তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিংবা কোনো দুঃখী কৈবর্ত্যের সুখ দুঃখের কতটুকুই বা মূল্য"। কিরণ হালদারগোষ্ঠীর দাপটও বৈভব প্রভৃতির একান্ত অনুরাগী কিন্তু তার স্বামীর মধ্যে সে সব নেই বলে তার ক্ষোভ আছে। প্রকৃতপক্ষে বনোয়ারীলাল ব্যতিত আর সবাই জমিদারী প্রথার অনুগত ও ভক্ত। বনোয়ারীলালের মধ্যে সে মূল্যবোধ নেই বলেই তাঁর নিকটজনেরা তার প্রতি ক্ষুব্ধ। বনোয়ালীলাল যে কারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা শ্রেণীবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বা জমিদারী প্রথার প্রতি বিরক্ত হয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে তেমন বলা যাবে বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সে তার ক্ষমতা ও পৌরুষ দেখাবার জন্যে এ কাজগুলো করেছিল। তবে গল্পের শেষাংশে সে কেন গৃহত্যাগ করে চাকুরী খুঁজতে বের হলো তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিছু অনুমান করার সুযোগ আছে।

প্রথমে মনে হতে পারে –যখন সে জানল যে, –"মনোহর তাহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারী যাবজ্জীবন দুইশত টাকা করিয়া মাসোহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের একজিক্যুটর, তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে হালদার পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে" তখন তার মনে যে আত্মসম্মান বোধ জেগেছিল-তাই

Dhaka University Institutional Repository

তাকে ঘরের বাইরে ঠেলে দেয়। পিতার জমিদারীতে উত্তরাধিকারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বুঝে সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে চাকুরী খুঁজতে কলকাতায় চলে যায়। এটা এক ধরনের শ্রেণীদ্বন্দ্ব হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের আরো ক'টি গল্পে শ্রেণীচেতনা সাক্ষাত পাওয়া যায়। হৈমন্তী, ত্যাগ, স্ত্রীর পত্র, দেনা-পাওনা ইত্যাদি গল্পের নাম প্রথমেই পাঠকের মনে জাগবে। রবীন্দ্রনাথ একজন মহান শিল্পী। তিনি জমিদার ছিলেন। বাইরের আচার আচরণে জমিদারী প্রথার ঠাট তিনি ত্যাগ করেন নি, কিন্তু যখন তিনি শিল্পের জগতে প্রবেশ করেন তখন তার জাগতিক ও সামাজিক আচরণ দূরীভূত হয়ে যায়। তিনি শ্রেণীপীড়িত সমাজের প্রতি মমত্ববোধ অনুভব করেন। তার কাছে শ্রেণীপীড়িত চরিত্রগুলি দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। তার গল্পে সেই ধরনের চরিত্র অনেক আছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

ঔপন্যাসিক হিসেবেই শরৎচন্দ্রের বড় পরিচয়। ছোটগল্প তিনি তেমন বেশীই লেখেননি তবে তার কোন কোন উপন্যাস জাতীয় রচনা ছোটগল্প হিসেবেও বিবেচিত হয়।

দরিদ্র গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্র্যএতই প্রকট ছিল যে পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করতে পারেন নি বলে বর্তমানকালের ইন্টারমিডিয়েট সমমানের এফ.এ পরীক্ষা দিতে পারেননি। কিন্তু তার লেখাপড়ার পরিধি ছিল অনেক বড়, বিস্তৃত ছিল জীবনের অভিজ্ঞতা। জীবনের বহু বিচিত্র পরিবেশে তিনি ছিলেন, সেইগুলি তাঁর জীবনবোধ তৈরি করেছিল। তাঁর সহজাত সহানুভূতি গরীবের প্রতি ও নির্যাতিত নারীর প্রতি। দুঃখে দৈন্যে ভরা বাংলাদেশকে তিনি অনেক ভালবাসতেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এক অনুষ্ঠানে নিজের জীবনদৃষ্টি তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।- "আমার শক্তি কম, তবু নিজের দেশটিকে আমি বাস্ত বিক ভালবেসেছি- এ কথার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা নাই। যথার্থই ভালবেসেছি। ইহার ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, ইহার জলবায়ু, ইহার দোষ গুণ, ত্রুটি, দলাদলি বা যা কিছু বল বাস্তবিক আমি ভালবেসেছি। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্ট করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির হয়, তখন তাহার দোষ-ত্রুটিতে সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না। অনেকে বলেন, যাহারা সমাজের নিম্ন স্তরে পড়িয়া আছে, তাহাদের উপর আমার সহানুভূতি বেশী। সত্য তাই।[৩]

শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। অপরাজেয় কথাশিল্পী অভিধা তাঁর জন্য যথার্থ। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে আছে অসাধারণ সহানুভূতি, নির্যাতিত মানুষ, বিশেষত নারীর প্রতি মমতা, লেখায় জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এবং রচনাশৈলীর আকর্ষণ। তিনি সচেতনভাবে শ্রেণীচেতনার বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের ব্যবহার দেখাবার জন্যে সাহিত্য রচনা করেননি।

৩। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শরৎসাহিত্য। -ড্. সরোজমোহন মিত্র, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৬১। সুলভ শরৎসমগ্র-২ সম্পাদক সুকুমার সেন. আনন্দ পার্বলিশার্স, ১৯৮৯: কলকাতা পৃ.১৭৬৫

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু রচনার গুণে অনেক রচনায় শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে। সেই ধরণের কয়েকটি গল্প নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

'পরেশ' (১৩৪০) গল্পের নায়ক তার জ্যাঠামশাই'র প্রতি বাবার অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ করেছে। –"গুরুচরণ কাঙালের মত বলিয়া উঠিলেন, যাবো পরেশ, যাবো, কিন্তু কে আমাকে নিয়ে যাবে? পরেশ কহিল, আমি নিয়ে যাবো জ্যাঠামশাই। তবে চল, একবার বাড়ী থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসিগে। পরেশ কহিল, না জ্যাঠামশাই, ও বাড়ীতে আর না। ওর কিছু আমরা চাইনে। ..... ওসব নেবার অনেক লোক আছে, চলুন। চল, কহিয়া গুরুচরণ পরেশের হাত ধরিলেন, এবং জনহীন অন্ধকার পথ ধরিয়া উভয়ে রেলওয়ে স্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন।"[৪] 'পরেশ' গল্পে-পরেশের জ্যাঠামশাইকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্রোহের আভাস আছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্যায় কর্ম মেনে না- নিয়ে প্রতিবাদ করা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামাজিক পর্যায়ে প্রভাব পড়ে। এভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটে।

'অভাগীর স্বর্গ' (১৩২৯) গল্পে সামাজিক বৈষম্যের স্পষ্ট চিত্র অংকিত হয়েছে। 'অভাগী' জাতিতে দুলে। সমাজে তার স্থান নিচে। নিচু জাতের হলে মরে গিয়েও রক্ষা নেই। মরার পরে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তথাকথিত উচুবর্ণের। লোক অধর রায় ও ভট্টাচার্য মশাইরা। শব-দাহের জন্য উঠানের গাছ কাটতে গিয়ে তার পুত্র কালীচরণ জমিদারের লোকজনের হাতে অপমানিত হয়েছে। জমিদারের লোকজন শব-দাহে বাধা দিয়েছে। গল্পে অধর রায়ের উক্তিটা শ্রেণীদ্বন্দ্ব-উসকে দেয় 'দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি,'। আরো তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভরে ভট্টাচার্য মশায় বলেছে-"তোদের জেতে কে কবে মড়া পোড়ায় রে"। (পূর্বক্ত, পৃ. ১৭৩৮) সমাজে অধিপতি শ্রেণীর মানুষ নিচু স্তরের মানুষকে কত তুচ্ছ ভাবে-তার নিদারুণ দিকটা এ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পকার এর প্রতিকারের কোনো পন্থা বাতলে দেননি তথাপি দুটি শ্রেণীর অবস্থান এ গল্পে চিহ্নিত হয়েছে।

'একাদশী বৈরাগী' (১৩২৪) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একাদশী বৈরাগীর সাথে সমাজপতিদের সংঘাতের বিষয়টিই গল্পটির উপজীব্য বিষয়। জাতিতে সদগোপ, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ একাদশীর আসল নাম সমাজের লোক ভুলে গেছে।

অতিরিক্ত কৃপণতার কারণে তার নাম হয়েছে 'একাদশী'। তার বৈমাত্রেয় বোন-গৌরী। চিন্তা চেতনায় পশ্চাৎপদ ও বখে যাওয়ার কারণে সমাজ তাকে মেনে নেয়নি। একাদশী তাকে পরিত্যাগ না করে গৃহে স্থান দিয়েছে। শাস্তিস্বরূপ তাকে গ্রাম থেকে চলে যেতে হয়েছে।

ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর সমাজের প্রতি একাদশীর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। যে সমাজে ব্যক্তি মানুষের আবেগ অনুভূতির মূল্যায়ন হয় না, আচার অনুষ্ঠানকেই যে সমাজ বড়ো বলে মনে করে সে সমাজে মহৎ কাজের মূল্য নেই।

৪। সুলভ্ শরৎসমগ্র-২, সম্পাদকঃ সুকুমার সেন। আনন্দ পাবলিকেশার্স; ১৯৮৯, কলকাতা। পৃ. ১৭৬৫

৫। বিংশ শতাব্দীর বাংলা ছোটগল্পে সমাজ বিদ্রোহ ১৯০১-১৯৮০। প্রকাশকাল- ১৯৯৩, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশীও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নফরের মতো গরীবের কাছ থেকে জোর করে পয়সা নিতে দ্বিধা করেনা। সমাজপতি স্মৃতিরত্ন বা অসাধু ব্রাহ্মণ গোমস্তার অন্যায়ের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় অন্যায় শব্দটি আসলে শোষনের ভিন্ন নাম। এ প্রসঙ্গে ড. চন্দ্রাঘোষ সিন্‌হা মন্তব্য করেন- "অন্যদিকে সে বিনয় ও বিদ্রুপের সঙ্গে প্রতিবেশী সমাজপতি স্মৃতিরত্ন কিংবা অসাধু ব্রাহ্মণ গোমস্তার অন্যায়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যের টাকা অন্যায়ভাবে আত্মসাতের চেষ্টা করে না সে। তার এই সমস্ত আচরণে ধর্ম ও নীতির ধ্বজাধারী-লোভী মানুষজনের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহী মনোভাব সুস্পষ্ট"।[৫]

'মহেশ' (১৩২৯), গল্পে লেখক তাক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার প্রমাণ দিয়েছেন- গফুর চরিত্রের মাধ্যমে। এটা শুধুমাত্র গফুর জোলার একার বেদনা বা করুণ কাহিনী নয়। এ বেদনা গ্রাম-বাংলার দরিদ্র ক্ষেত-মজুর শ্রেণীর অনেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গফুর ও তার গরু মহেশ শ্রেণীদ্বান্দ্বিক সমাজকে স্মরণ করে দেয়। সমাজের তথাকথিত উচ্চ আসনের মানুষ গেলা অসহায় মানুষকে কিভাবে শোষণ করেছে তার নিখুঁত চিত্র মহেশ গল্পে স্থান পেয়েছে। এ গল্পে একদিকে আছে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ জমিদার ও তার সহযোগী পুরোহিত তর্করত্ন,-অপরদিকে আছে দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের গফুর জোলা। গফুর এখানে শোষিত, বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন- তৃষ্ণা মেটাবার জলটুকুও গফুরের জন্য দুষ্প্রাপ্য। গফুরের দোষ সে মুসলমান। হিন্দুদের পুকুরের পানি নেয়ার অধিকার তার নেই। পিপাসিত ষাড় মহেশকে সে তৃষ্ণা মেটানোর পানিটুকু পর্যন্ত দিতে পারেনি। রাগ করে মহেশকে সে হত্যা করল। গোহত্যার অপরাধে তর্করত্ন কর্তৃক তার শাস্তি স্বরুপ গ্রাম থেকে তাকে বের করে দেয়া হলো। নিরুপায় গফুরকে গ্রাম ছাড়তে হলো। গল্পকার শরৎচন্দ্রের বর্ণনা।– ..... "অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল।..... নক্ষত্র খচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যতখুশী সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন মাফ করোনা"। (পূর্বোক্ত: পৃ:১৭৩৩) গফুর জোলার ওই হৃদয় বেদনার মধ্যে শ্রেণীচেতনা ও বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেন-সরোজমোহন মিত্র-"এই পল্লী জীবনের মধ্যে প্রজার পক্ষ হয়ে জমিদারের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার প্রভাব পাওয়া যাবে মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, হরি লক্ষ্মীর মধ্যে"।[৬]

শরৎচন্দ্র যে বিদ্রোহ- বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন - তা তার এক মন্তব্য থেকে বোঝা যায়।- "কখনো কোন দেশেই শুধু বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব আনা যায় না, অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফললাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়।

তাই ধৈর্য্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা-এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব পন্থাতেই রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে"।[৭]

৬। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শরৎসাহিত্য, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭।

৭। তরুণের বিদ্রোহ, (১৯২৯), শরৎ রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬০।

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

তারাশঙ্কর প্রধানত ঔপন্যাসিক। কিন্তু ছোটগল্পেও তার বিশিষ্ট অবদান আছে। তাঁর সব গল্প-'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ'[৮] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। জলসাঘর, রায়বাড়ি, ইমারত, মাটি, স্বাধীনতা প্রভৃতি গল্পে মার্কসবাদী চিন্তা অনুসৃত হয়েছে। মার্কসবাদীরা যেভাবে সমাজের বিকাশ, অবক্ষয় ব্যাখ্যা করেন, তারাশঙ্করের সাহিত্যে তার সমর্থন আছে। ক্ষয়িষ্ণু ভূ-স্বামীদের সঙ্গে উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, বিতর্কিত উপায়ে-ধনিক শ্রেণীর সম্পদ অর্জন তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। 'জলসাঘর' গল্পে জমিদার বংশের উত্থান-পতনের আলেখ্য আছে। "তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষে করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন-ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ীর লক্ষ্মী সে ঋণ সমুদ্রে তলাইয়া গেলেন"[৯]। (জলসাঘর; পৃঃ ৩৫) এবং সেই সময়ে-এই জমিদারদের অবক্ষয়ের পাশাপাশি নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের চিত্র রয়েছে।

মহিমের সাথে বিশ্বম্ভরের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়-বাইজী নাচের আসরের আয়োজনকে কেন্দ্র করে। গাঙ্গুলী বংশের ছেলে মহিম। মহিমের পিতা জনার্দনও রায়বাড়ীর কর্তাকে হুজুর বলে সম্বোধন করেছে। সেই মহিম ঝকঝকে মোটর গাড়ীতে চড়ে, রায় বাড়ীর ভাঙা দেউড়িতে এসে লাট সাহেবের মত নেমে নায়েব তারাপ্রসন্নকে হুকুম করে-ঠাকুর দা তথা বিশ্বম্ভর রায়কে ডাকতে। এমনকি ঘুমিয়ে থাকার খবর জেনেও মহিম ডেকে তুলতে বলল বিশ্বম্ভর রায়কে। বিশ্বম্ভর জলসাঘরে বাতি জ্বালিয়ে বংশের গৌরব রাখতে গিয়ে 'দুইখানা মোহর' ইনাম হিসাবে দিল, তার পরও রায় বাড়ীর শেষরক্ষা হলো না। বিশ্বম্ভর ও মহিমের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রায়বাড়ীর বিলয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে আছে এ গল্পে।

'ইমারত' গল্পে নির্মাণ-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য চিত্রিত হয়েছে। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে শোষণ বঞ্চনার রূপ উন্মোচিত হয়েছে। জনাব সেখ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। জনাবকে ঘিরে নারী পুরুষের দল-তথা নির্মাণ-শ্রমিকের বিভিন্ন অনুসঙ্গ গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। জনাব সেখ শুধু যে সাদামাটা নির্মাণ শ্রমিক তা নয়। তাঁর রুচিবোধ ও সৌন্দর্যপিপাসাও তাকে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে। ইমারতের কারুকাজ ছাড়াও কথাবর্তায়ও সেখ বেশ পটু বলে পরিচিত। শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে সেখের বাড়ীর বর্ণনায়। যে জনাব সেখের হাতে বড় বড় আকাশচুম্বী অট্টালিকা গড়ে ওঠে, তার থাকার জায়গাটার অবস্থা কতই না হাস্যকর। "মাটির দেওয়ালে ভাঙাঘর, সামনে এক পাকা বারান্দা। গোল-থাম, পাকা ছাদ পাকা মেঝে"।(প্রর্বোক্ত; দ্বিতীয়খন্ড; পৃঃ৫৬৩)

৮। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছঃ (তিন খন্ডে সম্পূর্ণ), সম্পাদনাঃ জগদীশ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদঃ প্রথম প্রকাশ-১৯৭৭, কলকাতা।

৯। জলসাগর, প্রথম সংস্করণ-শ্রাবণ ১৩৪৪, রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ইমারত গল্পে জনাব সেখের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হবার বর্ণনা-জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অবহেলিত, নিগৃহীত-শ্রেণীর প্রতিনিধি হিশেবে জনাব সেখকে গণ্য করা যায়। গল্পের শেষে ইমারতসদৃশ বুড়ো বটগাছের রূপকল্পে তাঁর আশ্রয়-শ্রেণী বৈষম্যের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

'মাটি' গল্পে তারাশঙ্কর ব্রাত্য জীবনের উপস্থিতি ঘটিয়ে সামন্ত শ্রেণীর অত্যাচার নির্যাতনকে স্মরণ করেছেন। গল্পের নায়ক জীওনলাল পৈতৃক সম্পত্তি বঞ্চিত ভাসমান মাটিওয়ালা, শোষক শ্রেণীর নির্মম শোষণে জর্জরিত। জমিদার, পাইক-পেয়াদা, ঘুষখোর তহশিলদারদের সম্মিলিত অন্যায় অত্যাচারের সব চিত্রই এ গল্পে বিশেষ তাৎপর্য সহকারে চিত্রায়িত হয়েছে। জমিদারের নির্মম বন্দোবস্তের ফলে-জীওনলাল ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ হলেও এক অমিত প্রাণশক্তি তাকে জীবনের অগাধ সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ার প্রেরণা দিয়েছে। সে প্রাণশক্তি 'লছমনিয়া' নামের এক নারীর প্রতি ভালোবাসায় উচ্চকিত। এ ভালোবাসাতো জমিদার শ্রেণীর শোষণ রুখতে পারে না। "নুয়ে পড়া ঘাড় এবং ঠেলে ওঠা পিঠের কুঁজের মধ্যবর্তী খাঁজে মাটির বস্তা ভ'রে বিকলাঙ্গ মাটিওয়ালা সর্বাঙ্গে কাঁদা মেখে হেঁকে চলছে-মাটি চাই, মাটি-ই"। (পূর্বোক্ত; তৃতীয় খন্ড; পৃ:৬৮)

'লছমনিয়া' অন্যের শয্যাশায়িনী জেনেও জীওনলাল থেমে যায়নি জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। 'লছমনিয়া' চরিত্র অঙ্কনেও গল্পকার সামাজিক বৈষম্যকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। জীওনলাল জমি হারিয়ে মামলা করেছিল জমিদারের বিরুদ্ধে। মামলায় সে ন্যায়বিচার পায়নি। অর্থও কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। মামলা করাটা জীওনলালকে প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অন্যদিকে 'লছমনিয়া' কেবল ভোগের সামগ্রী হয়ে পুরুষ প্রধান সমাজে উপস্থাপিত হয়নি। সে জীওনলালকে ভালোবেসেছে। অকপটে তার অসহায়তার কথা বলেছে। পিতৃহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, সাপিন কন্যা বলে পাঞ্জাব সমাজে পরিচিত হলেও জীবনযুদ্ধে থেমে থাকেনি।

গল্পকার 'মাটি' গল্পে পুরুষ প্রধান সমাজের নারীদের করুণ অবস্থাকে নির্দেশ করেছে। পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছাড়া তাদের আর কি মূল্য আছে-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়! এ নির্মম সত্যকে প্রশ্ববানে বিদ্ধ করে-জীওনলাল ও লছমনিয়ার চরিত্রে প্রতিবাদের সুর তুলে 'মাটি' গল্পকে বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত করেছেন।

'স্বাধীনতা' গল্পটিতে ঔপনিবেশিক আমলের শাসন-শোষণের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার বাসনা ও স্বাধীনতার সংবাদে আনন্দ উৎফুল্লতার প্রকাশ ঘটেছে। "একজন কানে কানে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলে কি হবে? বক্তৃতা! বক্তৃতা? হ্যাঁ। বাবুরা রাজা হলেন কিনা! বাবুরা রাজা হলেন? হ্যাঁ সায়েবরা চলে যাবে এ দ্যাশ থেকে"। গল্পের শুরুতে আকাল হাড়ী নামের একজনকে আনন্দ উল্লাস করতে দেখা যায়। পাগলের মতো নৃত্য করতে দেখে অবাক হয়ে যায় অনেকে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আনন্দে গ্রামে-গঞ্জে সভা-সমিতি গঠনের প্রয়াস চলছিল। এমনই একটি সভা হচ্ছিল বাংলাদেশের এক বিখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির উপস্থিতিতে। সভায় উপস্থিত 'আকাল হাড়ী'। "আকালহাড়ী আনন্দে পাগল হয়ে গেল। সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে গেল। কিন্তু একি? এ যে পরমাশ্চর্যের কথা। আকাল এসে আনন্দে লাফ মারছে স্বাধীনতা উৎসবে! আকালের পিতামহ ছিল সাহেব কুঠিয়ালদের পাইক। শেষে ডাকাতি করতে গিয়ে খুন করে ধরা পড়ে ফাঁসি হয়েছে। আকালের বাপ ছিল কুঠিয়ালদের পাইক। আকাল নিজে ছিল ডাকাত। তারপর সে চৌদ্দসালের যুদ্ধে গিয়েছিল-মেসোপটেমিয়ায়; মেডাল নিয়ে এসেছিল। ইংরেজের গোলামী করেছে তিন পুরুষ ধরে। তার এত আনন্দ কেন-কিসের? পরাধীনতার যাতনা সে অনুভব করেছিল"? (পূর্বোক্ত; তৃতীয় খন্ড;পৃ:৫৪,৫৫)

আকাল তখন ছোট। তার চোখের সামনেই সাহেবের পিস্তলের গুলিতে পিতা মারা যায়। আকালের মা আকালকে নিয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে ময়ুরাক্ষীর ধারে, ভল্লা বাগদীর গ্রামে চলে যায়। ওদের সাথে মিলে যায় তারা। ক্রমেই আকাল হিংস্র হয়ে উঠল। বড়ো হয়ে হলো ডাকাতের সর্দার। ওদের বড় স্বপ্ন কুঠি লুট করার। বন্দুকের ভয়ে আফসোস করে। এক বড় লোকের বাড়িতে ডাকাতি করে দু'টো বন্দুক নিয়ে আসল। এবার ইচ্ছা হয় সাহেবের সাথে লড়তে। সাহেবেরা কুঠি উঠিয়ে চলে গেলে, আকাল ডাকাতি ছেড়ে দেয়।

গল্পে উল্লেখ আছে ১৯১৪ সালে ইংরেজদের সাথে জার্মানীর যুদ্ধ লাগার প্রসঙ্গ। আকাল যোগ দেয় এ যুদ্ধে। সে দাড়ি গোফ রেখে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জীবনউৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেনি। যদিও আকালের চোখের সামনে সাহেবের পিস্তলের গুলিতে তার বাবার হত্যার দৃশ্য তার মনে দগ্ দগ্ করছে। তারপরও এক সংঘর্ষে মুমূর্ষু সাহেবকে ঘাড়ে করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে মহত্বের প্রমাণ দেয়। "বাবুমশাই, আজও আমার আফসোস হয়-কেন, আমি সেদিন সেই দানোর মত সাহেবটা- যে সাহেবটা ঠিক যে সাহেব আমার বাবাকে গুলি করেছিল-তারই মত দেখতে, তাকে যেন আমি খুন করে বাবার মরণের শোধ নিতে পারি নাই। কি যে ধরম ধরম আমার মাথায় চেপেছিল-সভাপতি বললেন-তুমি ঠিকই করেছিলে আকাল। আজ সে পুণ্যের বলে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। আকাল বললে-স্বাধীনতা কি বলছ গো, সাহেবেরা চলে গেল, তাই বল। ..... এই দেশে তোমার জন্ম বলেই তুমি তা পেরেছিলে"। (পূর্বোক্ত: পৃ. ৫৯)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-'৫৬)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ লেখক। তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয় 'অতসীমামী' (১৯২৮) গল্প দিয়ে। তারপর তিনি অনবরত লিখে গেছেন। তিনি প্রধানত ঔপন্যাসিক কিন্তু ছোট গল্পও রচনা করেছেন, কবিতা লিখেছেন, কিছু প্রবন্ধও তাঁর আছে। তাঁর সাহিত্য জীবনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমযুগে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। তার পর থেকে সব কিছুই মার্কসীয় ভাবধারায় রচিত হয়। 'চালক', 'একান্নবর্তী', 'লেভেল ক্রসিং', 'চিকিৎসা',

Dhaka University Institutional Repository

'কংক্রীট', 'নীচু-চোখে দু-আনা আর দু'পয়সা', 'নীচু চোখে একটি মেয়েলী সমস্যা', 'বিচার', 'ঢেউ', 'মাটির মাশুল', 'পেরানটা', 'দীঘি', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', প্রভৃতি গল্পে কোন না কোন পর্যায়ে চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪৬ সালের তে-ভাগা আন্দোলনের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'হারানের নাত জামাই' গল্প। তে-ভাগা আন্দোলনে একদিকে ছিলো জমিদার জোদ্দাররা, অপরদিকে দরিদ্র চাষীরা। চাষীদের নেতা ভূবন মন্ডলকে পুলিশ গ্রেফতার করলে কৃষক বধুরা ঝাটা- বটি-দা হাতে পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

'মাটির মাশুল' গল্প রচিত হয়েছে ধরণীতরফদারের শোষণ জুলুমকে কেন্দ্র করে। মহাজনদের মধ্যে ধরণীতরফদার বহুল আলোচিত। তরফদারের অত্যাচারের শিকার-ভূষণ, রসিক, তোরাব আলী, পিলাক সীমন্ত, রাজেন, পুলিনজানা প্রমুখ কৃষক। দরিদ্র কৃষকরা ঋণের জালে পড়ে যায়। ঋণের বোঝা মাথা পেতে নিতে হয় অসহায় কৃষকদের। সোনামাটি গ্রামের কৃষকদের দুর্দশার চিত্র পাওয়া যায় তোরাবের স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হয়েও ঘরে খাবার না থাকা, ভূষণের ছেলে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনায়। গল্পের শেষে দেখা যায় কৃষকরা-ধরণী তরফদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে ধানের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছে।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটি বহুল প্রশংসিত ও সমালোচিত। এ গল্পে কৃষক সম্প্রদায়ের টিকে থাকার লড়াই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। জোতদার, জমিদার ও সরকারের পুলিশ বাহিনী একযোগে সশস্ত্র আক্রমণ করে নিরপরাধ কৃষিজীবী খেটে খাওয়া মানুষকে। কৃষকরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছে। কৃষকদের সাথে যোগ দিয়েছে শ্রমিক শ্রেণী। ষ্টেশন সংলগ্ন কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট এবং তিন জন শ্রমিক নেতার গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে পুলিশ শ্রমিক সংঘাত, গল্পে টান টান উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। কৃষকরা ন্যায্য দাবী আদায় করতে দৃঢ়সংকল্প। শাসক গোষ্ঠী ও ভাড়াটে বাহিনী দ্বারা শোষণ শাসন বজায় রাখতে চায়। দু'পক্ষের মরণপণ লড়াই-সংগ্রাম 'ছোট বকুলপুরে যাত্রী' গল্পটিকে শ্রেণীদ্বন্দ্বমূলক গল্পের ধারায় বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র দত্তের ভাষ্য।- "ছোট বকুলপুরের যাত্রী গল্পে আছে বাংলাদেশের সে সময়ের সত্যিকারের বিশেষ এক গ্রামেরই চাষীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সত্য, বাস্তব ছবির পরিচিতি"।[১০]

সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৮০)'

'ফসিল' গল্পটি ফসিল গল্প সংস্করণের অন্তর্ভূক্ত। সময়টা ১৯৪২। যুদ্ধের ভয়াবহ দামামা চারদিকে বাজছে। 'ফসিল' এর মত আরো কিছু গল্পে বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রাধান্য পেয়েছে। 'ফসিল' সমাজ সমস্যামূলক গল্প।

১০। -বাংলা ছোট গল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ। প্রকাশ-১৯৮৫। কলকাতা। পৃষ্ঠা- ১৯৭, ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিকদের শাসন শোষণে যে বাংলাদেশের অবস্থা শোচনীয় রূপ ধারণ করেছিল তার আলেখ্য ফুটে উঠেছে এতে। উনিশ শতক থেকে গড়ে ওঠা সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংঘাত বিদ্যমান ছিল। সুবোধ ঘোষও শ্রেণী সচেতন গল্পকার। -"বস্তুত এমন শ্রেণী ভাবনা সুবোধ ঘোষের চিন্তা-ভাবনায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক, ছিল বলেই তিনি 'ফসিল' গল্পের মূল ভিত্তি করেছেন শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-মানুষের উজ্জ্বল সংঘাতের ও অসহায় জয়-পরাজয়ের চিত্র"।[১১]

গল্পের পটভূমিকায় আছে বাংলাদেশের বাইরে এক প্রতাপশালী জমিদারের খাস জমির বিস্তর এলাকা। যার নাম 'অঞ্জন গড়'। এখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমেই ভাঙনের দিকে যাচ্ছে। প্রত্যেক বছরে স্টেটের প্রাপ্য ও বখরা নিয়ে তহশীলদার ও চাষী প্রজাদের মধ্যে খাজনা আদায় নিয়ে সংঘর্ষ বাধছে। চাষী প্রজা 'ভীল' সম্প্রদায়ের লোকেরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেও মাটি কামড়ে পড়ে থাকে 'কুর্মিরা'। তারা বাপ-দাদার চাষ করা জমিজমা শত অত্যাচারেও ছাড়তে রাজী নয়। একদিন তারা সংগঠিত হয়-তাদের গোষ্ঠীর বৃদ্ধ লোক 'দুলাল মাহাতো'র প্রেরণায়।

দুলাল মাহাতো জমিদারের কাছে জমিজমা-চাষাবাদ, জীবনের নিরাপত্তা দাবী করে। জমিদার মেনে নেয়না। এদিকে বিদেশী বণিকেরা সেই সুযোগে দুলাল মাহাতো ও কুর্মিদের প্রলোভন দেখিয়ে হাত করার চেষ্টা করে। বণিকদেরও প্রয়োজন নতুন শ্রমিকের, মাটির নীচে পড়ে থাকা অভ্র খনির কাজের জন্য। সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের মধ্যে শুরু হয় প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ। দুলাল মাহাতোকে খতম করার নীল নকসা তৈরি হয়ে যায়। দুলাল মাহাতোর হত্যা করার সিদ্ধান্ত জমিদার ও বণিক উভয়ের সমন্বিত প্রস্তাব। গল্পে উল্লেখিত সামন্ত ও বণিক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হলেও পরিণামে পর্যুদস্ত হয়েছে, শোষিত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী।

'গোত্রান্তর' গল্পেও শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি ধণিক শ্রেণী ও শোষিত বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সঞ্জয়' মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত হয়েও উপরে ওঠার উদগ্র বাসনা লালন করে। নিজের স্বার্থকে চরিতার্থ করতে সব রকম কৌশল অবলম্বন করতে প্রস্তুত সঞ্জয়। গোত্রান্তর গল্পটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের স্বভাবসুলভ বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প বলেও ধরে নেয়া যায়। বিশ্বাসঘাতকতা সর্বহারা মানুষের প্রতি করা হয়েছে বলা যায়।

একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সঞ্জয়। এম.এ পাশ করার পর চার বছর বেকার সে। চার বছরে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে সঞ্জয়ের কাছে। দাদার সংসারে থেকে সঞ্জয় বুঝেছে-তাদের জরাজীর্ন বাড়িটার মতো ভেঙ্গে পড়া সংসারে-প্রেম-প্রীতি, স্নেহ মমতা ব্যবসায়িক পণ্যের মতো। প্রেমিকা সুমিত্রাও থেমে থাকেনি। প্রেমের মূল্য দিতে পারেনি। টাকার স্রোতে ভেসে গেছে সঞ্জয়ের প্রেম। 'সঞ্জয় দারিদ্র্যের যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

১১। বাংলা ছোট গল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ। পৃ.-১৯৭-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ সে আত্মকেন্দ্রিক মানুষে পরিণত হয়েছে। নিজের স্বার্থের জন্য সে ষড়যন্ত্রসহ সব কিছু করেছে। মিল মালিকের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করেছে প্রচুর। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার সব বৈশিষ্ট্য 'সঞ্জয়ের' চরিত্রে ফুটে উঠেছে। নিজস্ব অবস্থানে অবস্থান করে দ্বন্দ্ব ও উচ্চাকাঙ্খায় উপরে উঠতে চেয়েছে সে।

গল্পে চিত্রিত হয়েছে 'নেমিয়ার' নামের এক হতদরিদ্র শ্রমিককের জীবন সংগ্রাম। রতনলাল সুগার মিলের লোডিং মুহুরী। "ত্রিশ টাকায় আরম্ভ করে এখন এসে ঠেকেছে পনর টাকায়"[১২]। মিল কর্তৃপক্ষের চোখের বিষ নেমিয়ার। একটি অবিবাহিত বোনকে নিয়ে জীবন যাপন খুব কষ্টসাধ্য তার। 'সঞ্জয়ের মতো সামর্থবানদের কাছে তাকে হাত পাততে হয়। প্রয়োজনে বোনকেও কাজে লাগাতে দ্বিধা করে না সে। এই নেমিয়ারকে ব্যবহার করতে চায় সঞ্জয়। সঞ্জয় জানে কেন্নোর মতো দেখালেও লোহার মূর্তির মত ঋজু ও কঠিন নেমিয়ার।

শ্রমিক বিদ্রোহ ও অসন্তোষের চরম দুর্দিনে-গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে সঞ্জয় আঁতকে উঠলেও নেমিয়ার শ্রমিকদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার সুবাদে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রমিক ও কৃষকের সাথে ন্যায্য মজুরের দাবিতে আবেগদীপ্ত হয়ে নেমিয়ার দুঃসাহসিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। রতনলাল সুগার মিলের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে; এক পর্যায়ে শ্রমিক নেতা হয়ে যায় সে। গল্পের শেষে নেমিয়ার চরিত্রের এ পরিবর্তন 'সঞ্জয়' চরিত্রটিকে ম্লান করে দেয়। সঞ্জয়ের বিশ্বাসঘাতকতা অবশেষে 'নেমিয়ার' বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গল্পে সংকেতধর্মী আবহের মধ্যে দিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে- শ্রেণী বৈষম্য।

গল্পের শেষে দেখা যায়-শ্রমিক-কৃষক সব একতাবদ্ধ হয়ে এক শ্রেণীতে চলে আসে; সে শ্রেণীর নাম শোষিত শ্রেণী। একই গোত্রের মধ্যে গোত্রান্তর ঘটে এভাবে।

'পরশুরামের কুঠার' (১৯৪২) গল্প গ্রন্থের অর্ন্তভূক্ত 'অযান্ত্রিক' গল্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় সুবোধঘোষ যে ক'টি গল্প লিখেছিলেন-'অযান্ত্রিক' তার মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষে নানান প্রতিক্রিয়ার মাঝে-সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী আন্দোলনও তীব্র হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রতিরোধ সংগ্রাম-ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের আপামর জনসাধারণকে যেমন এক কাতারে শামিল করেছিল, সাম্যবাদী চিন্তাভাবনায়ও প্রভাবিত হয়েছিল অনেকে। মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তাত্ত্বিকরাও শ্রমিক-কৃষকদের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের দাবীকে শাসক গোষ্ঠীর সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। শোষণ-শাসনের পাশবিকতা ও পাহাড়সম বৈষম্যকে সমকালীন গল্পকারদেরকেও প্রবলভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। আর তাইতো তাঁরা সামাজিক, রাষ্ট্রিক অবস্থাকে গল্পের আবহে চিত্রিত করেছে। প্লট বা কাহিনীবৃত্তকে করেছে দ্বান্দ্বিকতার গতিতে বেগবান।

১২। সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ, দ্বিতীয় মুদ্রা নভেম্বর-১৯৮১, প্রকাশক [illegible] কলকাতাঃ পৃ. ৩৩৭.

Dhaka University Institutional Repository

'অযান্ত্রিক' গল্পটি সুবোধ ঘোষের শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার সোনালী ফসল। বাংলা ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারায় আলাদা মাত্রা যোগ করেছে এটি। বিমল-'জগদ্দল' নামের ট্যাক্সি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। শ্রমের প্রতি তার বিশ্বাস ও যত্নের কমতি নেই। নিজে একাধারে চালক ও মিস্ত্রী। "এই কম্পিটিশন বাজারে, এই সব শিকার-বাজের ভিড়ে এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে দিচ্ছে। আর তেল খায় কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরীব, জগদ্দল যেন সত্যটুকু বোঝে"। (পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৮৩)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

বাংলা ছোট গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহ্য অনুসন্ধানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটি স্মরণ করতেই হবে। বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন গল্পকার হিসেবে তাঁর পরিচয় আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়, মধ্যবিত্তের উথাল-পাতাল করা দুঃসময়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। 'অনুশীলন সমিতি'তে তাঁর যোগদানও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাকেও কারাবরণ করতে হয়েছিল। কারাগারের মধ্যে থেকে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থী আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার পর চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসলেও সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিশেষ করে শ্রেণীদ্বান্দ্বিক রূপকে ছোট গল্পের মাধ্যমে রূপদান করতে মোটেও পিছপা হননি। তাঁর গল্পে মন্বন্তরের চিত্র প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। মন্বন্তরের নেপথ্যে রয়েছে স্বার্থান্বেষী শোষক শ্রেণী। মন্বন্তরের চিত্র আঁকতে গিয়ে প্রকারান্তরে সেই শ্রেণীগত অবস্থার বর্ণনা করতে তিনি বেশ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তার নিজের মতামত উল্লেখ করা যায়। -'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দু:স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কঙ্কালের এক অপূর্ব শোভা যাত্রা। সে দিনের সেই অসহ্য আরগ্লানি আর গর্জনের মধ্যে আমিও গর্জন করে উঠেছি, 'যুগান্তরে' লিখেছি 'নক্রচরিত', 'আনন্দবাজারে' লিখেছি 'দু:শাসন', 'দেশে' লিখেছি 'পুষ্করা'।"

ঔপনিবেশিক আমলের শাসন ব্যবস্থায়, কৃত্রিম খাদ্যসংকট ও মুনাফালোভী মজুতদারদের কালোবাজারীর সর্বগ্রাসী রূপ উন্মোচিত হয়েছে 'নক্রচরিত' গল্পে। গল্পের প্রধান চরিত্র নিশিকান্ত কর্মকার। নিশিকান্তের উপস্থিতি কচ্ছপের মতো। ডাকাত দলের হত্যা, লুণ্ঠন তথা অমানবিক কাজের চেয়ে নিশিকান্তের শোষণ কম নয়। মদনযোগীর ক্ষুধার জ্বালায় ডাকাতি করাকে শ্রেণীবৈষম্যের নিক্তিতে বিচার্য হলেও নিশিকান্তের শোষণ অমানবিকতার চরম সীমায় উপনীত। ডাকাতদের অনুশোচনা কানসহ দুল! ডাকাত যোগী-দুলের সাথে কান ছিড়ে আনা অমানবিক মনে করলেও শ্রেণীগত অবস্থা ও শোষণ এখানে প্রশ্নবানে চিহ্নিত। "জীব সৃষ্টি করেছেন অথচ তাদের আহার যোগাবার বেলায় এত কার্পণ্য কেন"? [১৩]

১৩। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয়খন্ড); মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স; কলকাতা: প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৬. পৃ. ৪১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত দুর্ভিক্ষে মতি ও তার স্ত্রীর আত্মহত্যা শাসকবর্গের 'নক্রচরিত' তথা কুমিরের মত হিংস্র মানবিকতার পরিচয় বহন করে। গল্পকার আরো এক ধাপ এগিয়ে প্রশ্নবানে বিদ্ধ করেছেন শ্রেণীদ্বান্দ্বিক আবহের দৃষ্টান্ত টেনে।-"এই মৃত্যু- এই অপঘাত, এদের জন্য দায়ী কে? দৈব?"– [১৪]

'দু:শাসন' গল্পটির নামকরণেই বোঝা যায় গল্পকারের বক্তব্য কোন দিকটাকে নির্দেশ করছে। যুদ্ধে সৃষ্ট সংকট মানুষের জীবনে যে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনে তারই বাস্তব চিত্র দুঃশাসন গল্পে ফুটে উঠেছে। খাদ্য-বস্ত্রের মতো মানুষের মৌলিক চাহিদা নিয়েও চলেছে ষড়যন্ত্র। সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম সংকট। মিথাশ্রয়ী উপমা-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের প্রসঙ্গ আরো ঘনীভূত করেছে শোষণের চিত্র। "ছোট গাঁয়ের ছোটবন্দরে বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস"। তীর্থের কাকের মতো বস্ত্রহীনরা এক খন্ড বস্ত্রের অপেক্ষায় থাকলেও দেবীদাসের মন তাতে সায় দেয় না। মানইজ্জত রক্ষা পাবে তার দেয়া বস্ত্রে? দার্শনিক দৃষ্টিতে তা কতই না হাস্যকর! নগ্ন অনাবৃত পৃথিবী! মুনাফাখোরদের দৌরাত্ম্যে আরো নগ্নতা ধরা পড়েছে গল্পে বর্ণিত অপেক্ষমান লোকটির বস্ত্র না পাওয়াতে। দেবী দাসের যুক্তি কয়জনকে সে বস্ত্র দেবে? "ওকে একখানা দিলে দু'ঘন্টার মধ্যেই দোরগোড়ায় উল্টো চণ্ডীর মেলা বসে যেতো"। নির্মম পরিহাস ছলে দেবীদাসের উপদেশ বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। -"কী করবি বল্- সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাধল আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা"।

গল্পে বর্ণিত ফসল শূন্য মাঠে একদল মানুষের ভাঙা আলে বসে ধারালো হেঁসো'র প্রসঙ্গ ও তাতে সূর্যের আলো বিচ্ছূরণ, প্রতিরোধ সংগ্রামকে ইঙ্গিত দেয়। স্বয়ং গৌরিদাস হেঁসোতে শান দেয়া নিয়ে ভীত সন্ত্রস্থ। তার চোখে কুরুক্ষেত্রের বিভীষিকা উঁকি মারে। দুঃশাসনের নগ্ন চিত্র উপহাসের ছলে এ গল্পে স্থান পেয়েছে এভাবে-"ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎ গতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর এক সঙ্গেই চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরীদাসের দৃষ্টি-হুল হুল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে এক ফালি কাঁপড় নেই-কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্র হরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[১৫]

সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)

সোমেন চন্দ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন জেদী প্রকৃতির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল, সোমেন চন্দ সে সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য সংগঠন–'ঢাকা রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন' পরিচালনার দায়িত্ব পান।

১৪। পূর্বোক্ত : পৃ. ৪২৩।
১৫। পূর্বোক্ত: পৃ. ৪৪৪-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র বিশ বছর বয়সে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হওয়া আশ্চর্যের বিষয়। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের পরিচালনা ছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন শাখার সাথে গোপন সভা, শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করা প্রভৃতি কর্ম নৈপুণ্যের গুণে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কমউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ তার এ দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৪১ তাকে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের পদ দিলে সোমেন চন্দ তা গ্রহণ করেন। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ (১৯৪০) গঠিত হয় 'কাজী আব্দুল ওদুদ' (১৯৯৪-১৯৭০) কে সভাপতি ও 'রণেশদাশ গুপ্ত' কে (১৯১২-'৯৭) সম্পাদক করে। সোমেন চন্দ এ সংঘের সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ফলে ঢাকায় প্রগতিশীল শিল্প সাহিত্য আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করতে থাকেন তিনি।

প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ফসল তার 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪২) গ্রন্থের অন্তর্গত- 'একটি রাত', 'সংকেত'. 'ইঁদুর', 'দাঙ্গা'-প্রভৃতি গল্প। এ গল্পগুলোতে শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে।

'একটি রাত' গল্পে দেখা যায় গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সুকুমার। সে সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সাম্যবাদী দলের কর্মীরা তাকে অনুসরণ করে। ঘরে তার বৃদ্ধা মা আছে। তার অভাব অভিযোগের সীমা নেই। কিন্তু সুকুমারের সংগ্রাম চলতে থাকে। গল্পের বর্ণনা-"সুকুমারের কাছে কত লোক যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন ডাকাডাকি লেগেই আছে। সর্বদা যারা আসে তাদের মধ্যে গ্লাস ওয়ার্কসের সামসুর একজন।"[১৬] তাছাড়া গল্পে আছে- "সুকুমার বললে, বুঝলে না। আপনার পাভেলকে জানেন? –'পাভেল? –সে কী, গোর্কির 'মা' পড়েন নি? –হু পড়েছি, পড়েছি।' –ইনিও সেই পাভেলের মা, সেই মা!'[১৭] এই বৃদ্ধ মা সুকুমারের সংগ্রামী জীবন দেখে চোখের জল ফেলেন। চোখের জলের মধ্যে আগামী দিনের শ্রেণীহীন সমাজের তৃপ্ত আশ্বাস। এভাবেই একটি রাত চিহ্নিত হয়েছে, যে রাতে বিপ্লবী সুকুমারের বাড়ি পুলিশ ঘেরাও করল। সেই সাথে শ্রেণী দ্বান্দ্বিক গল্পের কাতারেও 'একটি রাত' গল্পকে বিশিষ্ট করল।

---

১৬. সোমেনচন্দ-রচনাবলী; (একখন্ড সমগ্র); সম্পাদনা-বিশ্বজিৎ ঘোষ; প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী-১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৩৬

১৭. পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৬.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে সামাজিক চিত্র উল্লেখ করার অবস্থান জুড়ে আছে। তার মধ্যে আবার প্রধান অংশ চিত্রে ভরপুর। ছোটগল্পের ছোট পরিসরে লুকিয়ে আছে অসাম্য, অত্যাচার, অসঙ্গতি এবং কোন কোনটিতে অভ্রান্তভাবে নজরে আসে মুক্তিপাবার বাসনা। বাংলাদেশের ছোটগল্পের বিশিষ্টতা সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন:- "বাংলাদেশ ভূখন্ডের মানুষ গত তিন- চার দশকধরে স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবনের জন্যে যে সংগ্রাম করে আসছে বাংলাদেশের সাহিত্যে তারই প্রতিফলন পড়ছে। বাংলাদেশের মানুষের ওই সংগ্রাম গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ গঠনের প্রয়াস, তাই বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য- বিশেষত কথা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ। বাংলাদেশের ছোটগল্প বিশেষভাবে আমাদের জীবনসম্পৃক্ত ছোটগল্পে আমাদের সামাজিক বাস্তবতা যতটা ধারা পড়েছে, আমাদের সৃষ্টিশীল সহিত্যের অপর কোন আঙ্গিকে তা পড়েছে কিনা সন্দেহ আছে।[১]

বাংলাদেশের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। সেই সমাজের অধিবাসী শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। লেখক স্বভাবিকভাবেই কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁদের রচিত সাহিত্যেও শ্রেণীর মুখ উঠে আসে। তাই বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্যে শ্রেণীনিরপেক্ষ সৃষ্টি কর্ম নজরে আসে না। শ্রেণী আছে বলেই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও আছে। ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, এক অংশের সঙ্গে আরেকঅংশের দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে সেটা না পড়লে ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারী সংবেদনশীল শিল্পীর দৃষ্টি এড়ায় না। আমাদের কৃষিনির্ভর দেশে কৃষিজীবী মানুষের বড় অংশটির দ্বন্দ্ব ভুমি মালিক এবং কৃষি উপকরণের অধিকারী বণিকশ্রেণীর সঙ্গে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্বটা আরো জটিল। এই দ্বন্দ্ব যেমন নিজদের সমাজের বিরুদ্ধে নিজেদের; অন্য দিকে সুবিধামত কখনো শাসকদের সঙ্গে, কখনো শাসিতের সঙ্গে।

বাংলাদেশে অন্তত বিশ-পঁচিশজন ছোটগল্পকার আছেন তারা নিয়মিতভাবে গল্প রচনা করে চলছেন। এদরে মধ্যে বয়স ও দক্ষতা বিচারে ছয়জন গল্পকার নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো। আমাদের আলোচ্য লেখকগণ হলেন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯১২-'৭১), শওকত ওসমান (১৯১৮-'৯৮), সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-'৮৬), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) আলাউদ্দীন আল আজাদ (জন্ম-১৯৩২), হাসান আজিজুল হক (জন্ম ১৯৩৯)।

---

১. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশেরছোটগল্প: জীবন ও সমাজ (ঢাকা-১৯৯৭), পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ (১৯১২-১৯৭১)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ শিল্প সফল লেখক হিসেবে সুপরিচিত। ১৯২২ সালের ১৫ আগষ্ট চট্রগ্রামের ষোলশহরে তাঁর জন্ম হয় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতা আহমদউল্লাহ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে। মায়ের বংশও ছিলো খানদানী। ওয়ালীউল্লাহর পারিবারিক পরিমন্ডল ছিলো সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রাগ্রসর। তাঁর মনন ও রুচিতে এর প্রভাব পড়েছিল সহজেই। পিতার সরকারী চাকুরীর কারণে কর্মস্থল পরিবর্তনের সাথে ওয়ালীউল্লাহর শিক্ষাজীবন কেটেছে বাংলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে। বার বার স্থান পরিবর্তনে এক জায়গায় স্থির হতে পারেন নি। বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবার কারণে সাধারণের মধ্যে চলাফেরার সুযোগ কম হয়েছিল। পরবর্তীকালে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে নিঃসঙ্গতার একটা প্রলেপ অস্তিত্বের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিল। পরিণতিতে তাঁর জীবনযাপনে ফুটে উঠেছিল বহির্বিমুখ, লাজুক ও সঙ্কোচ স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তাঁর মন ও মননের ঝোঁক নান্দনিকতার দিকেই উন্মুখ ছিল। নবাব আব্দুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) পরিবারের মেয়ের সাথে খানবাহানাদুর উপাধিপ্রাপ্ত ওয়ালীউল্লাহর বড় মামার বিয়ের সুবাদে উচ্চবিত্তের আবহ তাঁর জীবনাচরণে ছাপ ফেলে ছিল। ওয়ালীউল্লাহর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয়েছে মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফেনী, ঢাকা, কুড়িগ্রাম, চুচঁড়া, হুগলী, ময়মনসিংহ ও শেষ দিকে কলিকাতায় : চট্রগ্রাম জেলা স্কুলেও কিছুদিন লেখাপড়া করেন তিনি। ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ডিসটিংশন সহ বি.এ পাশ করেন। অর্থনীতি বিষয়ে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েও সমাপ্ত করেননি। জানা যায় একাডেমিক পড়ালেখার চেয়ে সাহিত্যচর্চা করা ও পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী।

এম.এ ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় ওয়ালীউল্লাহর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৪৫ সালে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য স্টেট্সমেন্ট' পত্রিকায় চাকুরীজীবন শুরু করেন। নিয়মিত লেখালেখি থেকে বোঝা যাচ্ছিল তিনি ভবিষ্যতে পেশা হিসেবে লেখালেখিকে বেছে নেবেন। ১৯৪৫ সালে গল্প গ্রন্থ 'নয়নচারা' প্রকাশ পেলে কলকাতার প্রাগ্রসর ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সখ্যা গড়ে উঠে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর তিনি 'স্টেট্সম্যান' ছেড়ে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদকের চাকুরী নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। তারপর ১৯৪৮ সালে করাচী কেন্দ্রে বার্তা সম্পাদক, ১৯৬১ সালের এপ্রিলে ফার্স্ট সেক্রেটারী পদমর্যাদায় প্রেস-আটাশে হিসেবে যোগ দিলেন প্যারিসের পাকিস্তানী দূতাবাসে। একাধারে ছ'বছর ছিলেন এ শহরে। দূতাবাসের চাকুরী ছেড়ে চুক্তিভিত্তিক পদ 'প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট' হিসেবে যোগ দেন ইউনেস্কোতে '৬৭ 'র ৮ আগষ্ট প্যারিসেই । ৭০ এর ডিসেম্বরে ইউনেস্কোয় তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হলে পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদে বদলী হওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি না হয়ে ফ্রান্সেই থেকে যান। ইসলামাবাদে

Dhaka University Institutional Repository

না ফেরার মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল বাইশ বছরের চাকুরী শেষে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে। এর ফলে ওয়ালীউল্লাহর শেষ জীবন আর্থিক অনটনে অতিবাহিত হয়েছিল-ফ্রান্সে।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ যখন ফ্রান্সে পাকিস্তানি দূতাবাসে চাকুরীরত সেসময় আন্ মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবো নামে একজন ফরাসী মহিলা ফরাসি দূতাবাসে কর্মরত। বছর দেড়েকের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯৫৫ সালের ৩ অক্টোবর তার বিয়ে হয়। ধর্মান্তরিত হবার পর তাঁর স্ত্রীর নাম হয় আজিজা মোসাম্মত নাসরিন। দুই সন্তানের জনক ওয়ালী উল্লাহ, কন্যা সিমিন ওয়ালীউল্লাহ্ ও পুত্র ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ।

১৯৫৫ সালে 'বহিপীর' নাটকের জন্য ওয়ালীউল্লাহ 'পি.ই.এন পুরস্কার' পান। ১৯৬১ সালে উপন্যাস সাহিত্যে অবদানের জন্য 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য 'আদমজী পুরস্কারে' ভূষিত হন।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে কখনই জড়িত ছিলেন না ওয়ালীউল্লাহ। তাঁর লেখক জীবনের শুরুতে বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপি অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৩৫০ এর মন্বন্তর, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎপরতা, সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড, স্বাধীনতার আন্দোলন, হিন্দু মুসলমান বিরোধ, অর্থনৈতিক মন্দা সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল উপমহাদেশে। এ অবস্থায় কোন সচেতন, শিক্ষিত, বিশেষ করে লেখক মানুষ নিরব থাকতে পারেনা। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলার বৃহত্তর অংশ পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হতে যাচ্ছে-,এ বিষয়টি ও ওয়ালীউল্লাহকে ভাবিয়ে তোলে। পাকিস্তান আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার শেষ পর্যায়ে ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ও শরৎবসুর (১৮৮৯-১৯৫০) বৃহত্তর 'স্বাধীন বাংলা'র দাবীকে সমর্থন করেন তিনি। এ সমর্থন নীরবে ছিল না। আবুসয়ীদ আইয়ুব,(১৯০৬-১৯৮২) কাজী আব্দুল ওদুদ, (১৮৯৪-১৯৭০) শওকত ওসমান, (১৯১৮-১৯৯৮) প্রমুখ মুসলমান সাহিত্যিকগণের সাথে ওয়ালী উল্লাহ একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিটা 'আজাদ' পত্রিকাসহ কলকাতার অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রকাশ হয়েছিল। মোহিতলাল মজুমদার(১৮৮৮-১৯৫২), বুদ্ধদেব বসুদের (১৯০৮-১৯৭৪) সংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাথেও তিনি একমত পোষণ করতেন। পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন না-মুসলমানদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা বিকাশের বিবেচনায়। তবে বামপন্থী রাজনীতির পক্ষে মর্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে তিনি ছিলেন সারাজীবন। মুক্তিযুদ্ধকালে ওয়ালীউল্লাহ প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। সেখানে ফরাসী একাডেমীর সদস্য পিয়ের ইমানুয়েল আঁদ্রে মালরোদের সাথে যোগাযোগ করে বিশ্ব জনমত গঠনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক , ফরাসী সরকারের পাকিস্তানপ্রীতি ওয়ালীউল্লাহকে ব্যথিত করে। আঁদ্রে মালরো এবং জ্যাঁপল সাত্রে ছাড়া ফরাসী বুদ্ধিজীবিদের তেমন সাড়া পেলে না তিনি। এর পরেও

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বসে থাকেননি। জ্যাঁপল সার্ত্রে ও আঁদ্রে মালরোকে বাঙালী মুক্তিসেনাদের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বাঙালীদের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীন মাতৃভূমির দাবিকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন 'সার্ত্রে' ও 'মালরো' কে। এর ফলে ১৯৭১'র ১৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যা International Herald tribune পত্রিকায় মালরো'র ছবিসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। প্রতিবেদনটির শিরোনাম Ready to go to east pakistan: Malraux, 69, offers to fight for Bengalis. তাছাড়া নিজের অর্জিত অর্থথেকে নেপথ্যে অবস্থান করে কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে টাকা পাঠাতেন সামর্থ অনুযায়ী। জামাকাপড়ও পাঠাতেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। মুক্তিযুদ্ধ কালে অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তায় কেটেছে তাঁর। পাক বাহিনীর হিংস্র আক্রমণ ওয়ালীউল্লাহকে ক্ষত বিক্ষত করেছে মানসিকভাবে। এমতাবস্থায় ১০ অক্টোবর ১৯৭১ সাল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে অধ্যয়নরত অবস্থায় গভীর রাতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার খবর শুনে যেতে না পারলেও বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান চিরকাল মনে রাখবে।

তাঁর রচনাবলী:

ছোটগল্প ঃ 'নয়নচারা' (কলকাতা: ১৯৪৬)। 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (ঢাকা : ১৯৬৫)।

উপন্যাস ঃ 'লালসালু' (ঢাকা : ১৯৪৯)। 'চাঁদের অমাবশ্য' (ঢাকা : ১৯৬৪)।

কাঁদো নদী কাঁদো'(ঢাকা : ১৯৬৮)।

নাটক ঃ 'বহিপীর', (ঢাকা : ১৯৬০;)। 'সুড়ঙ্গ', (ঢাকা : ১৯৬৪)। উজানে মৃত্যু(ঢাকা : ১৯৬৪)। 'তরঙ্গ ভঙ্গ' (ঢাকা : ১৯৬৫)।

প্রবন্ধ ঃ 'জয়নুল আবেদীন' ঃ 'এ ভিকটিম অব ফ্রাংক ক্রিটিসিজম' (প্রবন্ধ),

প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ Ugly Asians' (ঢাকা : ১৯৬৭)।

'দুই তীর' সংকলনের গল্পগুলো হলো 'দুই তীর', 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী', 'পাগড়ি', 'কেরায়া', 'নিষ্ফলজীবন', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'মালেকা', 'স্তন', 'মতিনউদ্দিনের প্রেম'। এর মধ্যে 'দুইতীর' 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' 'কেরায়া' 'পাগড়ি' ও মালেকা' গল্পগুলোতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

'দুইতীর' গল্পে স্ত্রী হাসিনা উচ্চবিত্ত ও স্বামী আফসারউদ্দিন নিম্ন বিত্ত থেকে আগত। আফসার উদ্দীন উচ্চশিক্ষা ও বড় চাকুরীর সুবাদে হাসিনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। হাসিনা ও আফসার উদ্দীন দুই তীরের বাসিন্দা। আফসার উদ্দিন উচুঁতে উঠলেও পূর্বের নিম্নবিত্তীয় অবস্থাকে ভুলতে পারেনি। "প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় ক্যানভাসের ডেক চেয়ারে বসলে পায়ের সামনে আব্দুল ঝুঁকে পড়ে তার জুতা মোজা খোলে। ভৃত্যের এ

Dhaka University Institutional Repository

সেবায় আফসার উদ্দীন যে আনন্দবোধ করেন, তা নয়। বরঞ্চ জুতা ভৃত্যের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে প্রতিদিন কেমন জড়তা বোধ করে, তার পা দুটি পাথরের মত ভারি হয়ে উঠে"। [১]

বাইরের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের সাথে ভিতরের দ্বন্দ্বাকীর্ণ মানস স্থির হতে পারে না। "সে আশা করেছিল নিত্যকার এ সাহেবিয়ানা অনুষ্ঠানে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু এখনো হয় নাই। ভাবে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটাবে। তাও হয়ে ওঠে না। দু'বছর আগে কেউ আফসার উদ্দীনের জুতা খুলত না। বস্তুত একটি মানুষের দিকে পা বাড়িয়ে দেবে এমন কথা সে কল্পনা ও করতে পারত না"। (পৃ. ৬৯)

আফসার উদ্দিনের শ্রেণী ও বিত্তগত অবস্থানকে গল্পকার বিস্তৃত পরিসরে বর্ণনা করে- ভিতরের দ্বন্দ্বকে মোটাদাগে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। "তখন সে মেসবাড়ির হাওয়া বদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বাস করত। তার ঘরের দেয়ালে আর্দ্রতাজাত মানচিত্রের মত নকশাটি এখনো সে স্পষ্ট দেখতে পায়। এমনকি মনে হয় হাত বাড়ালেই সে যেন দেয়ালটা ছুঁতে পারে। তারপর নড়বড়ে চৌকিটা, ডালে তেলাপোকা, খিত খিত ঠান্ডা আনোনা তরকারি, পচা মাছ ঘোলাটে গ্লাসে পানি- কিছুই তার বর্তমান খোলামেলা উজ্জ্বল জীবনের ম্লান হয়ে যায় নাই।... যে জীবন আফসারউদ্দিন পশ্চাতে ফেলে এসেছে হয়তো তার দৃঢ় আলিঙ্গনে এখনো সে আবদ্ধ।" (পৃ.ঐ)

আফসার উদ্দিনের ফেলে আসা অতীত জীবনের প্রতি মমতা নেই। তারপরও দু'বছর চেষ্টা করেও আভিজাত্যে ভরা নতুন জীবনকে মনে প্রাণে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও দারিদ্রে জর্জরিত ছিলো সে জীবন। আর্থিক স্বচ্ছলতার কোন কমতি নেই, তবে মনের মধ্যে একটা অজানা ভয় সব সময় লেগেই আছে। এ ভয় বা শঙ্কার কারণ সম্পর্কে সে সন্দিহান। চাকর আব্দুলকে দিয়ে জুতা মোজা পরা, মোজা খুলে বারান্দায় ঝুলানো, আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে 'দেহের নগ্ন উপরাশ' ঘষা, দেহে তেল মালিশ করা থেকে শুরু করে সাহেবিআনার তো কোনো কমতি নেই। শূন্য আকাশে মেঘের মতো আফসারউদ্দিনের মনের আকাশে একটা ছায়া, একটা ব্যবধান বা পুল দু'ই জীবনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে আছে। স্ত্রী হাসিনাই যেন ব্যবধানটা প্রকট করে তুলেছে। স্বামীর বিত্তহীন পূর্বজীবনের সাথে বর্তমানের জীবনকে মেনে নিতে পারছে না।

আফসারউদ্দিনের শ্বশুর আরশাদ আলী ও দাদাশ্বশুর আরবাব আলী উচ্চপদস্থ চাকুরীজীবী ছিলো। পূর্ববঙ্গের পরিচিত খানদানি বংশ। আরশাদ আলীর জীবন ও দ্বন্দ্ববিহীন- নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না। স্ত্রী মরিয়ম খানমের সাথে দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব বিরাজ করতো। "অবসর জীবনের এই অলস, সময় বহুল দিনে আরশাদ আলীর মনে অর্থশালী খানদানি বংশের প্রতি বিতৃষ্ণা অবজ্ঞা এবং অনাস্থার সৃষ্টি হয়।

---

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ- রচনাবলী: (২) সৈয়দ আকরম হোসেন সংগৃহীত-সম্পাদিত: বাংলাএকাডেমী: ঢাকা। প্রথম প্রকাশ-১৯৮৭, পৃ.৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ভাবেন, জীবন থেকে তিনি কোনোই তৃপ্তি লাভ করেন নাই; জীবন তাঁকে শূন্য পাত্রই ফিরিয়ে দিয়েছে। তার জন্য তিনি তাঁর পরিবারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, যাদের জীবন সংগ্রামের কোনো অভিজ্ঞতা নাই, প্রভূত অর্থ সম্পদ, আয়েশ বিলাসের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা অন্তঃসারশূন্য। যারা মনুষ্যত্ব বিবর্জিত, জীবনের সুধাপান করা তাদের তাদের পক্ষে সম্ভব নয়"। (পৃ ৭৩)

আফসারউদ্দন আশায় ইঙ্গিতে জানতে পেরেছে হাসিনার সাথে তার বিয়েতে হাসিনার পরিবারের মত না থাকার কারণ তাঁর দারিদ্র জর্জরিত অতি সাধারণ পারিবারিক পটভূমি। শ্রেণীগত অবস্থান কত অনঢ়। জীবনে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েও স্বীকৃতি নেই। আভিজাত্যের ফানুশভরা সমাজে মানবিকতার কোন মূল্য নেই। অভিজাত শ্রেণীর পূর্বাপর ধারবাহিকতার ইতিহাস নখদর্পণে রাখতে হয়। হাসিনা তাঁর মা মরিয়ম খানম ও বাবা আরশাদ আলীর যোগ্য উত্তরসূরী বলতে হয়। মা-বাবার জীবনের দ্বন্দ্বই যেন সে কড়ায় গোন্ডায় বহন করে চলেছে। দ্বন্দ্বে-সন্দেহে শেষ হয় আফসার উদ্দিন-হাসিনার দাম্পত্য জীবন। "অবশেষে আফসারউদ্দীন সুস্থির হলে এবার শান্ত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে সে সুস্পষ্টভাবে একটি মুখ দেখতে পায়। সে মুখ হাসিনা নয়, মরিয়ম খানমেরও নয়। সে মুখ আরশাদ আলী সাহেবের। তার বয়স ক্লান্ত মুখে যেন গভীর পরাজয়ের ছায়া"।

'দুইতীর' গল্পে আফসারউদ্দীন ও হাসিনা এক ঘরে বাস করেও শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে একটা দূরত্ব বজায় রেখেছে। গল্পকার প্রকারান্তরে শ্রেণী চেতনার সুরে শ্রেণী দ্বন্দ্বকেই নির্দেশ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদের অভিমত, "গল্পটিতে ওয়ালীউল্লাহ আলো ফেলেছেন সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া মুৎসুদ্দী শ্রেণীর ভিতর বাড়িতে, সেখানকার আপাত উজ্জ্বলতার আড়ালে যে হতাশা, বঞ্চনা, দীনতা, নিষ্প্রেম তারই চিত্রাংকন করেছেন তিনি। ওয়ালীউল্লাহ নিজে ছিলেন এই শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, তিনি এই শ্রেণীর কুৎসিত দিকটিই তুলে এনেছেন তাঁর বহু ছোট গল্পে"।[২]

একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে একদিকে অপরিনামদর্শী-উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তা ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যদিকে গৃহহীন উন্মুল, নিম্ন আয়ের চাকুরীজীবী মানুষের অসহায়তা ও তৎজনিত ক্ষোভ। এ গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে কলতকাতা থেকে আগত কয়েকজন উদ্বাস্তু কর্মচারীর একটা পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়ীতে থাকাকে কেন্দ্র করে। মূলতঃ ছোট গল্পের ছোট পরিসরে জীবনের গভীর কোন তাৎপর্যকে ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহর সুনাম রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পে উদ্ভ্রান্ত জীবনের গভীর সমস্যাকে ইঙ্গিতের সাহায্যে বুঝাতে চেয়েছেন তিনি। কলকাতার ঘিঞ্জি স্যাঁতস্যাতে এলাকায় গাদাগাদি করে কোনো রকম মাথাগুজে বাস করতো ওরা। আশ্রয়হীন, উদ্বাস্তু জীবনের উৎকণ্ঠা থাকলেও কলকাতার তুলনায় প্রশস্ত ও খোলামেলা পরিবেশে লোক শূণ্য বাড়ী পেয়ে অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল।

একদিন সকালে নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করার সময় মোদাব্বের উঠানে পায়চারি করতে গিয়ে 'একটি তুলসী গাছ' দেখতে পায়। তার চেঁচামেচিতে সকলে ছুটে যায়। ভেবেছিল সাপ খোপ দেখবে তারা। কিন্তু না, মোদাব্বের চিৎকার দিয়েছে হিন্দুয়ানী প্রথা ও সংস্কৃতির চিহ্ন দেখে। সে যে গোড়া মুসলমান! হিন্দুধর্মের পূজা অর্চনার সামগ্রী তার তো পছন্দ হবে না। তাইতো মোদাব্বের নির্দ্বিধায় বলেছে। "দেখছো না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসী গাছটা দেখতে পাচ্ছো না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না"। (পৃ.৮৮) এবার সবাই বুঝে গেল, এটা আসলে পরিত্যক্ত হিন্দুবাড়ি। প্রথম দিকে হৈচৈ হলো বেশ। দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাধ্যমে অবশেষে তুলসি গাছটা বেঁচে গেল। সবার অজান্তে কেউ একজন তুলসী গাছটার পরিচর্যা করতে শুরু করেছে। মতিন ভাবছে সেই লাল পেড়ে কালো মসৃণ শাড়ি পরিহিতা হিন্দু নারীর কথা। "আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে, তখন প্রতিদিন এ তুলসী তলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছল ছল করে ওঠে। (পৃ.৮৯) ওদের মধ্যে ইউনুসের সর্দির উপক্রম হলে সে তুলসী গাছটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়। "থাকনা ওটা। আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসী গাছ থাকা ভালো। সর্দি কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী"। ওদের মধ্যে এনায়েত মৌলভী গোছের মানুষ। মুখে দাঁড়ি আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, কোরান তেলাওয়াত করে। গল্পকার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন- এনায়েতের আত্মসমালোচনা ও আত্মোপলব্ধির প্রসঙ্গ এনে। "প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি"? (পৃ.ঐ)

তুলসী গাছটা অক্ষত থাকলেও তাদের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দতার ভাব থেকে যায়। সান্ধ্য আড্ডায় বাকবিতন্ডা করে তারা যেন ভুলে থাকতে চায় মনের দুর্বলতা ও তুচ্ছতাকে। রাজনীতি, অর্থনীতির বদলে আজ সাম্প্রদায়িকতার আলোচনাই প্রাধান্য পেল। মোদাব্বের সরাসরি বলে, "ওরাই তো সবকিছুর মূলে, ... তাদের নীচতা. হীনতা, গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হল"। (পৃ.৯০) মোদাব্বেরের কথার সমর্থনে হিন্দুদের অত্যাচর নির্যাতনের দৃষ্টান্ত দিয়ে সকলের রক্ত গরম হয়ে যায়। ওদের মধ্যে বামপন্থী বলে পরিচিত মকসুদ প্রতিবাদ করেও থেমে যায়।

পুলিশ এসেছে। মতিন প্রশ্ন করে পুলিশকে কি জন্য এসেছে তারা। পুলিশের নেতা বলে,- "আপনারা বে-আইনীভাবে এ বাড়িটা জব্ধ করেছেন।

২। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য। প্রকাশক- মোহাম্মদ আমিন। প্রকাশ-১৯৮১, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম। গভর্ণমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে"। মকসুদ চুপ থাকতে পারেনা। "আমরা কি গভর্ণমেন্টের লোক নই"? (পৃ.৯১) পুলিশ কনেষ্টলরা অবাক হয় এদের নির্বুদ্ধিতা দেখে। ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু জীবনে কোনো রকম একটা আশ্রয় পেয়ে আবার ছাড়তে হচ্ছে সেটা। মাথা কতক্ষণ আর ঠান্ডা রাখা যায়। বেঁচে থাকা যেখানে একটা নাটকের মহড়ার মতো। হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব, ধর্মের গন্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে এসে ভয়ঙ্কর ধ্বংস বয়ে এনেছে। মানুষ দিশেহারা হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে যাচ্ছে হিন্দুস্থানে, হিন্দুস্থান থেকে চলে আসছে মুসলমানরা পাকিস্তানে। সহায়-সম্পদ, বাস্তুভিটা সব পেছনে ফেলে আসছে যাচ্ছে। এসবের দায় দায়িত্ব কে নেবে? কংগ্রেস মুসলিম লীগের নেতারা এর কি সমাধান দেবে?

সরকারী আদেশে তাদের উচ্ছেদ করার পর, তুলসী গাছটার মতো শুকিয়ে যাবার মতো হলো মোদাব্বের, মকসুদ, বদরুদ্দিন, ইউনুসদের জীবন। রাষ্ট্রনায়কদের সিদ্ধান্ত বড়ো নির্মম। মানুষের জীবনজীবিকার দায়িত্ব তাদের কাছে ছেলেখেলার মতো। তাদের হুকুম তামিল হলো। ছাড়তে হলো আশ্রয়। গল্পকারের চমৎকার বর্ণনা। "তারপর প্রকান্ড সে বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেবে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানারকম বিদ্রোহী ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুঁটি ধরে পড়ে থাকবে, যাবে তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেবে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা"? (পৃ.৯২)

জীবনের গভীর তাৎপর্যকে ইঙ্গিতময়তার সাথে প্রকাশ করে গল্পকার আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চান না যে, মানুষের জীবন-জীবিকার দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হয়। গল্পের শেষেও সে প্রতীতী ব্যক্ত হয়েছে এভাবে। "উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছল ছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি। কেন পড়েনি সে কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা"। (পৃ.ঐ)

একটি তুলসীগছের কাহিনী গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ ভাবে আসেনি, কিন্তু বলা যায় উদ্বাস্তুদের এই পরিণতিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অভাস আছে। পাকিস্তান হিন্দুস্থান সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান বড় বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্বের কারণে। '৪৭ এর ১৫ আগষ্টের পর মূলত: পাকিস্তানে মুসলিম ধনিক শ্রেণী ভারতে হিন্দু ধনিকেরা আধিপত্যে ছিলো। রাষ্ট্র ছিলো তাদের নিয়ন্ত্রণে। সেই কারণে দরিদ্র বিত্তহীন উদ্বাস্তুরা, পরিত্যক্ত বাড়িতেও টিকে থাকতে পারেনি। ধনী শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে তারা টিকে থাকতে পারেনি। আমরাও সরকারী লোক বলে মকসুদ যে প্রতিরোধ গড়তে চেয়েছিল সেটা শেষ পর্যন্ত করুণ পরিহাস হয়ে উঠেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

'কেরায়া' গল্পে এক শ্রেণীতে আছে মাঝি-মাল্লা ও তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, অন্য শ্রেণীতে আছে মহাজন ও তাদের শোষণ নির্যাতন। কেয়ারা নৌকার মাঝি ওরা। চরাচর বিস্তৃত অন্ধকার রাত্রের নীরব সাক্ষী মাঝিরা-নৌকায় বসে রাতের প্রহর গোনে। অতল অন্ধকারে পৃথিবী তলিয়ে যাবার দৃশ্য ও দেখতে হয়-'কেরায়া' গল্পের মাঝি মাল্লাদের। দিনের পর দিন তারা অপেক্ষা করে,-"হাট খোলার পাশে নোঙর করা নৌকায় তারা বসে আছে শূন্য হাতে, রিক্ত-নি:স্ব হয়ে। তাদের অপেক্ষার শেষ হয় নাই। মহাজনটি সেদিন বলে গিয়েছিল আসবে বলে। সে আসে নাই। হয়তো সে আসবেও না। তবু তার গুড়ের কেরায়া নেবে বলে সেই পরশু থেকে তারা নোঙর করে বসে আছে" ।(পৃ.৯৯) মহাজনরা কথা দিয়ে কথা রাখে না। অন্যান্য কেরায়া নৌকা ঘাটে ভীড়ে আবার চলে গেছে। হাট ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু তাদের যাওয়া হয়নি মহাজনের না ফেরার কারণে। জোয়ান মাঝিদের মনে হয়। "মহাজনের পা আছে; কেরায়ার পা নাই। মোটা মহাজনটির মতো নৌকাটিও যেখানে খুশি যেতে পারে, যে ঘাটে মন চায় সে ঘাটে, যে নদীতে দিন পড়ে সে নদীতে। তার বৈঠা লগি আছে, পাল আছে, জোয়ান দু'জন মাঝিও আছে। কিন্তু কেরায়া নৌকা কেরায়া ছাড়া যায় কোথায়? জোয়ান মাঝি দু'টির পেটে, এতিম ছেলেটার পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলে। দূর গাঁয়ে তাদের বাড়ীতেও সে আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি করে"। (পৃ.ঐ)

এভাবে অপেক্ষার মাঝে নৌকার অভ্যন্তরে শক্ত পাটাতনের ওপর একজন মুমূর্ষু বুড়োর আবির্ভাব ঘটে। ছোট মাছগুলো তাড়া খেয়ে নৌকার মধ্যে পড়ে কানকো হাপরের মতো করে যেমন ওঠানামা করে -এ বুড়ো লোকটিরও সকাল থেকে তেমন দশা। লোকটি মাঝিদের আত্মীয়স্বজন নয়। বুড়ো লোকটা জীবনের শেষ বাসনা ব্যক্ত করে। মৃত্যুর সময় সে নিজ গ্রামে আপনজনের মধ্যেই থাকতে চায়। কিন্তু কেরায়া নৌকার জোয়ান মাঝি দু'জন গুড়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

তিন দিন আগে থেকে ওই মোটা মহাজনের আগমনের আশ্বাসে তারা এখানে নোঙর করে আছে। গুড় নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা যাবে কি করে? এদিকে বুড়ো লোকটিকে নৌকায় করে নিয়ে যেতে অসম্মতিও জানায়নি মাঝিরা। মুমূর্ষু বুড়ো লোকটি নৌকার ছইয়ের তলায় মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে। লোকটি বাড়ীতে গিয়ে মরতে চায়, অথচ এখনও গুড় আসেনি। আবার রাত আসে। পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দের সাথে বুড়ো লোকটির গোঙানি অন্ধকারে মিশে যায়। সেদিকে মাঝিদের ভ্রূক্ষেপ নেই। মহাজনের প্রতি ক্রোধ ক্রমেই বেড়ে যায়। "তারপর রাত্রির ঘন তমিস্রার মধ্য থেকে আসে ক্রোধ। তারপর সে ক্রোধ তাদের শক্ত মজবুত জোয়ান শরীরের আবরণের তলে মোটা মহাজনের বিরুদ্ধে ধিকি ধিকি করে জ্বলে। .... তারপর তাদের ক্রোধ বাড়তেই থাকে, তার শিখা উঁচু হয়ে ওঠে। কাল তারা খালি হাতে ফিরে যাবে। নৌকায় যাত্রার শেষে কেউ নেই, তা নয়। সেখানে সংসার আছে, বউ বাচ্চা পুষ্যি আছে,

Dhaka University Institutional Repository

তারা অপেক্ষা করে তাদেরই জন্যে-যারা দূরে দূরে নৌকা নিয়ে যায় কেরায়ার সন্ধানে। বাড়িতে যারা থাকে তারা অপেক্ষা করে। পাখির ছানার মতো নীড়ের নিরাপত্তায়, গভীর বিশ্বাসে তারা অপেক্ষা করে"। (পৃ ১০০)

মাঝিদের বাড়ীর স্বজনদের অপেক্ষা আশা ভরসা সব সব দিন পূর্ণ হয় না। কখনও বা পয়সাকড়ি, খাদ্য ছাড়াই শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। হৃদয়ে তখন শূন্যতা কাজ করে। বুক জুড়ে ভীতি ও অসহায়তা কাজ করে।। পাখির ছানার মতো ছোট হয়ে যায় তখন তারা। আকাশের মত শূন্যতা গ্রাস করে তাদের। ক্রোধতো আর সব সময় থাকে না। ক্রোধ না থাকলে কেরায়া নৌকারি মাঝিদের গ্রাস করে শূন্যতা। মোটা মহাজনের অমানুষিক আচরণের কথা মনে করে রাগটা বাড়তে চেষ্টা করে। রাগের আগুন তো স্থায়ী হলে চলবে না। বেঁচে থাকার তাগিদে রাগ করে বসে থাকলে তো মাঝিদের চলে না। তারা মুমূর্ষু বুড়োকে নিয়ে সারা রাত অপেক্ষার পরে গন্তব্যের জন্য 'নৌকার নোঙর তুলে নেয়'। বুড়ো লোকটার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। জীবিত অবস্থায় তার আর বাড়ী ফেরা হয়নি। প্রিয়জনদের কোলে মৃত্যুর সাধটা অপূর্ণই থেকে গেল।

এ গল্পে কেরায়া মাঝিদের জীবিকার উপায় ও মোটা মহাজনের মাল পরিবহনের অসঙ্গতি, মহাজনের প্রতি ক্ষোভের বহি:প্রকাশ, আগন্তুক মুমূর্ষু বৃদ্ধের আর্তনাদ, অসহায় আবেদন-সবই বৈষম্যের কাথাই বলে। গল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চেতনা প্রবাহের আলোকে রূপকাশ্রয়ী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক অসঙ্গতিকে চিত্রায়িত করতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'পরাজয়', 'মৃত্যুযাত্রা' প্রভৃতি গল্পের মতো কেরায়া গল্পের বৃদ্ধের মৃত্যু নিয়ে মরমীভাবের আবহ–'কেরায়া' গল্পটিকে আচ্ছন্ন করলেও মাঝিদের আলাপচারিতায় একটা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।

'পাগড়ি' গল্পে খানবাহাদুরের অবস্থান শোষক শ্রেণীতে। পাশাপাশি শোষিত বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে খান বাহাদুরের 'পাগলি স্ত্রী'। এই দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব জিজ্ঞসায় গল্পের মূল বক্তব্য প্রসারিত হয়ে শ্রেণী দ্বান্দ্বিক আবহের সৃষ্টি করছে।

এ গল্পে ধর্মের ধবজাধারীদের অধর্মের কাজ এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর নারী লোলুপ চেহারার কদর্য রূপ ধরা পড়েছে। ওয়ালীউল্লাহ বরাবরই ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধী। তার লেখায় বার বার ফুটে উঠেছে ওই শ্রেণীর জিঘাংসু চরিত্র। অসম সমাজ ব্যবস্থাকে কখনো মেনে নিতে পারেননি তিনি। বহু বিবাহ ছিল তৎকালীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য। নারীদের মতামতের কোনো মূল্যই ছিল না সে সমাজে। 'পাগড়ী' গল্পে খান বাহাদুরের পাগলী স্ত্রী এ সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত নারীর প্রতীক। খান বাহাদুর মোত্তালেব সাহেব স্বার্থান্ধ শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। পরিবারে বিকৃত মস্তিষ্কের স্ত্রী ও ছয়টি বয়:প্রাপ্ত ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও খান বাহাদুর পুনরায় বিয়ে করেন গরীব ঘরের মেয়ে। বয়সের আধিক্য ও বড়ো ছেলে মেয়েদের কারণে

Dhaka University Institutional Repository

বিয়েটা অবশ্য অনাড়ম্বরেই সম্পন্ন হলো। বৃষ্টিভরা গভীর রাতে যখন নতুন বউ নিয়ে খান বাহাদুর সাহেব বাড়ি ফিরলেন-চাকর ঝিরা অসঙ্কোচে এগিয়ে এলো না। সবাই যেন লজ্জা পাচ্ছে। চুপেসারে কোনোরকমে পার পেয়ে গেলেই হলো। দরজায় করাঘাত করলে, –"পাগলী মা-ই দরজা খোলেন। তারপর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে বৃষ্টির দিকে যেন তাকান, তারপর আপন মনে একবার হাসেন। অবশেষে অকারণে মুখ ব্যাদান করে-ভেতরে চলে যান, একবার দেখেনও না কে এসেছে না এসেছে। মেয়েরা ততক্ষণ উঠে পড়েছে। ওঘরে ছেলেরাও"।(পৃ.৯৮) পাগলি স্ত্রীই যেন করুণা করল। "আজবোধ হয় ও অজাগতিক নিঃশব্দতার মধ্যে হঠাৎ তিনি অর্ধসংবিৎ ফিরে পান। প্রথমে তবু চোখে কিছু বিভ্রান্তভাব ও অস্থিরতা থেকে যায়। তারপর মেজো মেয়ের দিকে তিনি যখন তাকান, তখন তাঁর চোখে একটি সুস্থ সন্ধানী তীক্ষ্ণতা জেগে ওঠে"।(পৃ.৯৬)

পাগলি মায়ের হাসি যেন পুরুষশাসিত সমাজের প্রতি বিদ্রূপ। ক্ষমাবতী নারীর ভূমিকায় তাকে অবিচল থাকতে দেখা গেল।

মস্তিষ্ক বিকৃত মা ও মেয়ের অনুভব শিল্পিত। "দাঁত দিয়ে সূতা কাটতে গিয়ে মায়ের দৃষ্টি মেজো মেয়ের নজরে পড়ে। পড়লেই সে কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে সংযত করে। কেবল তার সারা অন্তর ডুকরে কেঁদে ওঠে। মনে মনে বলে : মা, আমাকে তুমি চিনতে পারছ? (পৃ.ঐ) এছাড়া আরো একটি মস্তবড় কটাক্ষ উপস্থাপিত হয়েছে নতুন বিবির শাড়ি, কিন্তি টুপি-পানিতে ভিজলেও 'পাগড়ি' না ভেজার প্রসঙ্গের অবতারণায় "তবে একটি জিনিস ভেজে নাই। সেটা মোত্তালেব সাহেবের দামি মাসহাদি পাগড়ি। যেমনি গিয়েছিল তেমনি সেটি হাত বাক্সে লুকিয়ে ফিরেছে"। (পৃ.৯৮)

'পাগড়ি' গল্পের সমালোচনায় সৈয়দ আবুল মুকসুদ বলেন।–"পাগড়ি গল্পটি বাঙালী মুসলমানের সামন্তবুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয় মুৎসুদ্দী সমাজের চিত্র বহন করে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন এ সমাজ শ্রেণীবিভক্ত, তেমনি নরনারীর মানবিক সম্পর্কের মধ্যেও এ সমাজে ব্যবধান মেরুপ্রম। সেই সামন্ত মুৎসুদ্দী সমাজে পুরুষেরই প্রতাপ, পুরুষ যেখানে প্রভু, স্বার্থপর, স্বেচ্ছাচারী ও লোভী, নারী এখানে বন্দিনীই শুধু নয়, সে নির্যাতনের পাত্রী, সেবিকা বা ক্রীতদাসীর চেয়ে বেশি কিছু নয়, পুরুষের নির্যাতনে অভিশপ্ত তার জীবন: সে শাসনের ও শোষণের বস্তু মাত্র"।[২] এ বক্তব্যের সমর্থনে সৈয়দ আবুল মকসুদ আরো বলেন, "এ গল্প অভিজাত মুসলমানদের, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আয়না, সমাজের একটি অনপনেয় দ্বন্দ্বের ছবি। এ গল্পের ভাষা ও নিরাভরণ নয়, শিল্পিত। ... রাস্তার ধারে ধুলোভারাচ্ছন্ন বৈঠকখানায় বসে খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব ভাবেন। ভাবেন যে সে কথা তাঁর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। চোখের নিচে মাংসের থলে। বড় গোছের চোখ দুটো তার মধ্যে ভারি দেখায়। অনেকটা মার্বেলের মতো। তাও ড্রেনের কোণে হারিয়ে যাওয়া নিশ্চল মার্বেল"।[৩]

'মালেকা' গল্পটি –'দুইতীর' গল্প সংকলনের ৭ম গল্প। এখানে মালেকা নামের স্কুল শিক্ষিকার সাথে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর দ্বন্দ্বের সাথে যোগ হয়েছে- স্কুল পরিদর্শনে নিয়োজিত ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। 'মালেকা' গল্পের শুরুতেই মালেকা নামের জনৈক স্কুল শিক্ষিকার দারিদ্রের ছাপমারা বেশভূষার বর্ণনা। "ফিঁকে কমলা রঙের তাঁতের এবং সবুজ পাড়ের মিলের জীর্ণ শাড়ি দুটি অদল-বদল করে পরে মালেকা আজ ছ'মাস যাবৎ এ পথে আসা যাওয়া করছে"।(পৃ.১২২) স্কুলের চাকুরীটা পাবার আগে সে এমন হাঁটেনি। প্রথমে পথটা অতিক্রম করতে দীর্ঘ মনে হত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে হেঁটে হেঁটে। হাতে ঘড়ি নেই। অভাবের সংসার। মালেকার স্বামী একবার শখ করে সস্তায় একটি হাতঘড়ি কিনে দিয়েছিল, ক'দিন পরেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। মেরামত করা হয়নি আর। স্কুলেও সচল ঘড়ি নেই। প্রধান শিক্ষয়িত্রী খুবই কৃপণ স্বভাবের। চাকরির প্রতি মায়াও প্রবল।

'শখের মায়া নয়, নিতান্তই পেটের মায়া। কী হতে কী হয়ে যায়। সে ভয়ে তিনি সদা সন্তস্ত্র থাকেন। মাগ্‌বি ভাতা সমেত মাসে মাসে পঁচাশি টাকার মতো সামান্য যে মাইনেটা হাতে আসে, তা সংসার দরিয়ায় বিন্দুবৎ পানি। তবু তা হারাবার কথা ভাবলেই তার বুকটা হিমশীতল হয়ে যায়"। স্কুল পরিদর্শন করতে এলে কি জবাব দেবে সে বিষয়ে ভাবনা কম নয় প্রধান শিক্ষয়িত্রীর। উর্দিপরা চাপরাশি নিয়ে বিভাগীয় দফতরের ইস্কুল পরিদর্শনকারিণী স্কুল পরিদর্শন করতে চলে গেলেন। প্রধান শিক্ষিকা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। ঘড়ির কথাটা বলা হলো না। বলেও কিছু হতো না বলে সহকর্মিনীদের মন্তব্য। পরিদর্শনকারিণীর বেশভূষা ও তাদের কাছে ফ্যাশনসর্বস্ব মনে হয়েছে। মনে মনে তারা প্রধান শিক্ষয়িত্রী তথা ওপরওয়ালার প্রতি অসন্তুষ্ট। "মুখের পরে বলতে পারে না কিছু। মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা ও আক্রোশ লেগেই থাকে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যান। ওপরওয়ালার বিরুদ্ধে কথা বলা নিরাপদ নয়। বললে হয়তো কালই একটা বেনামী চিঠি চলে যাবে তাঁর বিরুদ্ধে"। (পৃ.১২৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে দলাদলির শেষ নেই। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউবা এগিয়ে এলে তার পিছনে লাগার লোকও জুটে যায়। ওপরওয়ালার নজর কাড়ে কান ভাঙানির সাহায্যে। ওপরওয়ালাদের তো বাছ বিছারের বালাই থাকে না। ধরাকে সরা জ্ঞান করার কারণে অনেক সময় মহৎ উদ্যোগও ভেস্তে যায়। অভ্যন্তরীণ শত্রুতা ও দ্বন্দ্বে, সমাজের মানুষ উন্নতি ও বিকাশের পথ পায় না। ফলে সমাজ আলোকিত হয় না। গল্পে ব্যক্তিগত অবস্থান, বিশেষ করে লিঙ্গভেদের চিত্রও স্থান পেয়েছে। মালেকা একদিন ছাত্রীদের করা প্রশ্ন 'কুত্রাপি' শব্দের অর্থ বলতে পারেনি। স্বামীর কাছ থেকে সে জেনেছিল। এ কথা প্রধান শিক্ষয়িত্রী জানার পর ক্ষুব্ধ হলো। "শিক্ষকতার কাজ বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। তা মনে রেখ। আরেক কথা। 'কুত্রাপি' শব্দের অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে না জিজ্ঞাসা করে তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে ছিলে কেন? স্বামীরাও স্ত্রী মানুষের মতো গল্প করে বেড়ায়। একবার ইস্কুলের বদনাম উঠলে আর রক্ষা থাকবে না"।(পৃ.১২৫) ছাত্রীদের সামনে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশা না করার জন্য মালেকাকে প্রধান শিক্ষয়িত্রী অনেক উপদেশ প্রদান করল। সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে একটা ব্যবধানও ধরা পড়েছে প্রধান শিক্ষিকার সতর্কবাণীতে। মালেকার স্বামী ম্যাট্রিক ফেল। যাদের জমি জমা আছে,আর্থিক সমস্যা নেই; সেকালে তাদের বসে থাকাটাই ছিল প্রশংসনীয়।

যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ তখনও শুরু হয়নি। তোজাম্মল তরফদারের সাথে মালেকার যখন বিয়ে হয় তখন তোজাম্মলের জীবন যাপন আসমান সম উচ্চতায় আসীন। এখন সে জমিজমা ধান মাছ নেই। তাদের সুখের জীবনের ওপর দিয়ে প্রচন্ড ঝড় বয়ে গেছে। ঝড়ের দাপটে ভিটে বাড়ীতে ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তোজাম্মল জমি বিক্রী করে শহরে পাড়ি দিয়ে ব্যবসা শুরু করল। "ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালিয়ে এখন চাকরির উমেদারিতে চরকির মতো রাত দিন ঘোরে"। গল্পে উল্লেখিত 'দাই', মালেকাকে তার স্বামী সম্পর্কে "স্বামীটা বখাটে, বলে কটুক্তি করলে মালেকা মুখ বুজে সহ্য করে। মালেকা জানে তার স্বামী তোজাম্মল বখাটে নয়। সে আরো জানে তোজাম্মলের চোখে মুখে সব সময় একটা ভয় লেগে আছে। তোজাম্মলের ভীতির কারণ বেকারত্ব। ক'দিন ধরে গ্রামে ফিরে যাবার কথা ভাবছে সে। "শহরে যে কয়েদখানায় তারা পড়েছে, সে কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হঠাৎ সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ইস্কুল থেকে ঘরে ফিরে যাবার সময় এলে সে ভাবটি ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। ঘর মানে একটি মাত্র কামরা"। (পৃ.১২৬)

বস্তি ঘেরা এলাকায় দম বন্ধ হয়ে যায়। নালা দিয়ে বস্তির বিষ্ঠা, দুর্গন্ধভরা তরল পদার্থ ভেসে যায়। ঘরটাকে কয়েদখানার মতো মনে হয়। মালেকার কেবলই মনে হয় এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে থেকে যদি অস্তিত্বকে রক্ষা করা যেত তবে বাঁচা যেত। কিন্তু মালেকা জানে তা কত কঠিন"। "তারা শখ করে শহরে আসে নাই, প্রাণভয়েই পালিয়ে এসেছে। দেশে তাদের আর মগরা মগরা ধান নাই, পুকুর ভরা জলজ্যান্ত টাটকা মাছও নাই। সম্বলের মধ্যে ভিটে বাড়িটা আছে বটে, কিন্তু ভিটে বাড়িতে ধানের ফসল হয় না, মাছও চরে না। দেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে সে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে, সে আকাঙ্ক্ষা কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। তবে সে কথাই বা দাইকে বলে কী লাভ"? (পৃ.ঐ)

এ গল্পে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বেতন বাড়ার খবরে সহকারী শিক্ষয়িত্রীরা চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করায় শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়েছে। অনেক পীড়াপিড়ির পর কৃপণ স্বভাবের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিষ্টি খাওয়ানোতে সম্মতি প্রকাশ করলে গল্পে উল্লেখিত 'দাই', মালেকার রোগাক্রান্ত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলে। "একটা কথা বলব? মিষ্টির পয়সাটা মালেকার কাফনের জন্যে তুলে

Dhaka University Institutional Repository

রাখাই ভালো হবে"। (পৃ.১৩০) সর্বোপরি রূপক ও সাংকেতিকতার সমন্বয়ে মালেকা গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্প সম্পর্কে সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, "সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও সত্যিকারের মার্কসবাদী তিনি ছিলেন না, কিন্তু বহু বামপন্থী কমিউনিষ্ট কথা শিল্পীর লেখা ম্লান মনে হয়-ওয়ালীউল্লাহর অনেক ছোটগল্পের কাছে। বিপ্লবীও তিনি ছিলেন না, ছিলেন স্থৈর্য্যের, কোনো রাষ্ট্র বিপ্লব বা সমাজ বিপ্লবকে স্পষ্টভাবে স্বাগত জানাতে দেখা যায় না তাঁর লেখায়, কিন্তু ধনী নির্ধনের ব্যবধান তাঁকে বিচলিত ও ব্যথিত করেছিল, এটা বোঝা যায় এবং যে ধরনের নড়বড়ে অসুস্থ অসামঞ্জস্য ও ঘুণেধরা সামাজিক কাঠামোয় বিপ্লব অপরিহার্য হয়ে পড়ে সেই অবস্থাটা অত্যন্ত দরদ দিয়ে এঁকেছেন ওয়ালীউল্লাহ। সর্বহারাদের থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বহু জায়গা বিম্বিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে, কিন্তু তাঁর পক্ষপাত যেন নিরন্ন, সর্বহারা ও শ্রমজীবীদের প্রতিই। ঢাকা কলেজের ছাত্র-জীবনে ওয়ালীউল্লাহ প্রগতি লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। হৃদ্যতা হয়েছিল তাঁর সেকালের উজ্জ্বল ছোট গল্পকার সোমেন চন্দের সংগেও"।[৩]

---

৩ : সৈয়দওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য। প্রকাশক- মোহাম্মদ আমিন। (ঢাকা: ১৯৮১), পৃষ্ঠা - ৬২

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমান (১৯১৮-'৯৮)

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার সবলসিংহপুর গ্রামে শওকত ওসমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৮ সালে। তাঁর পিতার নাম শেখ মোহাম্মদ এহিয়া এবং মাতা ছিলেন গুলজান বেগম। পিতা-মাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন শেখ আজিজুর রহমান। গ্রামের মাদ্রাসায় লেখাপড়ার পর ১৯২৯ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৩৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, প্রথম বিভাগ পেয়ে; সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন ১৯৩৬ সালে, এবারও প্রথম বিভাগে। তিন বছর পর ১৯৩৯ সালে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন একই প্রতিষ্ঠান থেকেই। হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের শেখ কাওসার আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনের সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৩৮ সালে। তখন তিনি বি. এ ক্লাসের ছাত্র। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৪১ সালে, কলকাতা কমার্স কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে। দেশ বিভাগের পর যোগ দেন চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে পরিবারের সবাই হুগলী থেকে চট্টগ্রামে চলে আসে।

১৯৫৮ ঢাকা কলেজে বদলি হন। তিনি ১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় চলে যান কলকাতায়। তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যান এবং ১৯৮১ সালে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক ও ইরানে ভ্রমণ করেছেন। তাঁর লেখালেখি শুরু হয় ছেলে বেলা থেকে। প্রথমে কবিতা লেখা নিয়ে আরম্ভ হলেও পরে গদ্য রচনায় হাত দেন। নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, শিশুতোষ রচনা, ব্যঙ্গ কবিতা-লেখার পাশাপাশি অনুবাদও করেছেন। শওকত ওসমান তাঁর লেখক নাম । তাঁর রচনার তালিকা নিম্নরূপ :

উপন্যাস ঃ 'বনী আদম' (১৯৪৩), জননী (১৯৫৮), 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৬), 'সমাগম' (১৯৬৮), 'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭০), 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' (১৯৭১), 'দুই সৈনিক' (১৯৭২), 'রাজসাক্ষী, 'পিতৃপুরুষের পাপ' (১৯৭২), 'নেকড়ে অরণ্য' (১৯৭২), জলাংগী' (১৯৭৩), 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (১৯৮৩)।

ছোটগল্প ঃ 'পিঁজরাপোল' (১৯৫০), 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫১), 'সাবেক কাহিনী' (১৯৫২), 'প্রস্তর ফলক' (১৯৬৪), 'নেত্রপথ' (১৯৬৮), 'উভশৃঙ্গ' (১৯৬৯), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৭৪), 'জন্ম যদি তব বঙ্গে (১৯৭৫), এবং তিন মির্জা' (১৯৮৬), মনিব ও তাহার কুকুর (১৯৮৬), 'পুরাতন খঞ্জর' (১৯৮৭), 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৯০), 'রাজ পুরুষ' (১৯৯৪)।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু কিশোর সাহিত্য ঃ 'ছোটদের নানা গল্প' (১৯৮১), 'ওটেন সাহেবের বাংলো' ও ডিগবাজি' (১৯৬৪), 'প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৯), 'তারা দুইজন', 'মশফোন বা মশকুইটো ফোন' (১৯৭২), 'জুজুগগা' (১৯৭০), 'মুজিব নগরের সাবু বা ক্ষুদে স্যোসালিষ্ট (১৯৬৯), 'পঞ্চসঙ্গী' (১৯৯২), 'ছোটদের কথা রচনার কথা (১৯৫৭)।

নাটক ঃ 'এতিমাখানা' (১৯৮৭), 'তিনটি ছোটনাটক' (একাঙ্কিকা) (১৯৮৯), বিদ্যার বাহাদুরী ও রাখাল বাদশা (নাটিকা- কাব্য নাট্যকারে রচিত) 'কাকুর মোরগ' (১৯৯১), 'রাখাল বাদশা' (১৯৯২)।

শওকত ওসমান আদমজী পুরস্কার (১৯৬২), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৬) ও স্বাধীনতা পদক (১৯৯১) লাভ করেন। 'জননী' 'ক্রীতদাসের হাসি' 'রাজসাক্ষী' 'জলাংগী' উপন্যাস ও কিছু ছোট গল্প ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯৮ সালে আশি বছর বয়সে।

শওকত ওসমানের ১৩টি গল্প সংকলনে রয়েছে শতাধিক গল্প। সবগুলোতে শ্রেণী বিদ্বেষ ফুটে ওঠেনি। কোথাও একেবারেই নেই- কোথাও সামান্য আছে, কোন কোনটিতে সেটা মোটামুটি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। প্রতিনিধিস্থানীয় এই ধরনের ১৬টি গল্প আমরা চয়ণ করেছি। সেগুলো অবলম্বন করে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রুপ ও প্রকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পগুলো হলো 'উদবৃত্ত' (প্রস্তরফলক), 'থুতু', 'ইলেম' 'পিঁজরাপোল' ও 'দাতব্যচিকিৎসালয়ের ইতিহাস' (পিঁজরাপোল), 'হিংসাধার', 'বালকের মুখ' ও চিড়িমার (নেত্রপথ), 'সৌদামিনীমালো' ও 'নেমক হালাল' (উভশৃঙ্গ), 'প্রাইজ,' 'ইতা' ও 'টিফিন' (প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প), 'সাদাইমারত', 'দুই চোখ কানা' (জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প), 'বকেয়া ভাগাড় (সাবেক কাহিনী) :

'উদবৃত্ত' গল্পে পল্লীর সহজ সরল তরুণী আমিরণ মন্বন্তরের শিকার। দু'মুঠো ভাতের জন্যে বেছে নিতে হয়েছে দেহ পসারিণীর কাজ। মা-বাবা তার আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। আমিরণ মনে প্রাণে এ বিকৃত পথে উপার্জনকে ঘৃনা করলেও বাধ্য হয় বেঁচে থাকার তাগিদে। আৱদ্বন্দ্বে উদ্বেলিত হয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করার মাধ্যমে শ্রেণীদ্বান্দ্বিক রূপ ধরা দিয়েছে গল্পটিতে। এ গল্পে বাৎসল্য রসের ধারা (তুচ্ছ স্মৃতি; সাবেক কাহিনী গল্প গ্রন্থের) অক্ষুন্ন রেখে জীবনের মৌলিক দিকটার উন্মোচন ঘটেছে জীবন যাপনের কঠিন নিয়মে। উদর কোনো অজুহাত জানেনা, মানেনা। তার কেবল চাই আর চাই। উদরপূর্তির তাগিদে পল্লী গ্রামের সহজ-সরলা মেয়ে আমিরণ কে বেছে নিতে হয়েছে দেহ ব্যবসার কাজ। শহুরে জীবনের যান্ত্রিকতার পিছনে আমিরণ ফেলে এসেছে- প্রাণোচ্ছল–শৈশবে বাবা-মায়ের স্নেহে লালিত সুস্থ স্বাপ্নিক জীবন। পিতা মাতা কি জানে আমিরণ শহরে কি করে? তারা জানে মেয়ে শহরে চাকুরী

Dhaka University Institutional Repository

করে-টাকা পাঠায়। তাদের জীবনের সুখ স্বচ্ছলতা মেয়ের রোজগারের উপর নির্ভর করছে। অথচ তাদের অত্যন্ত স্নেহের সন্তান আমিরণ ঘৃণিত উপায়ে অর্থোপার্জন করে।

সময় গড়িয়ে যায়। চারদিকে দুর্ভিক্ষ। শিকড় তো ছেঁড়া যায়না। আমিরণ গ্লানিকর জীবন কে ভুলে থাকতে নিজ গ্রামে আসে বার বার। শৈশব-কৈশরের মধুময় দিনগুলি হাতছানি দিয়ে ডাকে। নিরস শহুরে জীবনের ইটপাথরের সাথে, ছায়াময় মায়াময় পল্লী গ্রামের টান গল্পে দ্বান্দ্বিক আবহ তৈরি করেছে। "বোরখা খুলে হঠাৎ মনে হলো ঠান্ডা ঝির ঝির হাওয়ায় বুড়িগঙ্গার ধারে হাঁটছি। তফাৎ, শুধু বোরখাটা হাতে রয়েছে, যা সেখানে থাকেনা। ঠান্ডা বাতাস, ভিড়, চেঁচামেচি। এই নির্জনতায় ঘুমন্তকাল জেগে ওঠে ঝাঁকুনি খেয়ে"।[১] মন্বন্তরের সাথে আমিরণের জীবন সংগ্রাম পাল্লা দিয়ে চলেছে। গ্রামে এসে মায়ের সাথে ঘরকন্যার কাজ তথা মায়ের সাথে চালের কাঁকর বাছা পুকুর থেকে পানি আনার মাঝেও শহরের জীবনের প্রতি মুহূর্তের ছবি ভেসে ওঠে মানসপটে। গ্রাম্য সাথীদের সাথে মনখুলে বলাও যায় না। এ অবস্থায় তো আর থাকা যায় না। উপার্জনের তাগিদ আসে বাবার দিক থেকে-'কবে যাবিরে মা'। অভাবের কাছে স্নেহ, মায়া মমতার প্রাবল্য মিইয়ে যায়। বাবার আরজি। "মা-রে আবাদের সময় পাঁচ-দশ ট্যাহা যদি বেশি দিবার পারিস তুই আমার মরদ পোলা, ব্যাডা, ব্যাডা-মাইয়া নস।(পৃ.২৪৬) আমিরণের বাপের আশীবাদ-'বিদ্যাশে আল্লা যেন তরে দ্যাহে'।

দারিদ্র মন্বন্তর মানবতাকে করেছে ছিন্নভিন্ন। দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসার মাঝে ধ্বনিত হয়েছে অসামঞ্জস্য ভরা সামাজিক কাঠামোর কদর্য সুর। এ বৈষম্যের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শাসন শোষণের ক্রুর চালিকা শক্তি। নেপথ্য থেকে রুধির ধারার মতো কাজ করে যাচ্ছে। হাজারো আমিরণকে বাধ্য করছে মানবেতর জীবন-যাপনে ও দেহ ব্যাবসা করে জীবন নির্বাহ করতে। গ্রামের বাড়ীতে পিতামাতাকে যে কিভাবে টাকা পাঠাতে হয়। কত নোংরা পথে টাকা যোগাড় করতে হয়, তা কেবল আমিরণই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। আমিরণের বাপের আশীর্বাদ বিদেশে তার মেয়েকে আল্লাহ যেন দ্যাখে। বাপের অন্ধ আশীর্বাদের কথা ভেবে আমিরণ তীব্র ঘৃনা প্রকাশ করে এ কুৎসিত জীবন যাপনে। তাইতো তার কণ্ঠে তীব্র বিদ্রুপ। "বাড়ী ভাড়া, বাড়ীওলি আর গুন্ডাদের খাঁই মিটিয়ে ক'টা টাকা আর থাকে? খামাখা আন্দেশা বা-জানের। আমাকে দেখার লোকের অভাব হয় না। সা'ব বাবু দালাল কন্ট্রাক্টর যাচনদার, বহু আছে আমার অভিভাবক। আছে বাদাম তলীর রাজা পাটোয়ারী শরীফার চোখে ধরা সোন্দর শাড়ীটা যে কিনে দিয়েছিল। যে দেয়, নেওয়ার অধিকার তারই থাকে। ... সে তো বস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে রোজই দেখে। ঘন্টার পর ঘন্টা"। (পৃ.ঐ)

১। শওকত ওসমান ; গল্পসমগ্র; সময় প্রকাশন; প্রকাশক ফরিদ আহমেদ। (ঢাকা: ২০০৩) পৃ. ২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

'পিঁজরাপোল' গল্প সংকলনে সন্নিবেশিত গল্পগুলো হলো 'থুতু', 'ইলেম', পিঁজরাপোল দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস, 'কাঁথা' 'আলিমমুয়াজ্জিন। -এর মধ্য 'থুতু', 'ইলেম' 'পিঁজরাপোল', দাতব্যচিকিৎসালয়ের ইতিহাস-গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

'থুতু' গল্পে একদিকে আছে মনসুরের মতো হতদরিদ্র চরিত্র, যার দেহে থাইসিসের জীবাণু বাসা বেধেছে। বেঁচে থাকার বাসনা ছেড়ে দিয়েছে মনসুর। সে নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি হয়েছে। বিলেত থেকে আগত জনষ্টন পরিবারের জন্য তৈরি খাবার 'কাটলেট আর জুসে' থাইসিসের জীবানু মিশ্রিত থুতু দিয়ে শাসক শ্রেণীর প্রতি ঘৃনা ও বিদ্বেষের বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে।

'থুতু', গল্প প্রথম প্রকাশের সময় নাম ছিল 'ফাদার জোহানেস' পরবর্তী সময়ে 'থুতু' নামকরণ করা হয়। নামকরণের পিছনে কারণটাও যুক্তিসঙ্গত। গল্পের আলোচনায় সেটা স্পষ্ট হবে। ছোট নাগপুরের গীর্জাসংলগ্ন গোয়ালা পল্লীকে ঘিরে 'থুতু' গল্পের কাহিনী রচিত। এ অঞ্চলের খাদ্য সংকট, চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতা কঠোর পরিশ্রম ও বিনোদন বা পেশা হিসেবে নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ গল্পের আঙ্গিককে করেছে বেগবান। 'থুতু' গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নিপীড়িত জনমানুষের ছবি। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পাকাপোক্ত করার মানসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আড়ালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পশ্চাদপদ, দরিদ্রশ্রেণীর অভাব অনটন কে কাজে লাগায়। উপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করতেও সক্ষম হয়। অবশ্য ধর্ম প্রচারণার উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও ছিলো।

'থুতু' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র বলে পরিচিত 'ফাদার' একজন প্রকৃত ক্রীশ্চান। ফাদার জোহানেস নামের এ যাজকের বাড়ী ইংল্যান্ডে হলেও জীবনের মূল্যবান সময়গুলো অনগ্রসর, আদিম মানুষের সাথে অতিবাহিত করেছেন। তিনি মানুষের মাঝেই ঈশ্বরের অস্থিত্ব অনুভব করেন। জীবনের প্রথম প্রভাতে ফাদার ভেবেছিলেন হতাশা গ্লানি ক্ষুধা থাকবে না পৃথিবীতে। স্বপ্নের সেই মানবভূমিতে থাকবে না কোন বৈষম্য। ফাদারের সে স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। একান্ত নিভৃতে তারকা খচিত আকাশের দিকে চেয়ে ফাদারের বুকে হতাশার স্তুপ জমা হয়। মনে হয় কেন এই ব্যবধান? কেন এই বৈষম্য? এত শোক জরা-মৃত্যুর বা কারণ কি? ফাদারের অনুসারী মুরিদ-মনসুর ও তার ভাগিনেয় আশেক। এদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে দুর্ভিক্ষের ছবি তাদের হাড্ডিসার অবয়বে পুরোপুরি বিদ্যমান।

এক পর্যায়ে গল্পের নাটকীয় পট পরিবর্তন দেখা যায়,- বিলেত থেকে জনষ্টন পরিবার এখানে (ছোট নাগপুর, গোয়ালা পল্লী) বেড়াতে এসেছে। তারা সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল খাবারের সাথে যক্ষ্মার জীবাণু। "ডাক্তারের রিপোর্টে তারা স্তম্ভিত। কাটলেট আর জুসে থাইসিসের জীবাণু মাখা থুতু পাওয়া গেছে। তাদের শরীরে ও জীবাণুর বাসা বাঁধা বিচিত্র নয়"।(পৃ.৮৬) মনসুরের প্রতিশোধ স্পৃহার খবর জানা হয়ে গেল। মনসুর জানত তার শরীরে যে রোগ বাসা বেঁধেছে তা থেকে নিস্তার নেই। অভাব অনটনে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

না করতে পেরে মা-বোন অকালে প্রাণ হারিয়েছে। মনসুরের তো সামর্থে কুলাবে না-শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ বা সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে। কৌশলে সে খাবারে জীবাণুমাখা থুতু দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামকে পরোক্ষভাবে হলেও চরিতার্থ করতে সক্ষম হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস লীলায় পাশ্চাত্য দেশগুলির সাথে ভারতবর্ষও জড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধ সংক্রান্ত ধ্বংস ও ক্ষতি শওকত ওসমানের অন্যান্য গল্পে ও কম বেশী আছে। 'থুতু' গল্পে বৃটিশ শাসকের অত্যাচার নিপীড়নের চিত্রটা আলাদা মাত্রা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। সামান্য থুতুর প্রতীকে গল্পকার প্রতিবাদের ভাষাকে বেগবান করেছে। মনসুর নির্ভীক চিত্রে সত্য প্রকাশ করে। সে জানে প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান তার। প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে যাবে হয়তো। "ফাদার জোহানেস পাথরের মত স্তব্ধ হোয়ে বসে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন: তোম মেরা খানামে থুক দেতা? কভি কভি, ফাদার। মনসুর নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিচ্ছে। কিঁউ এয়সা কাম করতা? মেরা বহেন কো আপনে দেখা। বেগায়ের খানা-মেরা দেশকা বহুৎ আদমী মেরা মা" ।(পৃ.৮৭) গল্পে ফাদার জোহানেসের মানবপ্রেম ও সংস্কার তথা উন্নয়নকামী চিন্তা ও কর্মপরিকল্পনা উল্লেযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। মনসুরের প্রতিশোধ প্রবণতার পাশে ফাদার জোহানেসের ক্ষমাপ্রবণতা, দ্বান্দ্বিক আবহের সৃষ্টি হতে সহায়তা করেছে। দ্বন্দ্ব সংগ্রামের আরো কিছু উদাহরণ গল্প থেকে দেয়া যাক। -"মহাসংগ্রাম হিংস্র পাশবতায় দানবের প্রতিমূর্তি রূপে জেগে উঠেছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। আফ্রিকার উপকূলে মারণাস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, বলকান গ্রীসের নগরীতে রণতান্ডবের দামামা বাজছে। খার কভের তুহিন প্রান্তরে আদমের সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সূর্যরশ্মির আস্বাদ গ্রহণে আর তারা জাগবে না। ফাদার জোহানেসের সম্মুখে হিংস্র বর্বরতা, শ্বাপদ জিঘাংসার প্রতিচ্ছবি। গাইড্যাগরা উৎসবের নির্মমতা তার পাশে প্রণয়া-চুম্বন" ।(পৃ.৮১)

"মনসুরের এই কাজ প্রতিশোধমূলক। সে জানত তার শরীরে কালব্যাধি বাসা বেধেছে। এক ফোটা ওসুধ পথ্য ও পুষ্টির অভাবে মা ও বোন অকালে মরেছে সুতরাং মনসুর এই শাসকবর্গকেও বাঁচতে দেবে না। মনসুরের এই অপরিসীম ঘৃণা Rudiard Kipling এর 'Lispeth' গল্পের নায়িকাকে মনে করিয়ে দেয়। একদা সে খ্রীষ্টান পরিবারকে নিজের আত্মার আত্মীয় ভেবেছিল। পরবর্তীকালে দেখল তা সত্য নয়। এই দম্পত্তি তাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেনি। আসলে সে ছিল 'Half Servant, half Companion', Lispeth তা বুঝতে পারেনি। যখন তাদের সমশ্রেণীর একজনকে (Whiteman) বিবাহ করতে চাইল তখনই সৃষ্টি হলো বিরোধ। বৈষম্যের কথা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

'ইলেম' গল্পে ইলেম অর্থাৎ শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সাম্পান চালক, দিনমজুর জহিরের কাছ থেকে কাষ্টস ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা ঘুষ নেয়। জহির মিয়া অসুখের কারণে সামান্য আফিম কাছে রেখেছিল। সে জন্য তাকে আফিম রাখার খেসারত হিসেবে কাষ্টমস কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হয়েছিল। অথচ বড় বড় চোরাকারবারীরা তাদের কাজ চালিয়েই যাচ্ছে। সে দিকে কাষ্টম

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারীদের তেমন মাথা ব্যথা নেই। বরং চোরা কারবার বেড়েই চলেছে। এতে করে জহির মিয়ার ছেলের ইলেম শিক্ষার প্রতি আক্রোশ প্রকারান্তরে কাষ্টমস ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ জহির মিয়া মনে করে ইলেম শিখে কাষ্টমস ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা ঘুষ নিয়ে-ইলেমের অমর্যাদা করেছে।

অল্পকথায় ছোট করে ব্যক্ত করার কুশলতা শওকত ওসমানের ছোটগল্পে নেই। বড়ো আয়োজনে অনেক গল্পের ভাব চাপা পড়েছে। পারিপার্শ্বিক বর্ণনা দীর্ঘ হওয়ায় গল্পের মূল থিম বুঝতে যথেষ্ট পরিশ্রম দাবী করে। 'ইলেম' গল্পে উক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ঘটনার ঘনঘটাও বর্ণনার অতিরঞ্জণ শেষে গল্পের মূল বক্তব্য উদ্‌ঘাটিত হতে দেখা যায়। জহির মিয়া সাম্পান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কাষ্টমস ডিপার্টমেন্টের সদস্যরা রাতে নৌকা চেক করে অবৈধ কিছু পেলে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা না করে ঘুষের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। এতে করে অবৈধমাল বহন করা বন্ধ না হয়ে বেড়ে যায়। আফিমের খোঁজটা বেশী হয়। জহির মিয়া ছেলেকে জড়াতে চায় না এ কাজে। ছেলেকে লেখা পড়া শেখাতে চায়। ছেলের জন্য প্রয়োজনীয় বই নিয়ে বাড়ীর দিকে যাবার সময় কাস্টমের নৌকা তার নৌকাকে ঘিরে ধরল। জহির মিয়া অসুখের কারণে মাঝে মধ্যে আফিম খায়। ওই দিন পুটলির মধ্যে কিছু আফিম ছিল। কাস্টমের লোকেরা সেটা দেখতে পায়। "একটি কনেষ্টবল করিমকে ইঞ্জিন রুমের এক দিকে লইয়া গেল। আবছা অন্ধকার জায়গাটা। নিচে স্রোত তরতর বহিয়া যাইতেছে। বন্দোবস্ত করো, মিয়া। হাজার হাঙ্গামা। থানায় যাও, একদিনের রুজি কামাই। বাঘে ছুঁলে .... বেকসুর। ..... কনেষ্টবল এবার জহিরকে ইঞ্জিন রুমের দিকে লইয়া গেল। পৌছানো মাত্র করিম বলিলঃ আছে গাঁঠৎ পাঁশ টিয়া?----হ।" (পৃ.৯৩) হুমকি ধমকি- খেয়ে থানা পুলিশের ভয়ে জহির মিয়া কাছে রাখা পাঁচ টাকা সম্বল কনেষ্টবলকে দিয়ে দেয়। "সাম্পান ঠেলিয়ে দিয়া পাটাতানের উপর বসিয়া পড়িল জহির মিয়া। মাথা ঘুরিতেছে তার। হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত সে বলিলঃ ও বা'ই। আঁঅর পুঁটলি, আঁঅর পুঁটলি। হাতড়াইতে লাগিল সে। উর ভেতর আঁঅর ফুয়ার কিতাব"।(পৃ.ঐ) দিক বিদিক শূন্য জহির মিয়ার আক্ষেপের সীমা নেই। হাতে রাখা পুঁটলির কথাও তার মনে নেই। "দুই জন কিছুক্ষণ স্তব্ধ বসিয়া রহিল। কি যেন ঘটিয়া গিয়াছে। এখনও স্পষ্ট উপলব্ধির বাহিরে। হঠাৎ ফুঁপাইয়া উঠিল জহির মিয়া ঃ ব্রিটিশ কুম্বানীর আমলে আঁরা আর কি খারাব ছিলাম"? (পৃ.ঐ) মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে শ্রেণীগত অবস্থান ও দ্বন্দ্ব জহির মিয়া না বুঝলেও শাসক শ্রেণীর জুলুম অত্যাচরের বিষয়টা ঠিকই বোঝে। ব্রিটিশ বেনিয়া আমলের শোষণের চেয়ে এখনকার শোষন কম নয়। ভুক্তভোগি মাত্রই সে সত্য উপলব্ধি করতে পারবে।

জহির মিয়া বাড়ি ফিরে দেখে ছেলে সমিরুদ্দিনের সম্মুখে কেতাবের দপ্তর খোলা। সমির আনন্দে চিৎকার করে। সে জানে বই পুস্তক ছেড়ে উঠলে বাবার বকুনি খেতে হয়। সমির-তার বইয়ের খবর জানতে চায়। যেটা তার জন্য আনার কথা ছিল। "আব্বা আঅর লাই কিতাব। হারামজাদা, কিতাব! উডন পারস না? আই পড়ি, আব্বা। পড়স! পইড়া হৈব কি? উড়

Dhaka University Institutional Repository

হারামজাদা। ডাক তোঁয়ার মারে। আঁই পড়ি। পইড়্যা হৈব কি"? (পৃ.৯৪)সমির স্তব্ধ। এমন কান্ড সে আগে দেখেনি। তার পিতা তো লেখাপড়া শেখাতে কত চেষ্টাই করতো, আজ এমন করছে কেন? জহির মিয়া বইয়ের পুঁটলি খুলে সব বই ফড় ফড় শব্দে ছিড়ে ফেলল। সমির যে বইগুলো খুলে পড়েছিল, সেগুলোও ছোঁ মেরে নিয়ে–"শকুন যেমন মৃত পশুর অন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে, বইয়ের পাতাগুলি তেমনই নির্দয়ভাবে ছিঁড়িতে লাগিল" ।(পৃ.ঐ) আক্ষেপ-বিক্ষোভে জহির মিয়ার মুখে সত্য বেরিয়ে পড়ে। ইলেম শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ উধাও হয়ে যায়। সুষ্ঠু প্রতিকার বা প্রতিবাদের পথ জানা না থকলেও বিক্ষিপ্তভাবে দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসাকেই ছুঁড়ে দিয়েছে উপরতলার দিকে। "হালার ইলেম।সুট বুট আর ও'স। আরে বুট-সুট মারানীর পুত। তার পর আরো একটি অকথ্য গালি দিয়া বলিলঃ সুট পাছাৎ, গুস মুখে, এই ইলেমে হৈব কী? বেজম্মার জাত। (সমিরের দিকে ফিরিয়া) তোয়ার মাকে ডাক। উড়্, হারামীর ছাউ-উড" । (পৃ.ঐ)

'পিঁজরোপোল' গল্পে পিঁজরোপোল অর্থাৎ বয়স্ক, অসুস্থ, অকর্মণ্য গবাদি পশুর আস্তানায় মারু মিয়া নামে এক বয়স্ক লোকের সাথে কাজ করে বাসেদ নামে বিশ বছর বয়সী যুবক। বাসেদ প্রতিবাদী। পিঁজরোপোলে অসুস্থ বয়স্ক পশুদের মশারীর ব্যবস্থা থাকলেও মানুষের জন্য নেই। এতে করে বাসেদ ক্ষুব্ধ। সে কৌশল করে রাতে মশারী খুলে নিয়ে রাত কাটিয়ে সকলের অগোচরে আবার রেখে আসে। 'পিঁজরোপোলের পরিবেশ বর্ণনায় গল্পকার ব্যঙ্গ বিদ্রুপের আশ্রয় নিয়েছেন। কটাক্ষ করেছেন এভাবে। "মারু মিয়ার কাছেই শোনা, গন্ডেরীরামের একটা সাদা গাই ছিল। হঠাৎ মারা যায়। তার পরই তিনি পশুদের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমে কয়েকটা বুড়ো মোষ আর গোরু নিয়ে পিঁজরাপোলের সূত্রপাত" ।(পৃ.৯৫)

পশুদের থাকা খাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলেও-পশুদের তদারককারী কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা নেই।- "চার পাঁচ জন মুসলমান চাকর আছে পিঁজরাপোলে। তারা এক জায়গায় রান্না করে, থাকে অবশ্য পাশাপাশি কুঠরিতে। স্যার মাহমুদ বলেছেন, চাকরদের আলাদা কোয়ার্টার শিগ্‌গীর তৈরি করা দরকার। এই সব কুঠরিতে পিঁজরাপোলের নতুন রোগী থাকবে, রোগী অর্থাৎ পশু রোগী। স্যার মাহমুদ অবশ্য ঠিকই বলেছেন। কারণ এই কুঠরি পশুদের জন্যই তৈরি হোয়েছিল। গন্ডেরীরামের আদেশে এখন চাকরেরা দখল করেছে"। (পৃ.ঐ) বাসেদের চরিত্রে গল্পকার সরাসরি প্রতিবাদের ভাষা এনেছেন। বাসেদ দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকলে মারু মিয়া বলে: "কাম না কারি হো? বাসেদ জবাব দেয়: কামকা এয়সী ত্যায়সী। দুপুরে ঘুমোবো, তা হবে না। ভারী কাজ, ভারী মাইনে। ঘুমানো বারণ"? বাসেদ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মারু মিয়া সরকারের দোহাই দিলে সে যুক্তি প্রদর্শন করে বলে। "বড়ো মিয়া সরকার কোন? ও শালা সরকার? খানে দেতা হ্যায়? বিশ রূপেয়া মে জরু-বাচ্চা খা সাকতা হ্যায়? জেইসা পয়সা ঐসা কাম"। (পৃ.৯৬) মারু মিয়া সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চায় না। সবার মধ্যে মারু মিয়া বয়সে বড়ো। ছোট হলেও 'বাসেদ বড় অপ্রিয় সত্যবাদী। (পৃ.ঐ) তাই পিঁজরাপোলের চাকররা অনেকে পছন্দ করে না'। গণ্ডেরীরাম পিঁজরাপোলের বাংলোয় কিছুদিন থাকবেন। ইতোপূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দু'দিনের বেশি থাকেননি। মনিবের সামনে কাজে ফাঁকি দেয়া চরবে না-এ জন্য কর্মচারীদের সকলে ত্রস্ত। বাসেদের কোন ভয় ডর নেই। দিব্যি বলছে-"উনি পিঁজরাপোলে থাকবেন। তেইশ নম্বরের বুঢ্ঢা ভঁয়েসটা মরেছে, সেখানে জায়গা করে দাও। আমি খড় খোল রোজ দিয়ে আসব"। (পৃ.৯৭) কি স্পর্ধা! গণ্ডেরীরামকে পশুর মতো মনে করছে বাসেদ। পশুর থাকার জায়গায় তাকে থাকার জন্য বলছে। সরকারের পাটকলে গুলি চলছে। মারু মিয়া ভয়ে সংযত হতে বলে। "কিয়া বক্‌তে হো। কোই শোন লেগা তব? বাসেদ বুড়ো আঙ্গুল উচিয়ে বলে ঃ শুনুক না"।(পৃ.৯৭) পাটকলে গুলি চলার খবরে মারু মিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাসেদকে গুলি চলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে-বাসেদ নির্ভয়ে বলে-"তুমি বুঝবে না বড়ো মিয়া কেন গুলি চলে। দুনিয়ায় মানুষ হোয়ে এসেছি। পেট আছে, চাল আছে, চুলো আছে, খেতে হবে না? কিন্তু তোমার মনিব খেতে দিচ্ছে কৈ? তারা দাবী জানাবে না? তাদের মাগ-ছেলে নেই? কিন্তু তাদের কথা শোনে কে? জোর যার মুল্লুক তার। গুলি তো গুলি, বোমা চালাবে কোনদিন"।(পৃ.ঐ)

বাসেদের কণ্ঠে শ্রেণীগত অবস্থান ও দ্বন্দ্বের অনুভব আরো তীব্র হয়ে বেরিয়ে পড়ে এ উক্তিতে- "চুপ করো, বড়ো মিয়া। মানুষের জন্য এত দরদ! তোমার মত আমার মত গরীবের জন্য কারও দয়া আছে? গরীবের কেউ নেই। কোয়ার্টারের ঐ আধ-গরীব বাবুরা পর্যন্ত নয়। .... দুধ বিক্রী করব। পয়সা আসবে, মজাসে দিন চলবে। তবে মনে রেখো, গরীবরা মরবে না। ক্ষেপে গেছ, বড়ো মিয়া! কিনবে ঐ কোয়ার্টারের বাবুরা, গণ্ডেরীরাম, আর শহরের মাঝামাঝি গেরস্থরা। মরুক ওরা। ওদের আমি সহ্য করতে পারি না। গরীবের ছেলেরা দুধ খেতে পায় না, মায়ের শুকনো মাই চোষে।"(পৃ.১০১)

'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' গল্পে ডেপুটি মুস্তাফিজের চরিত্র চিত্রিত করেছেন গল্পকার। "ছাত্রজীবনে জণগণের কল্যাণের স্বপ্নই রচনা করেছিল। শাসনযন্ত্রের সামান্য অংশ তার হাতে থাকলেই সে দেখিয়ে দেবে জগতে মানুষ কি করতে পারে। আজ সে ডেপুটি, একটা মহকুমার শাসনভার তার হাতে। ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য মুস্তাফিজের। নৈরাশ্যে তবু নূতন স্থিতি খোঁজে। পদে পদে দৃশ্য অদৃশ্য বাধার জনতা। মানুষের সংস্পর্শ মাঝে মাঝে তার কাছে তেতো হয়ে উঠে। বন্ধুদের পর্যন্ত হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। অথচ কি সর্বগ্রাসী না হৃদয় ছিল তার। ছাত্র-আন্দোলনে মুকুটহীন নৃপতিরূপে কত দম্ভ ছিল তার, কত স্বপ্ন ধরা দিয়েছিল চোখে।– All futile, সব বৃথা-সব বৃথা" ।(পৃ.১০৪) কেন এ হতাশা? 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সেরা ছাত্র মুস্তফিজের'? ডিমান্ড আর সাপ্লাই এর মাঝে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হলেও মানবতা তো আর শেষ হয়ে যায়নি। অসহায় মানুষের জন্য তো কিছু করা যায়। মুস্তাফিজ জানে চাহিদা আর যোগানের মূল সূত্র কোথায়। কোথা থেকে কলকাটি নড়ে-মানুষকে পর্ণসর্বস্ব করার। "অসহায় মানব জীবন। কোন উপায় নেই, কোন মুক্তি নেই। মানুষের মধ্যে দু-চারজন শয়তান থাকে। এই আযাজীলের বাচ্চারা না থাকলে কোন গোলমাল দেখা যেতো না দুনিয়ায়। সব চলত ঠিক ঠিক আল্লাহর পৃথিবীতে। ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের সূত্র যতই না অস্বাভাবিকতা

Dhaka University Institutional Repository

আনত. মানুষের মনুষ্যত্বের কাছে তার কোন পাত্তা থাকত না। কিন্তু মানুষ যে দেবতা নয়, ফেরেস্তা নয়। তাই এত নৈরাশ্য, এত জুলুম, এত পঙ্কিলতার বিভীষিকা" ।(পৃ.১০৩) মুস্ত াফিজ পরাজয় বরণ করেনি। সেকেন্ড অফিসার, সার্কেল অফিসারদের বউ নিয়ে আরাম আয়েশের বিপরীতে স্ত্রী জোহরাকে রেখে কোন আদর্শনামের মরীচিকার পিছে ছুটছে সে?

মুস্তাফিজের আৱগ্লানি ও শ্রেণীগত অবস্থান আরো স্পষ্ট হয়েছে গল্পের শেষে। দাতব্য 'চিকিৎসালয়' গল্পে প্রধান চরিত্র মুস্তাফিজ ছাত্র-জীবনে সংগ্রমী আন্দোলনে অংশ নিত। তার একটা স্বপ্ন ছিল দাতব্য চিকিৎসালয় করে মানুষের সেবা করা। মহকুমা কর্মকর্তা হিসেবে তার এলাকায় দাতব্য চিকিৎসালয় করতে গেলে স্থানীয় চোরাকারবারী জলিল তরফদারের সাথে তার দ্বন্দ্ব বাধে এবং শেষপর্যন্ত জলিলের চক্রান্তে মুস্তাফিজকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়। তার পর জলিল নিজেই একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুস্তাফিজকে দাওয়াত দেয়। মুস্তাফিজ দাওয়াতে এসেই বুঝতে পারে তার অপমান করার জন্য চোরাকারবারী জলিল এটা করেছে।

আদর্শের জয়, না হয় ক্ষয়। মুস্তাফিজের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কি? হয়তো হয়েছে-শ্রেণীদ্বান্দ্বিক ঘটনা পরম্পরায়। গল্পের শেষেও সেই শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। -গল্পের বর্ণনা- "মুস্তাফিজ অনুভব করে, তার চারিপাশে শুধু মানুষ। তাকে ঘিরে উল্লাস ধ্বনি করে- তাদের মুঠি অন্ন নেই মুখে, পরিচ্ছদ নেই রৌদ্রবৃষ্টিস্নাত দেহে; তবু তাদের পর্বতগ্রাসী প্রাণ বন্যার শক্তি অপরিসীম, যার ঢেউ পৃথিবীর গলিত কুষ্ঠরূপ নিশ্চিহ্নে মুছে দেবে একদিন। তাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাল মুস্তাফিজ বার বার। জীবনের প্রথম প্রণতি" ।(পৃ.১১৪) এই গল্পেও শ্রেণীদ্বন্দ্বটাও ভালভাবে ফুটে উঠেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পর চোরাকারবার, ঠিকাদারি, মজুতদারি, হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ইত্যাদি লুটপাটের মধ্য দিয়ে দ্রুত একটি বিত্তশালী শ্রেণী গড়ে ওঠে। তাদের সাথে বিবাদ শুরু হয়ে যায়- বিত্তহীন, সৎ, দেশপ্রেমিক অংশটির। মুস্তাফিজ তাদেরই প্রতিনিধি। কিন্তু তারা এ দ্বন্দ্বে টিকতে পারেনি। জলিলের কাছে হেরে গিয়ে বদলী হয়ে চলে যেতে হয় অন্যখানে মুস্তাফিজকে।

'নেত্রপথ' গ্রন্থের গল্পগুলো হল –'জনারণ্যে', হিংসাধার', 'বালকের মুখ', একটি বহস', নেত্রপথ', 'দেশ কালপাত্র', 'গিরগিট' প্রতিষেধ' আনারকলি', আপনি ও তুই', 'দ্রব্যগুণ', 'সাবালক', 'খেরীসন', 'একটি উপহার', রাস্তার হদিস', 'অকালপক্ক', 'ফলাফল', জন্তুগাথা', ব্ল্যাক আউট', গোরস্থানে', 'শরীকান', 'ব্লাক মার্কেট, 'পুরস্কার', 'তষ্কর সঙ্গীত', 'মন্ত্রগুণ', 'জিহবাহীন', 'চিড়িমার', 'চোর ও সাধু', 'কুকুরের ভাষা'।

গল্পগুলোর মধ্যে- 'বালকের মুখ' 'হিংসাধার', 'চিড়িমাড়',-গল্পগুলোত প্রতিনিধিস্থানীয়। এই গুলোতে প্রতিফলিত শ্রেণীদ্বন্দ্বের আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

'হিংসাধার' গল্পে একজন পালিশ মিস্ত্রীর ঠিকাধারী করার মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের আভাস আছে। ইচ্ছে করলেই পালিশ মিস্ত্রী ঠিকাধারী করে টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারে না। কারণ সে নিম্ন আয়ের মিস্ত্রী মাত্র। মহাজনতো আর আগাম টাকা দেবে না তাকে। তাছাড়া গল্পে উল্লেখিত কুকুরের থাকার জয়গাটা শুকনা চকচকে ও আরামদায়ক হওয়ার কারণে-মিস্ত্রীর মনে যে করুণ আক্ষেপ সৃষ্টি হযেছে; তাও শ্রেণীগত অবস্থানের নামান্তর।

গল্পের কাহিনী ছোট পরিসরে বর্ণিত হলেও জনৈক পালিস মিস্ত্রীর জবানীতে বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজের নানা শ্রেণীর কর্ম প্রবাহ চলছে। প্রতিযোগিতা চলছে নিজস্ব অবস্থা থেকে উপরে উঠার। যারা উপরে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে তারাও থেমে নেই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মূর্ত না হলেও অবচেতন মনে অনুক্ষণ তাগিদ দিয়ে যায় তাদের। এ গল্পের 'পালিশ মিস্ত্রী' একা একা কাজ করতে করতে ভাবল কাজের ঠিকাদারী করলে লাভ বেশী। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক'জন লোক যোগাড় করে কাজে খাটালো। 'বাড়ীর ফার্নিচার পালিশ, জানালা দরজার রঙ করার ঠিকাদারীতে। যেমন ধারণা করা যায় বাস্তবে অনেক সময় তার উল্টোটিও ঘটে। সমস্যা হলো যাদের নিয়ে কাজ করা হয়েছে তাদেরতো মজুরী শোধ করতে হবে পালিস মিস্ত্রীর। যৎসামান্য আগাম টাকায় আর কতদিন চালানো সম্ভব। টাকা চাইতে গেলে মনিব বার বার ফিরিয়ে দেয়। এদিকে সহকর্মী মজুরদের তাগাদা। উভয় সংকটে পড়েছে সে। সাহেব মানুষ; তাড়াহুড়ো করে বাড়ীতে গিয়েই আর টাকা পয়সা চাওয়া যায়না। বুঝে শুনে সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়। "হুজুর, বড় জরুরী দরকার. একজনের মার অসুখ কাল বাড়ী যাবে। টাকা, টাকা... এ সপ্তাহে তো হবে না। সামনে হপ্তায় একবার এসো। হুজুর, বহুত হপ্তা তো গেছে। কি করে যে এ কথা উচ্চারণ করেছিলাম সেদিন জানিনে। আমার বুকের পাটা দু'চার ইঞ্চির বেশি নয়"। (পৃ.৩০৫) টাকার প্রয়োজন পালিশ মিস্ত্রীর। অনুনয় বিনয়ের শেষ ধাপে পৌছেও ফল হলো না। "সাব হঠাৎ গোসা হোয়ে উঠলেন, মিস্ত্রী, তোমরা মানুষের মান মর্যাদা বোঝ না। ছোট লোক, কারো গায়ে লেখা থাকে না"।(পৃ.ঐ)

নিরাশ হয়ে ফিরছে পালিশ শ্রমিক। হঠাৎ বৃষ্টি, তীরের ফলার মতো গায়ে বিধছে তার। আশ্রয় নেয় দোতলা বাড়ীর কার্নিশে। "সেখানে বিজলি বাতি জ্বলছে। কাচের জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যায় সাজানো কামরা। লোকজন চলাফেরা করছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, চেয়ারের উপর একটা বড় বড় লোম কুকুর শুয়ে শুয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। দুই থাবার মধ্যে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে আছে প্রাণীটি। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম। এই ঠান্ডায় শুকনা জায়গার মূল্য কত আমি জানি। কুকুর বৃষ্টি দেখছে। আহ, কত আরামে, কত, কত নিশ্চিন্তে। তখন আমার (পালিশ মিস্ত্রী) মনে হোলো, ওইখানে পৌঁছতে পারতাম!"(পৃ.ঐ)

ওইখানে পৌছতে পারে না শ্রমিক-মজুর শ্রেণীর লোকেরা। তারা কুকুরের মতো দামী প্রাণী নয়। কুকুর তো শুকনা চকচকে জাগায় থাকবে। আরাম আয়েশ তো কুকুরের মানায়। আমাদের সমাজে কুকুরের আদর উচ্চবিত্ত শ্রেণীর একটা আভিজাত্যর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে মানুষের দুবেলা দু'মুঠো ভাত জোটেনা- সেখানে কুকুরের খাবারের অঢেল আয়োজন যেন মানুষকে নিয়ে নির্মম পরিহাসের শামিল। কবি 'আহসান হাবীব' 'ধন্যবাদ'-কবিতায় ব্যঙ্গের মাধ্যমে উচ্চবিত্তের এ করুণ তামাশার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন-কুকুর ছানার জন্মদিন পালনকে ঘিরে।

"সত্যি স্যার কুকুরের ছানা, তার জন্মদিন এত খরচের হাত
দু'হাজার? তা হবে না? ও ব্যাটার বাদশাহি বরাত!
হাসবো না? সে কি স্যার, এমন খুশির দিন আর
আমাদের এ জীবনে বলুন তো আসে কতবার"?

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপময় এ কবিতায়ও বৈষম্যের চিত্র বাঙ্গময় হয়ে উঠেছে।

'বালকের মুখ' গল্পে বালকের অন্তরে বৈষম্যের বোধ উপ্ত হয়েছে। করমালি নামের বালকটি আমন্ত্রিত হয়ে শুকনো রুটি চর্বি মিশ্রিত পানি ছাড়া মধ্যাহ্ন ভোজে আর কিছুই না পেয়ে মর্মাহত হয়েছে। করমালি প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ না করলেও পাড়া ছেড়ে চলে গিয়ে নিরব প্রতিবাদের সেল নিক্ষেপ করেছে তথাকথিত সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

'বালকের মুখ' গল্পে কিশোর মনের একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য উপস্থাপন করা হয়েছে। গোত্র পরিচয়হীন অখ্যাত এক ছেলে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নিজের কাছে সে নিজেই সম্রাট। ছেলেটার নাম করমালি। তার কোন অভিভাবক না থাকলেও কোনো ভাবনা নেই। সে সব সময় প্রাণোচ্ছল থাকে। মুখে হাসি গান সব সময় লেগে থাকে। বাস্তবে সে মোটর কারখানায় কাজ করে। দারিদ্র্য সেখানে নিত্য দিনের সঙ্গী। অভাব-থাকলেও করমালী কারো কাছে করুণা চায়নি। কোনদিন হাত পেতেছে বলেও শোনা যায়নি।

জীবন যাচ্ছিল একরকম। শত তুচ্ছতার মাঝেও একটা তৃপ্তির ছন্দ ছিলো হয়তো। ছন্দ পতন হলো সহসা একদিন। কথকের বাড়ীতে আমন্ত্রণের গানও ছন্দের সুরে বাধা জীবনে নিষ্ঠুর আঘাত এলো। আগে কখনও এমন আঘাতের সম্মুখীন হয়নি সে। করমালী এ ঘটনায় মর্মাহত ও চরম অপমানিত বোধ করলো। মধ্যাহ্ন ভোজের পর করমালীর জন্য শুকনো রুটি ছিলো বরাদ্দ। হাড়িতে গোশত ছিলনা, ছিলো চর্বিযুক্ত পানি। করমালি চর্বিযুক্ত পানিতে রুটি চুবিয়ে খাচ্ছিল। পাশে বাবুর্চি খান সামাদের বিদ্রুপাত্মক হাসি তামাশা গভীরভাবে অবলোকন করছিলো সে। করমালি কিছু না বলে থাকতে পারেনি। "বাবুর্চি সাব, খালি লবণ একটু কম"।(পৃ.২৯৮) এমন মন্তব্যে উপস্থিত কর্মচারী সহ কথকও না হেসে থাকতে পারেনি। "করমালি . তুমি রাত্রে খেয়ো, এর চেয়ে ভালো তরকারী রান্না হবে"।(পৃ.ঐ)

Dhaka University Institutional Repository

কথকের এ উক্তি, করমালি সহ্য করতে পারেনি। সহানুভূতি কোন কোন সময় চরম অশ্রদ্ধা-অবহেলার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শিশু মন বুঝতে পারে। প্রবল আত্মসম্মানে তা উপক্ষো করার শক্তি রাখে করমালীদের মতো-ছিন্নমুল দরিদ্র শিশু। "এ গল্পটিতে যুগপৎ শিশু মনস্তত্ব ও সামাজিক বৈষম্য ফুটে উঠেছে। এখানে বাৎসল্য রস সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু তীর্যক ব্যঙ্গরস সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে ভ্রুকুটি হেনেছে। লেখক আমাদের সমাজের বৈষম্যের প্রতি কশাঘাত হেনেছেন"। কোনো কোনো প্রতিবাদ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েও করা সম্ভব। করমালীর প্রতিবাদ সরাসরি না হয়ে ও নেপথ্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। "পাড়ায় এই কাহিনী চালু হোয়ে গেল সারা বিকেলের মধ্যে। তারপর সন্ধ্যা থেকে কেউ করমালিকে এই পাড়ায় আর কোনদিন দেখেনি"।(পৃ.ঐ)

খালেদা হানুমের বক্তব্য – "পাখীদের কেন্দ্র করে লেখক এখানে যে পটভূমি নির্মাণ করেছেন তা মূলত: চিরায়ত মানব গোষ্ঠীর। সাধারণ মানুষের কথার কলতান, গানের সুর, আনন্দ ধ্বনি তথা সমস্ত মানবাধিকার চিরকাল নিষ্পেষিত হয়েছে নির্মম শাসকের হাতে। মানুষের প্রতি নিপীড়ন চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। গল্পটির আবহ পাকিস্তানের শাসন আমলের কথা মনে করিয়ে দেয়। তখন জনজীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট চলছে। আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবই প্রবলভাবে লাঞ্চিত। যারা বিবেকবান, দেশের সর্বাত্মক কল্যাণকামী-মাতৃভাষার জন্য অপরিসীম মমতা তাঁদের বলিষ্ট কণ্ঠ তখন সোচ্চার এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে"[২]।

'চিড়িমার' অর্থাৎ পাখি শিকারীর আবরণে-পাকিস্তানী শাসনের কুৎসিত দিকের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পাখিরা যেমন শিকারীর খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকে- মানুষ ও তেমন বন্দী ছিল সে সময়।

গল্প কথক পাখিদের অসহায়তার প্রতি বেদনার্থ হয়ে, প্রকারান্তরে নিজের পরাধীনতাকেই মূর্ত করে তুলেছে এ গল্পে।

প্রতীক ধর্মী আবহের মধ্যে গড়ে উঠেছে 'চিড়িমার' গল্পের কাহিনী। চাটগাঁর বনাঞ্চলের এক গ্রামে অবসর মুহূর্তে ঘুরাফেরার সময় এক অভিজ্ঞতাকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পাকিস্তানী আমলের শাসন শোষণকে চিহ্নিত করেছেন। এ গল্পে চিড়িমারদের পাখি ধরে জীবিকা নির্বাহের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত আছে। "ওরা যেখানে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তার পরই রাস্তার বাঁক। এইখানে দেখলাম একটা ঝাঁকা। তার ভেতর কয়েক'শ পাখি কিলবিল করছে। আমাকে দেখে তারা জোরে আর্তনাদ তুললে"। (পৃ৩৭৪) কথকের প্রশ্নে তারা উত্তর দেয়। "আমরা চিড়িমার। ..... চিড়িয়া ধরে বাজারে বেচি"।

---

২. বাংলাদেশের ছোট গল্প, পৃষ্ঠা-৮৮, ২। পৃষ্ঠা ২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

কথক দেখে দোয়েল কোকিল গানের পাখি ধরা হয়েছে। মাংস খাবার জন্য গানের পাখি ধরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে- চিড়িমার জানায়। "তবু এদেরই আগে ধরা উচিত। ..... সাহেব, সেই জন্যেই তো এদের আগে ধরা উচিৎ। এরা গান গাইলে, গান শুনে শুনে জঙ্গলের সমস্ত পাখি নড়ে চড়ে, লাফালাফি করে। আমাদের তো ব্যবসা মাটি। তখন পাখি ধরব কি করে? তার আগে এগুলো ধরলাম"। (পৃ.ঐ)

যারা প্রতিবাদী, শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার-গল্পকার তাদেরকে গানের পাখি মনে করেন। তাঁরাইতো জাতির বিবেক জাগিয়ে তোলে। সংগ্রামের গান তাদের কণ্ঠে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা সর্বাগ্রে তাদের কণ্ঠরোধ করে। খাঁচার মধ্যে পাখিদের বন্দী করা ও বিক্রী করা প্রবলের দ্বারা দুর্বলের প্রতি অত্যাচারের বিষয়কে ইঙ্গিত দেয়। কথক পাখিদের আর্তনাদের সাথে নিজেকে নিবেদন করে। গানের পাখিদের মুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করে। "খাঁচার মধ্যে সম্মিলিত আর্তনাদ সমগ্র বনানীর পরিবেশ বিষন্ন করে তোলে। দূর বিলীন শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল। তার দাগ এখনও আমার বুকে আছে। আবার গানের পাখিরা কবে ফিরে আসবে?" (পৃ.ঐ)

উভশৃঙ্গ সংকলনের গল্পগুলো হলো-'মৎস্য', 'সৌদামিনী মালো', 'চিড়িয়া', 'সাহেব', 'জমা খরচ', 'নোট', 'কর্মব্যাধি', 'স্বগতোক্তি', 'লুভ', 'কিংবদন্তী', 'বন বিবির কেচ্ছা', 'ফ্লাশ', 'শকুনের চোখ', 'জাতক কাহিনী' 'শৃগালস্য', 'রাতা:, 'ষাঁড়', 'দান সত্র', 'আখেরি সংক্রান্ত', 'ফৌত', 'নেমকহালাল', 'গরুচোরের কাহিনী', 'উভশৃঙ্গ',। এর মধ্য থেকে-সৌদামিনীমালো ও নেমকহালাল গল্প আলোচনা করা হলো।

'সৌদামিনীমালো' গল্পের কাহিনী চট্টগ্রামের কোর্ট বিল্ডিংয়ে সৌদামিনী মালো নামের নিম্ন বর্ণের হিন্দু বিধবা মহিলার সম্পত্তি নিলামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো পেশায় আরদালি। সাহেবদের তোষামোদেও সে বেশ নাম কিনেছিল। বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক হয়েছিল জগদীশ। ধর্মযাজক ব্রাদার জনের ভাষায় সৌদামিনীর সম্পত্তির পরিচয় দেয়া যায়। -"পাদ্রী হাঁকতে লাগল,'দর্শক মন্ডলী"। এই সম্পত্তি, খুব ভালো সম্পত্তি আছে। এক প্লটে বারো কানী জমি পুকুর আর আছে তিন একর জমির উপর বসতবাড়ি, পুকুর গাছপালা. দশটা নারিকেল গাছ, লিচু গাছ পাঁচটা, আরো ফ্রুট ফলের গাছ আছে। এখন নীলাম ডাকা হবে"। (পৃ.৩৯৩)

সৌদামিনীর কোন সন্তান ছিলনা। সৌদামিনীর স্বামী জগদীশের পিতৃত্বের- আকাঙ্ক্ষা বুড়ো বয়সেও ছিলো। বিয়ের আয়োজন চলছিলো, কিন্তু জগদীশ হঠাৎ মারা গেল । জগদীশের মৃত্যুর পিছনে সৌদামিনীর হাত আছে বলে অনেকে মনে করে।

সৌদামিনী নিম্নবর্ণের হলে ও সাহসী ও পতিব্রতা ছিলো। ব্যক্তিত্ব ছিলো অনঢ় অবিচল। তাঁর সম্পর্কে কুৎসা রচনার সাহস যার তার ছিলো না। গল্পকারের ভাষায়। "সৌদামিনী তখন একা। কিন্তু সেও হুশিয়ার মেয়ে। আর রব দব ছিল জোর। গ্রামের দু'চারজন ছুচোর মত হয়ত ছো ছো শব্দে ঘুর ঘুর

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল। কিন্তু সৌদামিনী গোপনে ও জগদীশেরই বউ হয়ে থাকল। আপবাদ কেউ দিতে পারবে না"। (পৃ.৩৯৫) বাগান থেকে কলা মুলো চুরির কারণে মাঝে মাঝে রাতে বন্দুক ছুড়তো সৌদামনী। এতো সব চারিত্রিক বলিষ্ঠতার পরও সৌদামিনীর শেষরক্ষা হয়নি। জগদীশের দূর সম্পর্কের ভাই মনোরঞ্জণ মালো যে নাকি স্বদেশী আন্দোলন করত, সৌদামিনীর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল। সম্পত্তির লোভে সবকিছুই করতে লাগল মনোরঞ্জণ মালো। পাড়া পড়শীর কুৎসা রটনায় সৌদামিনি অটল। প্রতিপক্ষ মনোরঞ্জণকে অন্যপথ ধরতে হলো। মাতৃত্বের টানে সৌদামিনী কুড়িয়ে পাওয়া এক ছেলেকে লালন করছিলো। নাম দিয়েছিল 'হরিদাস'। চারদিকে রটিয়ে দেয়া হলো হরিদাস ব্রাহ্মণের সন্তান। সৌদামিনী শূদ্র অতএব ব্রাহ্মণের সন্তান লালন করা তার জন্য পাপ। সৌদামিনী যদিও বলেছিলো হরিদাস শূদ্রের সন্তান। সে তার আত্মীয়ের কাছ থেকে এনেছে হরিদাসকে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল তা সত্য নয়। তার আত্মীয়ের কোন ছেলে নেই। সৌদামিনীর কৌশল বা প্রতিবাদ এ যাত্রায় টিকলো না। বর্নবিভেদ ও সামাজিক বৈষম্য যে কত প্রকট ছিলো তা গল্পে দেখা যায়। "সে গ্রামময় প্রচার করে দিলে, সৌদামিনীর পৌষ্যপুত্র জাতে নমঃশূদ্র নয়: ব্রাহ্মণ। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ। কী ভয়ানক শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপকর্ম। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে এক শূদ্রাণী। রাম, রাম! মনোরঞ্জণ এই ঢিলে পাখীকে কাত করে ছাড়লে। আগে শত্রুতা ঈর্ষা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত। এবার তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল" ।(পৃ.৩৯৭) এ পর্যায়ে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। শুরু হলো সামাজিক ঝামেলা ও নিপীড়ন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সৌদামিনী বুঝল তার আর রক্ষা নেই। ধর্ম পুত্রেরা নাছোড় হয়ে লেগে গেল। অবশেষে সৌদামিনী প্রকৃত সত্য প্রকাশ করল। "ওর আসল বাবা লুঙ্গিপরা দাঁড়ি ওয়ালা সেই মুসলমান চাষী... আমার হরিদাস মুসলমান...। যেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার উপর"। (পৃ.৩৯৮) সেই রাতেই হরিদাস সৌদামিনীকে ছেড়ে চলে গেল। সৌদামিনী ব্রাদার জনকে ডেকে খ্রীষ্টান হয়ে গেল।"তিন চার দিনের মধ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখে পড়ে দিল পর্যন্ত" ।(পৃ.ঐ) শেষে সৌদামিনী পাগল হয়ে গেল। প্রায় সময় সৌদামিনী চিৎকার করে কাঁদত মাতৃত্বের দাবী নিয়ে। "আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল-। হে যীশু, ও হরি, হে আল্লাহ, আমার যবন হরিদাসকে ফিরিয়ে দে"। (পৃ.ঐ)

সৌদামিনী মালো নিম্নশ্রেণীর বলে ব্রাহ্মণের ছেলে লালন পালন করা তার জন্যে সমাজ স্বীকৃত ছিলো না। তাছাড়া ব্রাদার জন ও মনোরঞ্জণ সৌদামিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করতেও প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সৌদামিনী প্রতিবাদ সংগ্রাম করে সম্পত্তি রক্ষা করে কুড়িয়ে পাওয়া মুসলমানের ঘরের ছেলেকে নিজের ছেলের মর্যাদা দিয়েছে। শ্রেণীবৈষম্যকে উপেক্ষা করেও সৌদামিনীর শেষরক্ষা হয়নি-হরিদাসের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কারণে। গল্পের শেষে দেখা যায় সমস্ত সম্পত্তি খ্রীষ্টান মিশনের নামে লিখে দিয়ে সৌদামিনী খ্রিষ্টান হয়ে গেল। শোষণ শাসনের চক্রে সৌদামিনী পাগল হয়ে গেল।

আপাততভাবে মনে হয় গল্পের দ্বন্দ্বটি একই শ্রেণীর দুই জনের লড়াই। তবে মনোরঞ্জণের পক্ষে আছে হিন্দু স্থান, সৌদামিনীর পক্ষে কেউ নেই। শেষ দিকে সোদামিনী ধর্ম ত্যাগ করেও সম্পত্তি বিলিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। এভাবে সে একেবারে নিঃস্ব ব্যক্তিতে পরিণত হয়, এবং নির্যাতনের কারণে উন্মাদ হয়ে যায়। পারিবারিক কোন্দল শেষ পর্যন্ত শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ নিয়েছিল।

'নেমক হালাল' গল্পের কাহিনী হচ্ছে নিম্নরূপ: ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে সলিম, রহিম ও ফতু নামের ভিখারী ছেলেরা উচ্ছিষ্টের লোভে অপেক্ষা করছে। "এই বগীর আরোহীকে দেখা যায় এক ভদ্রলোক, বলাবাহুল্য। মোটা, আবলুস কালো। গায়ে ফুল শার্ট, গলায় চকচকে টাই। হাতে শাল পাতার ঠোঙা। তিনি মিষ্টি খাচ্ছিলেন। কেঁদো কেঁদো রসগোল্লা টপটপ তুলছেন আর মুখে ঢোকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে অন্য একজনকে দিচ্ছেন। অবিশ্যি ভিখারীদের কাউকে নয়"। (পৃ.৪৬৬) জীর্ণ শীর্ণ ভিখেরী ছেলেদের দেখে সাহেবের কণ্ঠে ঘৃণার প্রকাশ। -"যত সব নুইসেন্স, আবর্জনা- জঞ্জাল। স্ত্রীর অনুরোধেও দু'পয়সা দিল না। উপরন্তু দর্শন তত্ত্ব খাড়া করল। এই যতসব ভিখিরী ছেলে। এত গরমে একটু রেহাই দেবে না।.... না, না। সব কুড়ে হোয়ে যাবে। এরা আর কাজ করে খাবে? তাছাড়া সব বদমাস্ ছেলে লেখা পড়া করেনা, ঘুরে বেড়ায়" ।(পৃ.৪৬৮) সাহেবের প্রশ্ন: "এ-ই তোরা স্কুলে যাস না কেন? স্কুল?!!?"। ইতোমধ্যে সাহেবের পিপাসা পেয়েছে। ফেরী করে বিক্রি করা ডাব কিনে খেতে লাগল। স্ত্রীকেও একটা খেতে দিল। কামরার পাশে কাতর আর্তনাদ। -"হুজুর সব খান না। পিয়াসে বুকে ছাতি ফাডছে। আল্লার কিরা একটু পানি দ্যান। ফুইসা- চাইনা- একটু পানি.."। (পৃ.ঐ) ভদ্র লোক মুখ ভেংচিয়ে বলে। "ব্যাটারা একটু মুখে খেতেও দেবেনা। নীচে এই যুগের তিনজন হোসেন যেন কারবালার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পানি চায় শুধু" ।(পৃ.ঐ) ভদ্রলোকের হৃদয় গলল না। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল। "হারামজাদারা খেতে দিলে না। যা ... দ্যাখ, পানি আছে"। ভদ্রলোক পাখার তলায় আরামে গা এলিয়ে দিয়ে আল-হামদোলিল্লাহ পড়ল। ট্রেন ছাড়ার শেষ ওয়ার্নিং বেলের শব্দ শোনা গেল। গলার টাই ঈষৎ আলগা করে সাহেব খবরের কাগজে মগ্ন। হঠাৎ কামরার ভিতর ঢিব্‌ঢিব্ শব্দে ভদ্রলোক চমকে যান। ছিন্নমূল, চেয়ে চিনতে খাওয়া শিশুদের প্রতিবাদ এখানে প্রকটভাবে মূর্ত হয়ে ওঠেছে। -"তারই খাওয়া গলা কাটা ডাব দুটো যেন তেড়ে আসছে। হক্ চকিয়ে কাগজ ফেলে উঠে দাঁড়ান তিনি"। রহিম-সলিম গলা বাড়িয়ে ট্রেন চলার গতির সাথে পাল্লা দিয়ে অতি দ্রুত দৌড়াতে দৌড়াতে ব্যঙ্গভরে সাহেবকে বলছে ঃ "সালাম সাব! নোয়াহালি ডাব-নাইরকেলের দ্যাশ। আপনের ডাব আপনে লয়াযান। সফরের কামে লাইগব..... আলহামদোলিল্লাহ"। (পৃ.৪৬৯)

গল্পটি জীবন সংগ্রামকে নিয়ে রচিত হয়েছে। এখানে দুই পক্ষ ঃ বিত্তশালী ট্রেন যাত্রী ও ট্রেনের বাইরে বিত্তহীন শিশু। গল্পকার রেলওয়ে ষ্টেশনের যাত্রীদের উচ্ছিষ্টাভোগী জীর্ণ বস্ত্রাবৃত শীর্ণ শিশু-কিশোরদের জীবনযাপনের অংশ বিশেষের আলেখ্য রচনা করেছে। এখানে শ্রেণীদ্বন্দ্ব রূপ পেয়েছে ট্রেন যাত্রীর প্রতি তীর্যক ব্যঙ্গ ও হাসি তামাশার শেল নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে।

সহায়সম্বলহীন শিশুরাও যে শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে- সাহেবের ফেলে দেয়া ডাব ছুঁড়ে দেয়ার মধ্যে তার উদাহরণ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পটি আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কয়লা কুড়ানো দল' গল্পের শ্রেণীঅবস্থানকে স্মরণ করে দেয়। প্রাইজ গল্পে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা একত্রে মিলিত হয়েছে যেমন খুশী তেমন সাজার প্রতিযোগিতার জন্য। সেখানে অল্পবয়স্ক বিত্তহীন এক ছেলে না বুঝে ওই ছেলেমেয়েদের সাথে মিশে যায়। ভিখিরি ছেলেটার নাম 'ইজাদ'। অন্যান্য ছেলে মেয়েরা ভাবছে-সেই ফাস্ট হবে। খুব সুন্দর হয়েছে ভিখিরি সাজা। একেবারে বাস্তব হয়েছে। প্রকৃত ভিখিরির মতো দেখাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে সকলে ছেলেটার পরিচয় জানতে চায়। ছেলেটার কাছ থেকে জানতে পারে সে ভিখিরি সেজে আসেনি, প্রকৃত ভিখিরি। সবাই রেগে গেল। রক্ষে নেই 'ইজাদ' নামের ভিখিরি ছেলেটার। "রেবা সরকার ওদিকে দেদার চড় চালাচ্ছেন। মিসেস খন্দকার হাই হীল জুতো দিয়ে ইজাদের পিঠে মারলেন এক লাথি। মাগো শব্দে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল 'ইজাদ'। ..... ঊর্ধ্বশ্বাসে ইজাদ দৌড়োতে লাগল .... তার মনে হয় শত শত রাক্ষসী যেন হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে"।.....

মানুষ যে রাক্ষসী হতে পারে তারা তার প্রমাণ দিল ইজাদের উপর হিংস্রভাবে আক্রমণ করে। কি এমন ক্ষতি হয়েছে তাদের অনুষ্ঠানের। ভুলক্রমে একটা অনাথ শিশুর আগমন তো কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। হাজারো ভিখিরি, বাস্তুহারা ছেলে মেয়েদের আনা গোনা চারিদিকে। তারাও বাঁচতে চায়। ধনীদের জৌলুস দেখে মনে মনে তৃষিত হয়, ওই অবহেলিত শিশুরা ইচ্ছে করে ধনীদের কাতারে দাঁড়াতে। বিত্তবানরা কি সেটা অনুভব করে? বরং রাক্ষসের মতো আচরণ করে তাদের সাথে। ভিখিরিদের অন্ন কেড়ে নিয়েও তারা ক্ষান্ত নয়, মুন্ড চিবিয়ে খেতে চায়। ধনী-গরীবের মধ্যে এ এক বিশাল ব্যবধান! শওকত ওসমান এ ব্যবধানকেই গল্পাকারে তুলে ধরেছেন। প্রাইজ গল্পটি শিশু কিশোর সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও শোষণ বৈষম্যের প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যান্য গল্প উপন্যাসের মতো এ গল্পেও মানবতার পরাজয় ঘোষিত হয়েছে। মানুষের গড়া সভ্যতার মাঝে অসভ্যতার অসম প্রতিযোগিতা মানুষ নামের শ্রেষ্ঠ জীবকে যে কত নিচে নামিয়েছে তার উদাহরণ 'প্রাইজ' গল্পটি।

'প্রাইজ' গল্পে উচ্চবিত্তের ছেলেমেয়েদের ভিখারী সাজার প্রতিযোগিতায় প্রকৃত ভিখারী ছেলের আগমনকে কেন্দ্র করে উচ্চবিত্তের পিতা মাতাদের মধ্যে যে আক্রোশের প্রকাশ ঘটেছে-তা শ্রেণীগত বৈষম্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। একদিকে ভিখারী সাজার নৈপুন্য দেখিয়ে প্রাইজ পাওয়া-অন্যদিকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ভিখারী শিশুদের জীবন ধারণ করা। এ গল্পে ভিখারী আর ভিখারী সাজার প্রতিযোগিতা সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতিকে নির্দেশ করে।

কাবুলীওয়ালাদের অত্যাচারের কাহিনী আমাদের গ্রাম বাংলায় অনেকেই জানে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পটি সন্তানবাৎসল্য রসের আঙ্গিকে রচিত হলেও শওকত ওসমানের 'ইতা' গল্পটি সুদখোর, কাবুলীওয়ালাদের শোষণ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। 'জহিরআগা' নামের এক সুদখোর কাবুলীওয়ালার অত্যাচারে গ্রামবাসী

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুব্ধ ছিল। এক পর্যায়ে গ্রামবাসীরা একত্রে হয়ে লাঠি সোঠা নিয়ে কাবুলীওয়ালাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কাবুলীওয়ালা প্রাণের ভয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যায়। 'ইতা' শব্দের অর্থ : জুতা গল্পের নামকরণে ও সেটা যথার্থ। ঋণের টাকা শোধ না করতে পারলে কাবুলীরা বলত: 'ইতা সে কাম লেগা' এর অর্থ জুতা মেরে আদায় করব। গল্পের বর্ণনায় সুদখোর কাবুলিওয়ালা 'জহির আগার' পালানোর ঘটনা- শোষণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জনগণের বিজয়ের ইঙ্গিত দেয়। গল্পের ভাষায়- "জহির আগার দৌড়ানোর দৃশ্য দেখার মতো। এক সময় জহির গ্রামের বাইরে চলে গেল, তখন জনতার মধ্য থেকে একজন রক্তচক্ষু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, শালার কারবার দেখেন। বিশ টাকা ধার নিয়েছিলাম, পঞ্চাশ টাকা সুদ দিয়েছি, তবুও শালা গাল দেবে.... একজন লাঠির ডগায় একটা নাগরা জুতা তুলে বললে, হারামজাদা 'ইতা' ফেলে গেছে। আরো গা কয়েক দেয়া উচিত ছিল। কী জুলুম, এক টাকায় দেড় টাকা সুদ।

কথা নয়, শুধু নিরেট গোস্বায় জায়গাটা তেতে উঠল। সূর্যের মুখের দিকে উঁচানো ঝক ঝকে লাঠির রেখাগুলো শুধু শান্ত। তারপর আর গ্রামে কাবুলিওয়ালা দেখিনি"।

'প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প'-গ্রন্থের গল্পগুলোতে শোষণ শাসনের শিকল থেকে মুক্ত হবার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। এদেশের লক্ষ কোটি মানুষ লড়াই করে প্রমাণ করেছে বাঙালী অধিকার আদায় করতে পারে। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত। পাকিস্তানী বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে এদেশেরই অকুতোভয় কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, মজুর। 'টিফিন' গল্পটি গড়ে উঠেছে দশ বার বছরের কতিপয় বালক নিয়ে। তারা দেশলাই কারখানায়, বাক্সে কাঠি ভরার কাজ করে। খুব সকালেই তাদের কারখানায় যেতে হয়। এদের মধ্যে 'সফি' নামের ছেলেটি সবচেয়ে ছোট হলেও কাঠি ভরায় সবচেয়ে এগিয়ে। 'সফি' টিফিন বক্স নিয়ে আসে প্রতিদিন। অন্যান্যরা জানেনা টিফিন বক্সে কি আছে। সফি এভাবে একমাস চালিয়ে আসছে। সঙ্গীরা ভাবছে বক্সের ভিতর পরোটা আছে। তারা ধস্তাধস্তি করলে টিফিন বক্সটি পড়ে যায়। সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। টিফিন বক্সের ভিতর কিছুই নেই। সকলে লজ্জা পায়। তারা সফিকে বলে, "আমাদের তুই বলিস নি কেন! আমরা কি তোকে কিছু না দিয়ে খেতাম"! প্রকৃত ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। সফির মা অসুস্থ তাই সফি টিফিন আনতে পারেনি। শিশু শ্রমের ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে আমাদের দেশে। অধিকার বঞ্চিত এ গল্পের শিশু শ্রমিকরা হাল ছাড়েনি। তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় কেউ এ কারখানার কাজে যাবে না। গ্রামের মাঝে ফাঁকা জাগায় বটগাছের নিচে সমবেত হয়ে টিফিন বাক্স খুলে মুড়ি ছড়ায়। মুড়ির লোভে জুটে যায় এক পাল কাক। কাকের কাকা রবে আরো অনেক কাক জড়ো হয় সেখানে। ওদের মধ্য থেকে কাজেম নামের ছেলেটি আক্ষেপ করে বলে।-"যখন মক্তবে পড়তাম তখন রোজ পাখিদের খাওয়াতাম। আজ কতদিন পরে এক সঙ্গে এত পাখি দেখলাম। পাখি যে দুনিয়ায় আছে তা তো ভুলেই গিয়েছি".....। তারা আনন্দে

Dhaka University Institutional Repository

আৰহারা হয়ে টিফিন বাক্সের সব মুড়ি পাখিদের খেতে দেয়। এমন স্বাধীনভাবে আনন্দ উপভোগ করা তাদের বন্দী জীবনে সম্ভব হয়নি। আজ তারা মুক্ত। উদার প্রকৃতির সাথে একাৰতা ঘোষণা করেছে। কারখানার ছঁকেবাধাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করেছে। বালকদের নিয়ে গল্প রচিত হলেও কারখানায় না যাবার সিদ্ধান্ত–প্রতিবাদ সংগ্রামকে ইঙ্গিত দেয়। শিশুরা তাদের সামাজিক বা শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়।

'সাদা ইমারত' গল্পে দেখা যায় হাসিনা, মাজু ও শাহাজাদকে নিয়ে কালুর পরিবার অভাব অনটনে কোনো রকম চলছে। জমি জমা অনেক আগে দু'এক বিঘা ছিল। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে কালু মিয়া প্রায় সর্বশান্ত। কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করেনা। 'শ্রম ক্লান্ত অবেলায় সে গালিগালাজ করে কেবল হাসিনাকে'। মা-হারা তিন ভাইবোনের মধ্যে শাহাজাদা সবার ছোট। হাসিনার বিয়ে হবার পর কয়েকদিন মাত্র শাহাদ কোল ছাড়া হয়েছিল। 'শাহাজাদা আবার হাসিনার কোলে হারানো মাকে খুঁজিয়া পায়'। কালু মিয়া জীবন ধারণের জন্য চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। হাসিনা বুঝতে পারে। "প্রথমে সে ডাকে, হাসি জেগে আছিস? হাসিনা জাগিয়া থাকিলেও জবাব দেয়না। আগে সে উত্তর দিত তখনই। কিন্তু বাবা চট ঝাঁঝালো স্বরে খেঁকাইতঃ হারামজাদী, ঘুমোনা। সকালে কত কাজ মনে আছে"?(পৃ.১৪৪)হাসিনার মনে দৈনন্দিনতার প্রবাহে অনেক ঘটনার ভীড়। মনে তেমন আঁচড় লাগেনা। এতটুকু মেয়ের বোধে কুলায় না কিভাবে জীবন চক্র অর্থহীন আবর্তনে ঘোরে। মাঝ রাতে হাসিনাকে ফেলে কালু মিয়া চুরি করতে গেলে হাসিনার মনেও দুঃসাহস উকিঁ দেয়। বাড়ী ঘর ফেলে চলে গেলে কেমন হয়? হাসিনা পারেনা, ছোট ভাই বোনরা পিছু টানে।

কতদিন আর লুকোচুরি করে থাকা যায়। কালুমিয়া হাসিনাকে একদিন নিয়ে যায় চৌর্যকর্মে। "চারিদিকে রোয়া ধান। বৃষ্টির পানি জমিয়া রহিয়াছে। পা দেওয়ামাত্র চবাং শব্দ হইল? কালু ফিস ফিস করিয়া বলে, হাসিনা মা, আস্তে পা ফেলো, কেউ না শোনে। হাসিনা আরো ত্রস্ত। সে কী বাবার চৌর্য সহকারিণী আজ! এমন চুন্নির কাজ শেষ পর্যন্ত সে গ্রহণ করিল"। (পৃ.ঐ) বাবা হয়ে মেয়ের কাছে স্বীকার করে। জীবিকার তাগিদ বড়ই নির্মম। অসহায় অপরাধীর মতো কালুর কণ্ঠ। "মা আমাকে তোদের ভারী ভয় আর ঘেন্না, না'? আব্বা। বুঝেছি। আমি চুরি করি। আব্বা বলতে লজ্জা হয়"। (পৃ.ঐ)

কালুমিয়া ব্যক্ত করতে চায় জীবন সংগ্রামের কথা। এতকাল সে কেবল নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করে চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে আর কোন অবলম্বন না পেয়ে। কালু আজ বলে জীবনযুদ্ধের কথা। "অনেক খেটেছি। সারা জীবনে দুনিয়ার কোন বদকাজে ছিলাম না। কিন্তু খেতে পরতে পেলাম কই? তোদের নিয়ে সারা জীবন-ই এই টানাটানি। তার চেয়ে"- ।(পৃ.ঐ) সারাজীবন পরিশ্রম করে, সাধু থেকে কি লাভ? জীবিকার অনিশ্চয়তা তো থেকে যায়। ভালভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে তো ছিল। শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয়নি নৈতিকতার। শোষণের গ্রাস থেকে কালু

Dhaka University Institutional Repository

মিয়ারা বেরিয়ে আসতে পারে না। তবুও আশা রাখে মানুষের মতো বেঁচে থাকার।"মা আর বেশী দিন নয়"। (পৃ.ঐ)

চুরি করার কাজে সহায়তা করতে গিয়ে হাসিনার পায়ে খেজুরের কাটা ফোটে। পা ফুলে যায়। অবস্থা খারাপের দিকে যায়। হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। এতদিন কেবল কল্পনা করেছে হাসিনা বাড়ী থেকে দেখা এই 'সাদা ইমারত'কে। পা অপারেশনের পর হাসিনার চেতনা ফিরে এলে পাশের খাটে শোয়া একটা মেয়েকে সে জিজ্ঞাসা করে কোথায় এসেছে সে। মেয়েটি হাসিনাকে জানায়। "তাদেরই গ্রাম। তবে সে সাদা বাড়ীতে আসিয়াছে। তার আরাধ্য আবাসে। কিন্তু এটা হাসপাতালে। চারিদিকে সাদা চুন-কাম করা দেওয়াল আনন্দের আভাস বহিয়া আনে"।(পৃ.১৫০) হাসিনার ব্যথা কমে যায় সাদা ইমারতের ঝকঝকে পরিবেশে থেকে। প্রফুল্ল চিত্তে মনে হয়। "সাদা বাড়ীর অধিবাসিনী সে। মানুষ এই রাজ্যে বাস করে! তার মত রক্ত মাংসের মানুষ"।(পৃ.ঐ) এক পর্যায়ে হাসিনাকে সাদা ইমারত ছাড়তে হয়। হাসিনার গায়ে গুটি বসন্ত দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে গুটি বসন্তের রুগিকে রাখা হয় না। হাসপাতাল থেকে বাড়ী আনার পথে হাসিনা মারা যায়। জীবন সংগ্রামের আরেকটা নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয় কালু মিয়া।

'দুই চোখ কানা' গল্পের নামেই যেন একটা বিষয়কে ইঙ্গিত দেয়। 'সর্ববনেতা বেকারীর' মালিক চৌধুরী সাহেব। 'মুন্সি নামধারী মহাপুরুষটি' এ বেকারীর ম্যানেজার। "এই কারবারে আছেন একদম সূত্রপাত থেকে। মালিক নন, মালিকের গোমস্তা। খাতা-পত্র লেখেন, মালগ্রস্ত করেন, বাজার হাট যান। কিন্তু মালিকের চেয়ে তাঁর প্রতিপত্তি বেশী"।(পৃ.১৬৬) মুন্শী সাহেবের বয়স পঞ্চান্নর বেশী মনে হয় যদিও প্রকৃত বয়স চল্লিশ। মালিক চৌধুরী সাহেব-সব দায়-দায়িত্ব মুন্শীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। মুন্শীর নামে টুঁ শব্দটা করার সাহস পায় না বেকারীর অন্যান্য কর্মচারীরা। চৌধুরী সাহেবের কাছে মুন্শীর সুনাম আছে। 'বড় কাজের লোক তুমি, মুন্শীজি'। মুন্শীকে এ জন্য কারখানার সকলে আজরাইল মনে করে। ফায় ফরমাস খাটা ছোট ছেলেরা ভয়ে কথাটি পর্যন্ত বলে না। অনেকের পিলে কাঁপে মুন্শী সাহেবের কথায়। মুন্শীর মুখে সব সময় গালাগাল লেগে থাকে। খইয়ের মতো ফোটা গালাগাল হজম করতে না পারলে চাকরী করতে পারে না কেউ এখানে। আলিম নামের পনের বছরের ছেলেটা একবার প্রতিবাদ করেছিল মুন্শীর গালাগালের। তার চেহারাটা ছিলো অসুরের মতো। একদিন মুন্শীর সাথে তার হাতাহাতির উপক্রম হয়েছিল। মুন্শীর চক্রান্তে পাড়ার গোন্ডাদের হাতে মার খেয়ে আলিমের চাকুরী গেল। মুন্শী সাহেকে খুশী রাখতে হয় ঘুষ দিয়ে। তাকে খুশী না রাখলে বেতন বাড়ে না। পা-হাত টিপে দেয়া, চুল টেনে দেয়া সহ অনেক হুকুম তামিল করতে হয় ছোকরা কর্মচারীদের। মুন্শীর উপরি আয়ের উৎস হিসেবে বাজার থেকে পঁচা মাছ ও শাকের ব্যবস্থা সকলের জানা থাকলেও কোনো প্রতিকার হতো না।

Dhaka University Institutional Repository

কারখানার কর্মচারী রহিম। পশ্চিমা আজম গড় জেলার লোক। স্বাস্থ্য মজবুত। কাজে খুব ভালো। সেও গালাগাল হজম করে। তাছাড়া এ কারখানার সকলে গালাগালকে কথার মাত্রা মনে করে। "এই হারামীর পুত, ওকে কাজ বলে? কিয়া মুন্‌শী সাব? .... আরে শালা, দেখছ না ময়দার বস্তার মুখ খোলা। ধুলো পড়বে"। (পৃ.ঐ) মালিকের ইচ্ছা ছিল কারখানার স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশটা উন্নতি করবে। কয়েকটা ঘর তৈরি করে কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থাও করা যেতো। কিন্তু মুন্‌শী সাহেবের অতিভক্তি সুলভ ভূমিকায় তা সম্ভব হলো না। অবশ্য মুন্‌শীর জন্য ছোট্ট একটা কামরা বরাদ্দ ছিল। মুন্‌শী হয়তো কর্মচারীদের প্রশস্ত ঘর মেনে নিতে পারে নি। "হুজুর, আরো কিছু জমিয়ে নিন, তারপর কাজে হাত দেবেন"।(পৃ.১৬৭) জমির কিছুদিন আগে স্বয়ং চৌধুরী সাহেবের কাছে গিয়েছিল দু'টাকা মাইনে বাড়ানোর তাগিদে'। মুনসী সেখানে উপস্থিত ছিলো, জমিরকে লক্ষ্য করে এমন মুখ ভ্যাংচালো যে জমির তা ভুলতে পারেনি। মুনসী এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিল। "দেখুন ত, হুজুর, এই ছোট লোকের ছেলেরা বলে মাইনে বাড়াও। দু'পয়সার ডাল ভাত ওদের পেট ভরে, ওরা বলে মাইনে বাড়াও। পোলাও কোর্ম্মা খেতে চায়। শালা ছোটলোকদের হোলো কী? বলুন ত চৌধুরী সাহেব, মান ইজ্জত রাখা দায়"! (পৃ.ঐ) মায়ের চেয়ে মাসির দরদ। মুন্‌শীর ভাবখানা এমন। জমির, রহিম সহ কারখানার সবাই মুনসীর প্রতি চাপাক্ষোভ পুষে রাখে। ব্যক্তও করে। রহিম প্রতিবাদ জানায়। "নেহি, শালেকা নউকরী নেহি করেঙ্গে"। জমিরও সাথে সাথে মুখ খোলে। "খোদ কর্তা আমার মাইনে বাড়াতে রাজী ছিল . ওই মুন্‌শিই যত খারাপ করে দিল"।(পৃ.ঐ)

অবশেষে মুন্‌শীর রক্ষা হলো না। চৌধুরীর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত। "দেখুন, মুন্‌শী সাহেব, এ কারবার কি আপনি আর দেখতে পারেন? লাখ লাখ টাকার হিসেব। ও জাব্‌দা খাতায় কুলোয় না। আমি মাদ্রাজী এ্যাকাউন্ট্যান্ট ঠিক করেছি। আজ রাত্রের ট্রেনে আসবে। ওই তার কোয়ার্টার"। (পৃ.ঐ) মুন্‌শী অবাক হয়ে চেয়ে র'লো। ওইকোয়ার্টারে নতুন ম্যানেজার থাকবে। তার কোন দরকার নেই। মুন্‌শীর অব্যাহতি দেয়ার রহস্য উম্মোচিত হয়নি গল্পে। গল্পকার এখানে অসঙ্গতির ছাপ রাখলেও শ্রেণীচেতনাকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কি নিদারুণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি মুন্‌শী!!চৌধুরীর কাছে শত অনুরোধেও কাজ হলো না। যাদেরকে মুন্‌শী ছোটলোক বলে গাল দিয়েছে। নোংরা স্যাত স্যাতে পরিবেশে থেকে ভূতের মতো কাজ করতে বাধ্য করেছে। সামান্য কারণে মেরেছে। চৌধুরী শ্রমিকদের জন্য থাকার ঘর তৈরির করতে গেলে বাধা দিয়েছে। যে মুন্‌শী শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর দাবীকে অগ্রাহ্য করেছে-তারাই আজ মুন্‌শীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার! সবাই ছুটোছুটি করছে।

রহিম চীৎকার করে বলছে, "ভাইয়ো উধার চলো।..... আউ, জলদি আউ, আউ খুশী মানাও ..... সব চলা জায়েগা। সব জায়েগা"। জমির বলে। - "মুন্‌শী? খুশী মানাও সব

Dhaka University Institutional Repository

জায়েগা। সব জায়েগা। সব জায়েগা। সব জায়েগা ..... সাব সাব মুন্‌শী.... উন্‌শী সাব" ।(পৃ.১৭০) করিম সতর্ক হতে বলে রহিমকে। রহিম সবচেয়ে বেশী ক্ষেপেছে। "আরে ও ভি জায়েগা। চৌধুরী ফৌধুরী। সাব সাব জায়েগা। এক ভি নেহি রহেগা। হাতের পেশী ফুলিয়ে সদম্ভে সে চীৎকার করে, দেখো, হামলোগ হ্যায় আওর রহেঙ্গে, আলবৎ আলবৎ .....হামলোগ যো আপনা মেহনত সে খাতে পিতে .... আওর কুই নেহি রহেগা"। (পৃ.ঐ)

বুর্জোয়া বিকাশের মার্কসীয় ব্যাখ্যার আলোকে 'দুই চোখ কানা' গল্পটির ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যবসার প্রথম পর্যায়ে মুন্‌শী মালিকের পক্ষভুক্ত হয়ে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন ও অত্যাচার চালাত। মালিক পক্ষও শ্রমিক পক্ষ একে অপরের মুখোমুখি, মুন্‌শী সাহেব শ্রমিকশ্রেণীর হয়েও মালিক পক্ষে জুটে যায়। কিন্তু ব্যবসা আরো বড় হয়ে বৃহৎ পুজিতে পরিণত হলে মুন্‌শী সাহেব সেখানে অপাংক্তেয় হয়ে যায়। কল্পনার যে স্বর্গে সে এতদিন বাস করত পুজির বিকাশের প্রক্রিয়ায় সে স্বর্গ ধ্বংস হয়। নি:স্ব অবস্থায় তাকে নেমে আসতে হয় শ্রমিকদের কাতারে-যে শ্রমিকদের সে এতদিন নির্যাতন করেছে। অবশ্য শ্রমিকরা সেটা মনে পুষে রাখেনি। তারা উপলব্ধি করেছে আজকে মুন্‌শী গেছে, আগামীতে চৌধুরীও যাবে. থাকবে শুধু যারা শ্রম দিতে পারে, তারাই। দেখো হামলোগ হ্যায় আওর রহেঙ্গে। আলবৎ-আলবৎ .....। (পৃ.ঐ)

'বকেয়া' নামক গল্পে সমাজের উচুতলার মানুষের শোষণ নিপীড়নের শিকার দরিদ্র মানুষের হাহাকার ও ধর্মীয় সংস্কারের মোহ প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র পাঁচু। সংসারের দারিদ্র যে কত কষ্টের, তার বর্ণনা। "তার স্ত্রী গত বৎসর এই বর্ষার দিনেই ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়েছে। প্রৌঢ় বয়সে স্ত্রী বিয়োগ মাথায় বজ্রপাতেরই সমান। সংসারে শ্রী লুপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু তার মৃত্যুতে পাঁচুর একটা সুখ ছিল, সংসারের একজন লোক কমিয়াছে। আর যে অবস্থায় সে বাঁচায়ছিল, তার চেয়ে মৃত্যু ঢের বেশী কাম্য" ।(পৃ.১৮১) পাঁচু তার মেয়েকে নিয়ে কোনো রকমে দিনযাপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর জমিদার তাকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করল। পাঁচুর অনুনয় বিনয়ের কোন মূল্য নেই শোষক জমিদারের কাছে। খাজনার বদলে পূর্ব পুরুষের ভিটেটাই চলে গেল অত্যাচারী জমিদারের কবলে। পাঁচুর অভাব অনটনের মাঝেও অপূর্ব সুন্দরী কন্যা 'টুনি'কে ঘিরে অনেক স্বপ্ন ছিলো। কোনো এক বর্ষণমুখর রাতে সব আশা ভরসা স্নেহ মমতা ত্যাগ করে টুনি পাড়ি জমালো পরপারে। পাঁচুর মন যেন পাথর হয়ে গেছে। সে কাঁদলো না। বৃষ্টির পানিতে আর কি করার। অগত্যা মেয়েকে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দিল। এ পর্যায় এসে গল্পের পরিণতি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। একটা নির্মম পরিহাস শোষণ পীড়নের প্রকৃত চিত্রকে স্মরণ করে দিয়ে পাঠক চিত্তকে আন্দোলিত করে করুণ রসে। সেই সাথে জমিদারের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আয়োজন করেছেন গল্পকার এভাবে। "সেদিন সকালে দেখা গেল জমিদার বাবুর খাস পুষ্করিণীতে একটা কলার ভেলা ভাসিতেছে, তারই উপর একটা ছোট্ট মেয়ে শায়িত। হাতে তার পদ্মের মৃণাল.... গৌরতনু সাদা কাপড়ে ঢাকা। জমিদার

Dhaka University Institutional Repository

বাবু এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। জমিদার বাড়ীর পুরোহিত বলিলেন: মা সরস্বতীর ছলনা। জমিদার বাবু গলার উড়ানি জড়াইয়া বার বার মাকে প্রণাম করিলেন। পুরোহিতের সাথে পরামর্শ করিয়া জমিদার, নায়েবকে তিনশত টাকা দিতে আদেশ করিলেন, পাঁচশো কাঙালীভোজন, সাত গ্রামের ব্রাহ্মণ চাই। মার পূজার ত্রুটি না হয়। পূজার পর আবার মাকে মহা সমারোহে দূর নদী গর্ভে বিসর্জন দিতে হইবে" ।(পৃ.১৮৩-৮৪) ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমেও যে প্রতিবাদ করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'বকেয়া' গল্প। এ গল্পে নির্দয় শাসকের প্রতি একটি তীর্যক ব্যঙ্গও নিক্ষেপ করা হয়েছে। পাঁচুকে জমিদার ভিটে ছাড়া করেছেন; ওষুধ পথ্যের অভাবে তার মেয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। মেয়ে বেঁচে থাকতে সে এতটুকু করুণা পায়নি জমিদার মহাজনের কাছ থেকে কিন্তু মৃত মেয়েটি বন্দিত হলো সরস্বতীর মত। গল্পাংশের এই Irony ট্রাজিক আবহকে উজ্জ্বল করেছে। তাছাড়া পাঁচুর সন্তান হারানোর বেদনা ও চরম অসহায়তার মাঝে নির্লিপ্ততা জমিদারের প্রতি নিরব কটাক্ষ হিসেবেও ধরে নেয়া যায়।

শোষকেরা নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্বলতার দিকটি মনে রেখে, ধর্মানুরাগীদের সঙ্গে সমঝোতা করে। এই গল্পে এই দিকটি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ন্যূনতম খাবার অভাব ও চিকিৎসার সুন্দরী শিশু কন্যাটি মারা যায়। পিতা কন্যার লাশ কলার ভেলায় করে জলে ভাসিয়ে দেয়। কন্যার প্রকৃত পরিচয় না জেনে পুরোহিত এটিকে দেবী সরস্বতী বলে ঘোষণা দেয়। জমিদার বাবু মহাসমারোহে তার পূজার ব্যবস্থা করে। চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে গেল জমিদার বাবুর ধর্মনিষ্ঠার দিকটি। সে আচার-অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে ঢাকা পড়ে গেল তার শোষণের দিকটি। এ গল্প আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কথা মনে পড়ে। .....

'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'।

'ভাগাড়' গল্পে চৎমকার প্রতীকের মাধ্যমে সমাজের বিত্তবানদের লোক দেখানো মানবতাকে ব্যঙ্গ করেছেন গল্পকার। মনসব আলী ধনী লোক। "গ্রামে এলে তার মনে পড়ে কুইনাইন গুদামের কাহিনী। এক পাউন্ড কুইনাইন সে পাঁচ শ ছ'শ টাকায় বেচেছে। শুধু কুইনাইন? চাল,আটা, চিনি কত রকমের ব্যবসা তার গঞ্জে, শহরে। টাকা লুটেছে সে হাজার, লাখ। কম কী, ছোট খাট জমিদারী, তিরিশ লাখের ব্যাংক খতিয়ান, চালু দশখানা কারবার, মটোর, জীপ, বিবির দামী দামী গহনা। শুকর আল্লা, তোমার দরগায়। দশখানা গাঁয়ে সেইত একমাত্র মাথা" ।(পৃ.১৮৪) চেনা জানা অনেক লোক আসে মনসব আলীর কাছে কিছু পাবার আশায়। মন খারপ হয়ে যায় মনসব আলীর। রোগে-শোকে অনেক মানুষ মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তাদের সংখ্যা কম নয়। "এত মানুষ! মানুষকেই ত ভয়" ।(পৃ.ঐ)

Dhaka University Institutional Repository

মনসব আলী নিয়ত করেছে-গ্রামবাসীদের পেটভরে গোস্ত খাওয়াবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তহশীলদারকে হুকুম করল-চারটা গাই আনার। গায় গরুর দাম খুব বেশী বলে তহশীলদার জানালেও মনসব আলী দমে না। "বেশ। দু'হাজার লাগবে ত? কুচ পরোয়া নেই। আল্লার রাহে টাকার হিসাব চলে না" ।(পৃ.ঐ) জনগণের রক্ত শুষে খেলেও আল্লাহ মাফ করবেন। আল্লাহ মনসব আলীদের রক্ষা করবেন। মনসব আলীর মতো ধর্ম ব্যবসায়ীরা অন্তত তাই বিশ্বাস করে। এখানে ধর্মের ধ্বজাধারীদেরকে বিদ্রুপের মাধ্যমে এভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। গায় কোরবানীর আগে ধর্মের বিধানানুযায়ী চারটা গায়ের জন্য সাতাশটা নাম ঠিক করতে গিয়ে নিকটাত্মীয়-স্বজন ও দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের সমেত নাম পাওয়া গেল মাত্র উনিশটি। নামের ঘাটতি পূরণের ভার তহশীলদারের উপরে ন্যস্ত হলে ফজরআলীর নাম প্রস্তাব করলে, মনসব আলীর মনে পড়ে। "ফজর আলী! সত্যিই বেচারা। কয়েক বিঘা দূরে মৃধা পাড়ার প্রতিবেশী। বড় বাধ্য ছিল সে মনসব আলীর। চাউলের খোঁজে শেষে নিরাশ অভুক্ত স্ত্রী পুত্রের সম্মুখেই গলায় দড়ি দিয়েছিল"। (পৃ.১৮৫)

যথারীতি গোশত বিতরণের কাজ চলছে। পরিপূর্ণ সওয়াব পেতে চায় মনসব আলী। আগে নির্দেশ ছিলো ঘরে পাঁচ সেরের মতো গোশত রাখার। ওসব গরীব মিসকিনের হক কিনা। গোশত বিতরণের আগে আবার স্মরণ করিয়ে দেয় মনসব আলী, তহশীলদারকে। "ঘরে কিছু রাখবেন না, সব বেঁটে দিন" ।(পৃ.ঐ) কী দরদী মানুষ মনসব আলী! কোরবানী করার ইমেজ ও বিতরণের আঞ্জাম দহলিজে বসে-শুকর তেরি আল্লা, বলে উপভোগ করেছিলেন মনসব আলী। হঠাৎ হুজুর হুজুর শব্দে তহশীলদার চলে আসে মনিবের কাছে। এমন ভঙ্গীতে তহশীলদার কোনোদিন কথা বলেনি। "হুজুর, জলদি চলেন। কোথায়? ভাগাড়ে। ভাগাড়ে? চলুন ভাগাড়ে কোরবানীর গোশত। তহশীলদার ভাগাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে ঃ হুজুর, হুজুর। কি হলো? ভাগাড়ে কালকের কোরবানীর গোশত। চলা থামে না দু'জনের। হ্যাঁ হুজুর। রাত্রে সব ফেলে দিয়ে গেছে। ফেলে দিয়ে গেছে কারা? গায়ের লোক" ।(পৃ.১৮৬)

উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন বলল ঃ "হুনেন। গোশত দিছলেন। খামু ক্যামনে? কেন? হুজুর গুশত পাক করতে ত্যাল লাগে, নুন, মরিচ, লাকড়ী লাগেনি, হুজুর"। কেউ চেঁচিয়ে বলে ঃ "হুজুর গুশত খাইতে বা'ত লাগে।.... হুজুর হফতায় তিন দিন উয়াস কন গুশতে কি অইব"? (পৃ.১৮৭) এরকম আরো অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপের চিত্র আছে গল্পে। চারিদিকে অধিকার বঞ্চিত জনগণের ব্যঙ্গভরা কৌতুহলী দৃষ্টি দেখে মনসব আলী ভয় পায়। "এত মানুষ কেন এক জায়গায় জমে"? অধিকার ও আত্মসম্মান নিয়ে সকলে সোচ্চার হয়ে গেছে। প্রতীকাশ্রয়ী বর্ণনা গল্পের শেষাংশকে করেছে আরো ব্যঙ্গময়। "মাথার উপরে পাখনার শাঁই শাঁই শব্দ, আকাশে মুখ তুলে তাকায় মনসব আলী। বহু পাখনার শাঁই শাঁই শব্দ আরো একদল শকুন পড়ল ভাগাড়ে"। (পৃ.ঐ)

Dhaka University Institutional Repository

'ভাগাড়' গল্পে অর্থবিত্তের মালিক, প্রবল প্রতাপের অধিকারী মনসব আলী সম্মিলিত জনগণের কাছে হেরে যায়। আল্লার নামে গাভী কোরবানী দিয়ে গরীবকে দান করে পাপ ঢাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সে জানে না যে, শুধু গোশ্‌ত দিয়ে পেট ভরে না; অন্যেরও প্রয়োজন আছে, সঙ্গে লাগে নুন, মরিচ, লাকড়ী। প্রসঙ্গত এ-ও মনে হয় যে, শুধু চাল নুন প্রভৃতি নেই বলেই দানের মাংস ভাগারে ফেলে দেয় নাই অভাবী মানুষগুলো, আরো গভীর কারণ থাকতে পারে। মনে হয় মনসব আলীর প্রতি মামলি ঘৃণা নয়, অপরিমেয় ঘৃণা ও আক্রোশ সঞ্চিত হয়ে আছে অত্যাচারিতদের মনে। তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণী চেতনা। যা সামান্য সুযোগ পেলে সক্রিয় দ্বন্দ্বের রূপ নেবে। গল্পের শেষে শাঁই শাঁই শব্দ করে আকাশে শকুনের ওড়াও তারই ইঙ্গিত বহন করে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ শওকত ওসমানের ছোট গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেন।- "শওকত ওসমান উঁচুস্তরের জীবনশিল্পী, তাঁর ছোটগল্পের গঠন প্রণালী এবং ভাষায় ও চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর বৈদগ্ধ ও বৈশিষ্ট্য চোখ এড়ায় না কারো। তাঁর সমকালীন অনেকের মতো তিনি কাহিনীকার নন, তিনি ছোটগল্প শিল্পী। তাঁর ছোট গল্প এতোটা নিটোল যে, রেখা যেমন গোল হ'য়ে ঘুরে এক জায়গায় শেষ হয়ে একটি বৃত্তের সৃষ্টি করে তেমনি তাঁর গল্প যখন শেষ হয় তখন তা নিছক কাহিনী থাকে না, কাহিনীতর এমন কিছু হয়ে উঠে যা প্রতিমার মত শিল্পিত। শেষ দিকে বহু হালকা নকশাধর্মী গল্প লিখলেও তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলো নিঃসন্দেহে অনবদ্য। 'শ্রেণী সচেতনতা' শওকত ওসমানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রেণী বিভক্ত আমাদের সমাজের নিচু তলার মানুষদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত"।[৩]

---

৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য। প্রকাশক: মোহাম্মদ আমীন। প্রকাশকাল-১৯৮১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬)

সরদারজয়েন উদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে, পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের চরখাঁপুর গ্রামে। জয়েনউদ্দীনের পারিবারিক পদবী ছিলো 'বিশ্বাস'। বংশের মধ্যে সবাই বিশ্বাস ব্যবহার করলেও তিনি কর্মজীবনের শুরুতে নামের আগে 'সরদার' পদবী জুড়ে দেন। 'বিশ্বাসের' চেয়ে অনেকটা আধুনিক মনে করে সরদার পদবীটা সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিতি করান।

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় স্থানীয় মাদ্রাসায়। সেখানে তি মাত্র ছয় মাস পড়ালেখা করে উদয়পুর মিডল ভার্নাকুলার স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চার টাকা সরকারী বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সাতবাড়িয়া হাইস্কুলে ভর্তি হন কিন্তু কিছুদিন পর সেটা ছেড়ে খলিলপুর হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। সাতবাড়িয়া ছাড়ার একটি কারণ ছিলো আর্থিক। খলিলপুরে জায়গীর থাকার সুযোগ আছে এবং তা হলে বাড়ীর উপর আর্থিক চাপ কমে যাবে এবং বাড়ী থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে স্কুলে যাবার কষ্টটাও লাঘব হবে সেই বিবেচনায় তিনি স্কুল পরিবর্তন করেছিলেন।

সাতবাড়িয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর ভর্তি হন পাবনা শহরের এডওয়ার্ড কলেজে। কলেজে পড়ার সময়ে তিনি জুট রেগুলেশনে অল্প দিনের জন্য অস্থায়ী এক চাকরীতে যোগ দেন। আ.এ দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়লেও ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়ে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা চলে যান অগ্রজ রিয়াজউদ্দিনের কাছে। কিছুদিনের মধ্যে রিয়াজউদ্দীন চাকরি নিয়ে ডায়মন্ড হারবারে চলে যাবার সময় তাঁর দশ টাকার টিউশনি জয়েনউদ্দীনকে দিয়ে গেলেন। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে চাকরি খুঁজতে ছিলেন জয়েন উদ্দীন। এ সময়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি জুটে গেল। ৯ মার্চ ১৯৪২ সালে তিনি হাবিলদার ক্লার্ক পদে যোগ দিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এখানেই সমাপ্তি ঘটল তাঁর। ১৯৪৭ সালে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়ে ঢাকায় চলে আসেন তিনি। ঢাকায় তিনি শ্লেটের ব্যবসা, কাপড় সেলাই, সেনাবাহিনীর ঠিকাদারী করে জীবিকার্জনের চেষ্টা করেন। তারপর যোগ দেন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বিভাগে, কাজ করেন 'দি পাকিস্তান অবজারভার', 'দৈনিক সংবাদ' ও 'দৈনিক ইত্তেফাকে'। ১৯৫৫ সালে তিনি ছিলেন পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির 'সেতারা ও 'শাহীন'-পাক্ষিকের সম্পাদক ও পরিচালক। ১৯৫৬ সালে কাজ করেছেন 'দি রিপাবলিক' নামক ত্রৈমাসিক ইংরেজী সাময়িকের পরিচালক, প্রকাশক ও মুদ্রক হিসেবে। ১৯৬০ সালে ইষ্টার্ণ ফেডারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে দু'বছর চাকরির পর সিকান্দার আবু জাফররের মধ্যস্থতায় বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা ও বিক্রয় শাখায় সহকারী অফিসার পদে তাঁর চাকুরি হয়। তার পর যোগদান করেন জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে। সেখানে ছিলেন ১৪ বছর। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত রিসার্স অফিসার, ১৯৭২ থেকে ৭৮ পর্যন্ত পরিচালক।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত। সেখানে তাঁর চকুরিজীবনের অবসান হয়। অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী। অবসর জীবন বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। ছয় বছর পর তথা ১৯৮৬ সালে এই জীবন সংগ্রামীর জীবনের যবনিকাপাত ঘটে।

দুই

সাহিত্য তাকে আকৃষ্ট করেছে কিশোর বয়স থেকে। সাহিত্যের সব শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। তাঁর রচনাবলীর তালিকা বেশ দীর্ঘ। নিচে তাঁর রচনার একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

ছোট গল্প ঃ 'নয়ানচুলী'- (১৩৫৯); 'খরস্রোত' (১৩৬২); 'বীরকণ্ঠীর বিয়ে' (১৩৬২), 'অষ্টপ্রহর' (১৩৭৭), 'বেলা ব্যানার্জীর প্রেম' (১৩৮০)।

উপন্যাস ঃ 'আদিগন্ত' (১৩৬৫), 'পান্নামোতি' (১৩৭১); 'নীলরভরক্ত' (১৩৭২); 'অনেক সূর্যের আশা' (১৩৭৩); 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' (১৯৭৫), শ্রীমতি ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলী (১৩৮০), কদম আলীদের বাড়ি (১৯৮২)।

প্রবন্ধ ঃ * আমাদের গ্রন্থ ও পাঠক: একটা স্তূপীকৃত সমস্য- ১৩৭৪, (সংকলন)।

* সংস্কৃতির উৎস বাঙ্গালী-আনার জয় নব উত্থান, ১৯৭২ (সংকলন)।

* ভাষা থেকে পোষাক ১৯৭২, (সংকলন)।

শিশু সাহিত্য ঃ 'অবাক অভিযান' (১৩৭১) 'উল্টোরাজার দেশ' (১৩৭৬), 'টুকুর ভূগোল পাঠ' (১৩৭৯), 'আমরা তোদের ভুলবনা' (১৯৮১),

অনুবাদ ঃ Folk tales of Asia (iv part) গ্রন্থের অনুবাদ- এশিয়ার লোককাহিনী। (৪র্থ ভাগ)

সরদার জয়েনউদ্দীন সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরুপ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি লাভ করেছেন-

আদমজী সাহিত্য পুরষ্কার (১৯৬৭), বাংলা একাডেমী পুরষ্কার (১৯৬৭), অগ্রণী ব্যাংক পুরষ্কার (১৯৮১), উত্তরা ব্যাংক পুরষ্কার (১৯৮২) এবং বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৪)।

সরদার জয়েনউদ্দীনের ৫টি গল্প গ্রন্থের মধ্যে প্রথম তিনটি আলোচ্য সময়সীমার আওতায় আসে। স্বভাবতই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে সেগুলোর মধ্যে। সংকলন তিনটিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ৩৪ টি গল্প। শিল্পগুণ ও বিষয় সম্পৃক্ত বিবেচনা করে প্রতিনিধিত্বশীল মোট ছয়টি গল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাছাই করা গল্প ৬টি হচ্ছে-করালী, কাজী মাস্টার

Dhaka University Institutional Repository

ও সবজানের সংসার (নয়ানটুলী), বক্সো আলী পন্ডিত, খরস্রোত (খরস্রোত),তালাক (বীরকণ্ঠীর বিয়ে)।

তিন

'করালী' (নয়ানটুলী) গল্পের কাহিনী- সংক্ষেপ হচ্ছে 'করালী' দিন মজুরের ছেলে। তার ঘরে জামেলা নামের সুন্দরী বউ ছিলো। সে গ্রামের জমিদারের লালসার শিকার হয়। দুশ্চিন্তায় দিশেহারা অবস্থা করালীর। গ্রামের লোকেরা জমিদারের বিরুদ্ধে যায়। তারা মামলা করতে পরামর্শ দেয় করালীকে। কেউ কেউ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। "জমিদার হয়েছে- তো কী হয়েছে, ঘরের বৌ নিয়ে, ইজ্জত নিয়ে লীলাখেলা, এ আমরা সহ্য করবো না"।[১] করালী মামলা করার মনস্থ করলেও শেষ পর্যন্ত করতে পারে না। জমিলাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনার কথা ভাবতেই নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করে- 'জামেলা কি আসবে? বিক্ষুব্ধ হয়ে আস্ফালন করে করালী । - "শালা জমিদার হইছো তো কী দু'নের আল্লা হইছো? তোমার চৌদ্দগোষ্ঠীর পিন্ডি চিটকাবো আজ। চুপ করে থাকলিই বড় বাড় বাড়ে। অনেক থাকছি, আর না এবার তোমার গোষ্ঠীর ছেরাদ্দ"।[১]

প্রতিবাদ 'করালী' গল্পকে একটা বিশিষ্ট স্থানে নিয়ে গেছে। শ্রেণী সংগ্রামের মর্ম সহজ-সরল মানুষের মুখে নিঃসৃত হওয়া সামন্তশাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়ার নামান্তর।

গল্পের পরিনতি তেমন উজ্জ্বল না হলেও সাধারণ মানুষের সংগঠিত হবার ইঙ্গিত নিশ্চয় অর্থবহ। গল্পকার জয়েনউদ্দীন এ গল্পে সমাজতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার পরোক্ষ ইঙ্গিত দিতে ভুল করেননি।'করালী'র মতো খেত মজুররাই তো শ্রেণী সংগ্রামের শক্তি যোগাবে। বৈষম্য দূর করতে জীবন উৎসর্গ করবে।

'করালী'র মতো অনেকেই গ্রাম বাংলায় শোষিত। তাদের শোষণের মাত্রা চরমে পৌছালে- জমিদারের ষড়যন্ত্র অন্যস্থানে বাঁক নেয়। ক্ষেত মজুরদের সামর্থে কুলায় না নতুন ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে- অধিকার আদায় করতে। ক্ষেত- মজুরদের মধ্যে থেকে জমিদার হাত করে নেয়- অভাবী অসহায় মানুষকে। তখন আর সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার পর্যায় থাকে না। কাল মার্কসের অসম বিকাশ তত্ত্বের নিরিখে- শ্রেণী সংগ্রামের মূলে শ্রেণী সচেতনতার গরুত্ব কম নয়। এ গল্পে 'করালী' সেই শ্রেণী সংগ্রামী জনতার প্রতিনিধিত্ব করছে নি:সন্দেহে।

'করালী' গল্পের আলেচানা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসের 'করালী'র কথা মনে পড়ে যায়।

---

১. সরদার জয়েনউদ্দীন: নয়ানটুলী; প্রকাশনায়- এভারনিউ প্রেস; প্যারিদাস রোড: ঢাকা। দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ- ১৩৮১। (পৃ.১৪)

Dhaka University Institutional Repository

সরদার জয়েনউদ্দীন রচিত 'করালী' চরিত্রের মতো তারাশঙ্করের করালী চরিত্র ও দুর্দান্ত প্রতিবাদী। তারাশঙ্করের ভাষায় – 'করালী' এই পাড়ারই ছেলে। চন্দনপুরে রেলের কারখানায় কাজ করে করালী। কথাবার্তায় চাল-চলনে কাহার পাড়ার সকলের থেকে স্বতন্ত্র। কাউকে সে মানতে চায় না। কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে না। যেমন রোজগেরে, তেমনই খরচে। সকালে যায়-চন্দনপুর, বাড়ী ফেরে সন্ধ্যায়। আজ বাড়ি ফিরে শিস শুনেই সে কুকুর আর টর্চ নিয়ে বেরিয়েছে।"

'কাজী মাষ্টার' (নুয়ানডুলী) গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে পরান নামের দরিদ্র কৃষকের মেয়ে ময়নাকে কেন্দ্র করে। পরান নিজে শিক্ষিত হতে না পারলেও মেয়ে ময়না কে লেখাপড়া শেখাতে চায়। কাজী মাষ্টারের আশ্বাসে-আরো আশাবাদী পরান। সমাজের চোখে মেয়ের বয়সের হিসাব তোয়াক্কা না করার অভয় বাণী দেয় কাজী মাষ্টার। পরানের মেয়ে ময়নার প্রতি গণিমন্ডলের আকর্ষণ। ময়নার বয়স এগার-সাড়ে এগার। গণিমন্ডল বিয়ে দেয়ার জন্য তাগাদা দেয়। অথচ চৌধুরী বাড়ীর মেয়েদের কোন চিন্তা নেই বয়সের হিসেব নিয়ে। কোরান-হাদিসের দোহাই দিয়ে গণিমন্ডল পরানের মেয়ে ময়নাকে পেতে চায়। পরান গরীব হলেও গণিমন্ডলের আসল উদ্দেশ্য জানে। মনে মনে বলে।-"শালা কি চালাক! গোপনে ঘটক পাঠায় ময়নাকে আমার হাতে দিলে সুখে থাকবে। আর উপরে উপরে চোখ রাঙায়, কোরান-হাদিসের ভয় দেখায়। আল্লাহ কি ওষুধ দিয়েছে- পরধান আর মৌলভীদের হাতে- কোরান আর হাদিস, ইসলাম আর মুসলমান। কি না পারে, ওষুধের জোরে ওরা দিনকে করে রাত, আবার রাতকে দিন, গরীবকে ভয় দেখিয়ে কাবেজ করবার একেবারে ধন্বন্তরী কবজ। (পৃ.৬২)

কাজী মাষ্টারের অনেক স্বপ্ন ময়নাকে নিয়ে। ময়না মেধাবী, বৃত্তি পাবে। অনেক নাম হবে মাষ্টারের। ময়নার মতো তুখোড় মেয়ে হাতে পায়নি মাষ্টার জীবনে। আমানত কাজী চ্যালেঞ্জ করে বলে- ময়নাকে সে গড়ে তুলবেই। কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। উপস্থিত জনতার মাঝে বিচার হয়ে গেল,- "পাঠশালায় আর ময়নাকে যাওয়া চলিবে না।"(পৃ.৬৩) শান্ত শিষ্ট ভদ্র স্বভাবের কাজী মাষ্টার সহ্য করতে পারল না এ জ্বলন্ত অন্যায় ও অবিচার। প্রাণপণে সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো মাষ্টার। কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে-গনি মাষ্টারের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো।– "এ এক তরফা বিচার- এটা বিচারই নয়, আমরা এ বিচার মানিনা। এস পরান, আমরা জেলার ইনসপেক্টরকে জানাব। দেখব ময়নার পড়া বন্ধ করে কে?"(পৃ.৬৪) গণিমন্ডলরা সব পারে। তারা ইনসপেক্টরকে পরোয়া করে না। পাঠশালা ধ্বংস করা মামুলি ব্যাপার তাদের কাছে। মন্ডলের হুকুমে বাসারত পাঠশালা ভেঙে গাঙে ভাসিয়ে দিতে চায়। মাষ্টারের চোখে ঘুম নেই-গণিমন্ডলের আস্তানা থেকে ফিরে। অবশেষে পরানের জমিটুকু চলে গেল। মাষ্টারের দীর্ঘশ্বাস। "ও আমি আগে থেকেই জানতাম। বড়লোক পিছনে লাগলে গরীবের বেঁচে থাকার মত আইন এখনো এদেশে হয় নাই পরান।" (পৃ.৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

'কাজী মাষ্টার গল্পে' পরান নামের সহজ-সরল-দরিদ্র কৃষকের বাপ-দাদার এজমালি সামান্য জমি বেদখল হওয়ার চিত্র গ্রাম বাংলার দুই শ্রেণীর কথা মনে করে দেয়। এক শ্রেণীতে থাকে জ্ঞান তাপস- সচেতন শিক্ষক, সংস্কারক,- অন্যশ্রেণীতে আছে- শোষক-শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী। কাজী মাষ্টারের হাতে অবৈধ ক্ষমতা নেই। শক্তি সামর্থ সব গণিমন্ডলের হাতে। কিন্তু মাষ্টার হেরে যেতে রাজী নয়। মাষ্টারের কথায় আশাবাদ ও দূরদর্শিতার প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ব কথার সুর- (গরীবের বেঁচে থাকার মত আইন এখনো এদেশে হয় নাই পরান।)" আর হওয়াও সম্ভব নয়।; যতদিন তোমরা নিজেদের আইন নিজেরা না করতে পার"। (পৃ.ঐ) পরানরা আইনের মারপ্যাঁচ না বুঝলেও শোষণ জুলুম ঠিকই বুঝতে পারে। আর সেজন্যই বলে। "আমি গুষ্ঠি শুদ্ধ উপবাস আর আমার মেয়েটাকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে আমার বাড়ির অংশ পর্যন্ত সমাজের পেরধান হয়াও কাড়ে নিল- একটা অন্যায় জুলুম" ।(পৃ.ঐ)

তবুও আশা ছাড়ে না কাজী মাষ্টার। কপি ক্ষেতে পানি দেয় মাষ্টার। কপি বিক্রি করে নতুন করে পাঠশালা গড়বে। পরানও জেগে ওঠে। সে বুঝতে পারে তারও অনেক দায়িত্ব । শুধু ময়না ও তোমেজের কথা ভাবলে হবে না। সমাজে শিক্ষার আলো জ্বালাতে তাকেও হাল ধরতে হবে। কাজী মাষ্টার দেখতে পেল "পরানের মাথার উপর দিয়ে লাল সূর্যের আলো উঠিতেছে।"(পৃ.৭১)

পরান শ্রেণীগত অবস্থানকে অতিক্রম করে যায়। গল্পকার উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন- নিম্নবৃত্তীর মানুষের সম্বিত ফিরে পাবার বর্ণনায়। এ যেন নিরব বিপ্লবের ভাষায় কথা বলে পরান- . "না না মাষ্টার. দেশের ভাল কাজ কি তুমি একাই করবে? দাও দাও বালতি আমার কাছে দাও. আমিও ভাগ নেই- দেশের লোক লেখাপড়া শিখবি বৃত্তি পাবি- মানুষ হবি. দেশ জোড়া নাম হবি; তুমি বলছ বড় সোজা কথা নয়। এর অংশ আমিও নেব পন্ডিত। আমিও নেব।"(পৃ.ঐ) এভাবেই তো চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের দিকে অগ্রসর হয় সমাজ। লড়াই চলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে। বিপ্লবী কর্মকান্ডে এ লড়াই শেষ হয় অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলোর ধ্বংস সাধনে।

এ ছাড়া শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠেছে–সিরাজ মল্লিক ও পরানের কথা বার্তায়। দোহারীর মাছ ঝেড়ে নেয়া সম্পর্কে তাদের কথোপকথন। "বড় জবর কথা কইছো মল্লিকের বেটা, দেশে বাস করার উপায় নাই। আরো যদি চুনোপুঁটি হও। বড়লোকের দোহারী কেউ ঝাড়ে সাহস পায় না, দেখ গিয়ে গণিমন্ডলের বাড়ি, মাছ পাইছে এক ধামা"। (পৃ.৬৬)

'সবজানের সংসার' (নয়ানচুলী) গল্পে সবজানও তার স্বামী কেতাবদির সাংসারিক জীবনের টানাপোড়েন ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সারাদিন মাঠে গতর খাটে কিতাবদি। বাড়ী ফিরে দু'টো দানা পেটে পড়তেই মরার মতো লুটিয়ে পড়ে। সাড়া শব্দ তেমন মেলে না। মনের কথা ব্যক্ত করার কোন সুযোগ পায় না সবজান। কতদিন তার মনের কথা বলা হয়নি। সেই যখন সবজানের পেটে সোনার (মেয়ে) আগমন ঘটেছিল তখন আস্তে আস্তে কানে কানে ফিস ফিস করে কত কথাই বলেছিল সবজান।

Dhaka University Institutional Repository

সবজান ইতস্তত করে। বলতে গিয়েও থেমে যায়। অভয় দেয় কেতাবদি। সবজান বলে, 'চল' এ গাঁওথে চলে যাই" ।(পৃ.৭৪) অনেক দূর, আর কোন গাঁয়, আর কোন দ্যাশে। যে দ্যাশে পেসিটনের মত মাতবর নাই।" কে এই পেসিটন? এরা গ্রাম বাংলার হর্তা-কর্তা–ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ড। আধুনিক সংস্করণে যাকে চেয়ারম্যান বলা হয়। সবজানের মতো আরো কত সংসার যে ধ্বংস করেছে। তার খবর কে রাখে? সবজান ভূমিকা করে বলে- "তুমি পেসিটনের ক্ষেতের সেরা কামলা, তোমার ওপর তার কত বিশ্বাস। জান-পরান দ্যাও রাতদিন তার ক্ষেত খামারের কামে। বাড়ীর কথা ভাবে, আর কি হবি? কণ্ঠ ভিজে যায় নীরব অভিমানে সবজানের। সত্য কথাটা শেষে সমস্ত অভিমান চাপা দিয়ে বলে ফেলে। "আমি পেসিটনের বাড়ী ধান বানা বন্দ সাধে করি নাই। ..... ও বাড়ী ধান বানতে যাতি আমার মন চায় না। পেসিটন লোকটা ভালো না, নজর খারাপ। .... আজ পেসিটন বাড়ী বয়া আসে, আমার ইজ্জতের পর জোর করে হাত দিল।"(পৃ.ঐ) অভাব অনটন সহ্য করলেও এটাতো আর সহ্য করা যায় না। গায়ের ঠান্ডা রক্ত মুহূর্তের মধ্যে গরম হয়ে যায় কিতাবদির। গল্পকার প্রচ্ছন্ন ভাবে হলেও শ্রেণীগত অবস্থানকে ইঙ্গিত দিয়েছেন 'সবজানের' মুখ দিয়ে। "দেখ, রাগ করো না, তোমার পায় পড়ি। ঝগড়া ফ্যাসাদ করা তোমার সাজে না; তাও আবার বড়লোকের সাথে"। (পৃ.৭৫) এ যেন সয়ে গেছে গরীব লোকদের। বড়লোকেরা যা করবে তাই যেন ঠিক। কিন্তু 'কেতাবদি'দের মতো কাউকে না কউকে তো ঘুরে দাঁড়াতে হয়। প্রতিবাদের সাহস সঞ্চয় করতে হয়। লেখক সে প্রতিবাদ ও দ্বন্দ্বের বর্ণনা দিয়েছেন। "রাগে কেতাবদির শরীর গোসাপের মত ফুলতে থাকে। সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয় ওর গায়ের তেল শূন্য লোমগুলো। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। ও ভাবেঃ উঃ-শালা শুয়াররে, মানষের জাত না। শালা তোমার পেটে এত? জাকাত দ্যাও; গরীব দুঃখীর দান খয়রাত কর, হজ করে হাজী হইছো, আর গোপনে সব্বনাশা বদমায়েশের চূড়ান্ত। ..... চিরদিন কারো সমান যায় না, কেতাবদি জানে বাঁচে থাকলে- তোমায় দেখে নিবি, ... তাতে যদি তার সারা জীবন জেলে যায়া পচতি হয়।"(পৃ.ঐ) ক্ষেত মজুর কেতাবদির নির্ভীক সিদ্ধান্ত আবহমান বাংলার শোষিত কৃষক শ্রেণীকে স্মরণ করে দেয়।

প্রেসিডেন্ট নতুন ফন্দি বের করে। বাকী ট্যাক্সের খাতা খতিন বের করে-দফাদার, চৌকিদার, আদায়কারী- পাঠিয়ে একমাত্র সম্বল দুধের গাই ধরে নিয়ে আসে। শত অনুনয় বিনয় করেও গায় ফিরে পায়নি কিতাবদি। কেতাবদির চোখের পানি আর গোপন রইলনা। "ও ভেবরী ছেড়ে ছেলেপেলেদের মত কেঁদে ওঠে ঃ শালার দু'নেটাই বেঈমান আর বদের আড্ডায় ভরতি। হাজি না শালা পাজি তুমি, তোমায় আমি খুন করবো" ।(পৃ.৭৯) এরপরে কি হয়েছিল স্পষ্ট মনে নেই কেতাবদির। মৌমাছির চাকে ঢিল পড়লে যেমন হয় তেমনি পরিষদের সবাই মিলে কিল, চড়, লাথি মেরে লুটায়ে দিয়েছিল। বেঘোর অবস্থায় আক্রোশে ফেটে পড়ছিল কেতাবদি। সবজানের সান্তনায় যেন আরো বেড়ে যাচ্ছিল আক্রোশঃ "হু শালা তোমায় দেখে নেব।" দেখে

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া কি সহজ কেতাবদিদের পক্ষে। কমলমতি নারী সবজানরা তো কেবল পালিয়ে যেতে চায়। বরং চল এ দ্যাশ থে চলে যাই আর কোন দ্যাশে," ।(পৃ.৮০) এবার আঘাত লাগে নাড়ীর বন্ধনে।

গরীব হলেও বাপ-দাদার ভিটের মায়া কেউ ছাড়তে চায়না। তাইতো- কেতাবদির আকুতি। "যাই কি করে সোনার মা, বাপ-দাদার ভিটের মায়া এত সোজা যে, ইচ্ছে করলিই চলে যেতে পারি? একি পালের গাই, না মরা সোনা যে ছাড় দিলি কি গোর কাটে মাটি চাপা দিয়ে দিলিই সব চুকে গেল? এযে আমার জ্যান্ত সোনা, এর মায়া এক দিনে কাটানো যায় না।" (পৃ.ঐ)

কাঁটা ঘায়ে নূনের ছেটা। ঘরে চাল নেই। অসুখে কাতরাচ্ছে কেতাবদি। প্রেসিডেন্টের ইশারায় তাকে চুরির দায়ে ধরতে এসেছে দারোগা। দূর্বলের আর্তনাদ।- "আমার গ'য় বল নাই, এক দুই প্রহরের পথ শুজেনগর, অতদূর আমি হাঁটে যাতি পারবো না। দারোগা বাবু। তাছাড়া আমি তো বেছনায় শুয়েই- চুরি করবো কখন দারোগা বাবু? উঠপ্যার পারিনে দাঁড়াব্যার পারিনে সোজা হয়া- আর আমি করলাম চুরি এ আপনার কেমন বিচার।" (পৃ.৮২)

গরীবের আর্তনাদ শোনে না পুলিশ দারোগা। শাসন শোষণের জগদ্দল পাথরকে চাপিয়ে দিতে তারা খুবই সিদ্ধহস্ত। ব্রিটিশ বেনিয়ারা অতি কৌশলে সে বিষ বৃক্ষের বীজ রোপণ করে গেছে। জমিদার, জোঁতদার, মাতুব্বরদের মতোই রক্তলোলুপ পুলিশ দারোগা। তারাতো–"খামাখা, আমার হয়রান পেরেশান করবেন না দারোগা বাবু। দোহাই আপনার ধর্মের দোহাই।"(পৃ.ঐ) কেতাবদির মতো-অসুস্থ ভূখানাঙ্গা নিষ্পেশিত-অসহায় ক্ষেত মজুরদের করুণ-এ আকুতি শুনবে না। তারা সীমারের চেয়েও পাষাণ। যুগ যুগ ধরে কেতাবদির মতো অনেকের রক্ত শোষণ করেছে এই পুঁজিপতি শ্রেণীই।

যা হবার তাই হলো। কেতাবদিকে মিথ্যা চুরির দায়ে চালান দেয়া হল। চোখে জল উথলে পড়তে চাচ্ছিল কেতাবদির। চরম বেদনাভরা দৃষ্টিতে সে সব ষড়যন্ত্রের নায়ক প্রেসিডেন্টের দিকে নীরব নালিশ জানাতে গিয়ে শুধু বলেছিল, "আইন শুধু তোমাদের জন্যে তয়ার হয় নাই পেসিটন, আইন আমাগরেও। কিন্তু আইন খাটানোর ক্ষেমতাডা তোমাগরে বেশী।" (পৃ.৮৩) কেতাবদিরা উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত মূল্য বা সামজতন্ত্রের প্রকৃত অবস্থা না বুঝলেও অত্যাচার অনাচারকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে। আর সেজন্য তো সত্য কথাটা বেরিয়ে যায়।" আমাগরে আইন অক্ষেমতার জন্যি কোন কাজেই আসে না, কেননা- টাকা পয়সা নাই; আমরা গরীব। তা না হলি কার চুরিতে কারে ফাঁসাও।" আসল চুরিতো কেতাবদিরা করেনা। আসল চোর ওই উপর তলার মানুষরা। কেতাবদির কথায় পেসিটন, পেসিটোনের চেলা-চামুন্ডা-তোষামোদে দু'পেয়ে মানুষ নামের প্রাণী। জেলের ঘানি টানতে হলো কেতাবদির। বাইরের খবর তার জানার কথা নয়। মারাত্মক দুর্যোগ ও দূর্ভিক্ষে-জেলের বাইরে- "মানুষ আর কুকুরে হয়েছে ঝগড়া, এঁটো পাতা চাটা নিয়ে। সমস্ত দেশের

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের অর্ধেকগুলো ক্ষুধার নিদারুণ তাড়নায় পথে ঘাটে পড়ে পড়ে মরেছে-পচেঁছে। জেলের মধ্যে থেকেও কেতাবদি সিপাইজীদের মুখে শুনেছে।-"হেঁয়া পরতো আচ্ছাই হ্যায়, খানা খাতা হ্যায় আউর তনদুরুস্তি হোতা হ্যায়। যাও বাহারমে, বেগরখানা মর যায়েগা।"(পৃ.৮৫)

দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে সবজানের সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ক্ষুধার তীব্র স্রোতে টোকা শেওলার মতো ভেসে যায়। কি করবে সে? পেসিটনের পাতা জালে জড়িয়ে যায়। জেল থেকে ফিরে আসে প্রবল আশা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে। বাপ দাদার চৌদ্দ পুরুষের হাড় মাংস মিশ্রিত ভিটায় ফিরে সোনার মাকে ডাক দেয়। দরজা খুললেই জোছনার আলোয় ঝলঝল করে উঠল সবজানের মুখ। পাশে বসে কেতাবদি ডেকে বলে-"সোনার মা,- ও সোনার মা, ওঠো, চল রাত বেশী নাই, এখনি চলে যাই এ- দ্যাশ ছাড়ে,আর কোনো দ্যাশে।" (পৃ.৮৭) কিন্তু সাবজানের উক্তি শুনে সে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়। সবজান ঘুমের ঘোরে বলে উঠে- "কে, পেসিটন? এত দেরী হলো কেন?" কেতাবদি বুঝে যায় প্রেসিডেন্ট শুধু তাকে জেলে পাঠায়নি, তার বড় সম্পদ সবজানের মাকে অধিকারে নিয়েছে।

'সবজানের সংসার' গল্পে মাতব্বর প্রেসিডেন্টদের লালসার আগুনে পুড়ে গেল সবজান কেতাবদির সংসার। দেশ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে তারা, শেষ পর্যন্ত চলে যেতে পারেনি। কেতাবদি প্রতিবাদ করল, পরিণামে জেলে যেতে হলো তাকে। ট্যাক্সের খাতা বের করে-পাওনা টাকার দোহাই দিয়ে একমাত্র আয়ের উৎস দুধেল গাই ধরে নিয়ে গেল- মাতব্বরের লোকেরা। মিথ্যা চুরির অপবাদে অসুস্থ্য অবস্থায়ও ছাড় পেল না কেতাবদি। জেল খেটে ফিরে এসে এলাকা ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে ছিল কেতাবদির। কিন্তু তাতেও বাধ সাধলো-পেসিটন। সোনার মা (সবজান) এখন আর কেতাবদির নেই। পেসিটনের অপেক্ষায় ছিলো। পেসিটনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কেতাবদি শেষ রক্ষা করতে না পারলেও এ গল্পে শ্রেণী বৈষম্য ও দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পেয়েছে।

আঘাতের তীব্রতায় কেতাবদির প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল-" আল্লাহ আমার মওত দাও।" এই হতাশা শীঘ্রই কেটে গিয়ে তার আসলরুপ প্রকাশিত হয়। "মুহুর্তের মধ্যে মাথা ঝাঁকি দিয়ে ও বলে- না, না মরব্যার আগে শালা পেসিটন তোমায় একবার দেখে যাব".. (পৃ.৮৮) বলেই মোড় ফেরে প্রেসিডেন্টের বাড়ির দিকে। তখন আসমানে শুকতারাটি ডগমগ করেই জ্বলছিল। –শেষ বাক্যটির প্রতীকী তাৎপর্য খুব স্পষ্ট। কেতাবদির নতুন দিন যে সমাগত-সেটা লেখক স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'বক্সো আলী' (খরস্রোত) গল্পের কাহিনী নিম্নরুপ: বক্সো আলী গ্রামে পন্ডিত নামে পরিচিত। নিজের ভিটায় পাঠশালা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। পাঠশালার বিরোধিতা করে গহের হাজী। গহের হাজী বক্সো আলীর অভাব অনটনের সুযোগে পাঠশালা বন্ধ করে জমিটুকু তার নামে লিখে দিতে বলে। বক্সো আলী তা প্রত্যাখ্যান করে। গ্রামের ফইজুদ্দির জমি গহের

Dhaka University Institutional Repository

হাজী-নাজির সাহেবর মধ্যস্থতায় দখল করে নিলে বক্‌সো আলী পন্ডিত প্রতিবাদ করলে গহের হাজী আরো ক্ষেপে যায়। গহের হাজী বাড়ী বাড়ী গিয়ে পন্ডিতের পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের পড়তে নিষেধ করে। পন্ডিত আশা রাখে মনে। বক্‌সো আলী চোখের চিকিৎসা করতে ঢাকায় আসে। ঢাকায় রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। বক্‌সো আলী পন্ডিত ঢাকা মেডিকেলে আসার সময় দেখে বিশাল মিছিল। তারা শ্লোগান দিচ্ছে- 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-। বক্‌সো আলী মিছিলে যোগ দেয়, এবং পুলিশের গুলিতে মারা যায়।

বক্‌সো আলীর পরিচয় আরো জানা যায় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট দেশ বিভাগের সময় তার আশাবাদী মানসিকতায়। "সবার আগে বক্‌সো আলী চাঁদ আঁকা নিশান লইয়া-গলা ফাটাইয়া বলিয়াছিল, 'পাকিস্তান।' সবাই সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল, জিন্দাবাদ। তারপর মনে পড়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের কথা, গাঁয়ের বোর্ড অফিস, পাঠশালা, মসজিদ ঘর এসব রং-বেরংয়ের কাগজ কাটিয়া বিবাহের বাসরের মত করিয়া সাজাইয়াছিল।"[২] মানুষ ভেবেছিল সকাল হলেই বহু দিনের বন্দীত্ব কেটে যাবে; তারা আজাদ মানুষ, নতুন মানুষ হবে। আগের মানুষের সাথে এ আজাদ মানুষের অনেক পার্থক্য থাকবে। সুখ-সম্পদের মুখ দেখবে ভেবে আশায় আনন্দে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

সে সব কথা মনে হলে বক্‌সো আলী পন্ডিতের খুব দুঃখ হয়। আজাদী আসলে তাঁর পাঠশালা হাই স্কুল হবার ভাবনায় বক্‌সো আলী মনের আনন্দে 'ফিকফিক' করে হেসেছিল। সে হাসি গহের হাজী দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল।-কি হে পন্ডিত, নিজের মনেই যে হাসছ কারণডা কি?"- (পৃ.১১৬)এই লোকটাকে বক্‌সো আলী মোটেই সহ্য করতে পারে না। সমাজের লোকেরা তাকে বোম্বাই হাজী বলে জানে। হাজী বলেছিল,-" বক্‌সো আলী তোমার বাংলা ইস্কুল বন্ধ করে দাও। পড়াও পড়াও, আরবী উর্দু পড়াও, একটু আখেরের কাম হোক। বাংলা পড়ে কালুগাজী, লাইলা মজনু ব্যাটারা সব সুর করে পুঁথি পড়ে। যত সব হারামী কায়-কারবার।" (পৃ.১১৭) পন্ডিত হাজীকে বাংলা ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিল। হাজী সে সব কথা কেয়ার করেনি। বাড়ি বাড়ি ফতোয়া দিয়ে বলেছিল, "বাংলা স্কুলে পোলাপান পাঠায়ও না। বাংলা পড়ালেখা শিখে পোলারা সব বেহায়া হয়ে যায়, গোল্লায় যায়। আখেরের কিছু কাম হয় না, ধর্ম কর্ম হয় না, সব নাছারা খেষ্টান হয়ে যায়। আমার বাড়ী পাঠাও মুন্সির কাছে আরবী কায়দা, উর্দু দিনীয়াত এসবে তালিম নিয়ে নিক। বাস আর ক্যান? আখের গোছালেই হল, মুসলমান দীন ইসলাম কায়েম কর।"(পৃ.১১৮) ফলাফলে দেখা গেল বক্‌সো আলী পন্ডিতের বাংলা পাঠশালার অবস্থা পোড়োভিটায় পরিণত হলো। রাতে শিয়াল ডাকে পাঠশালায়। পন্ডিত ক'জন ছেলেপুলে ধরে নিয়ে পাঠশালায় বসলেও ভাবনা চিন্তায় বিমূঢ় হয়ে ঝিমায় মাত্র। গহের হাজী পাঠশালা সর্বশান্ত করে থেমে থাকেনি। পাঠশালার জমিটুকু নিতে চায়। "নিজে দোষে মরে বান্দা আল্লার দেয় দোষ।' তোমার বাপু বললাম, টাকা নাও, ব্যবসা কর, কিছু বেচাকেনা কর, ও পাঠশালা

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়। তাতো করবে না।"(পৃ.১১৯) ও দিকে ফইজউদ্দির জমি হাত ছাড়া হয়ে গেল- হাজী, নাজির সাহেবদের-নোটিশ, মামলা, ডিক্রী, নীলাম, খরিদ ইত্যাদি করার সুবাদে।..

এ গল্পে এক শ্রেণীতে আছে- হাজী সাহেব ও তার সহযোগী নাজির, পুলিশ, রাষ্ট্র শক্তি, অন্য শ্রেণীতে অবস্থান করছে বক্সো আলীদের মত গরীব পাঠশালার পন্ডিত। ফইজদ্দির জমি কৌশল করে কেড়ে নিলে, বক্সো আলী কিছুটা প্রতিবাদ করেও টিকতে পারল না। "শুধু বিড়বিড় করিয়া বলিল, সুদে আসলে ইহার একদিন শোধ দিতে হইবে।" (পৃ.১২২) শ্রেণীচেতনার রুপ আরো স্পষ্ট হয়েছে- গল্পে উল্লেখিত ফাইজদ্দির উপলব্ধিতে।

"শেষ পর্যন্ত পালানের জমিটুকু ঐ শালার বেঈমান হাজী নিয়ে তবে ছাড়ল। না দিয়া আর উপায় ছিল না, অবশ্য দুই একবার ভাবলাম, দেবনা জমি, আসুক দখল নিতে, শালার কলেজা ফানা করে দেব সরকির এক ঘায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে শুনে ছেড়ে দিলাম, বড়লোকের সরকার সহায়। যা কয় সেইডেই আইন, গরীবের কথা না বাসী চুলোর ছাই।"

তাছাড়া ম্যাপ দেখিয়ে পন্ডিত ফাইজদ্দিকে রাশিয়ার জার শাসনের অত্যাচারের কাহিনী বলাতে- প্রত্যক্ষভাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। বক্সো আলী পন্ডিত আশা ছাড়েনি। ফইজদ্দিকে আরো বলেছিল-"জান ফইজদ্দি, এই যেমন তোমার আমার এদেশের দশজনের ধৈর্যের বাঁধ প্রবলের অত্যাচারের আগুনে পুড়ে ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। চারদিক থেকে প্রতিরোধের আওয়াজ আসছে ..... আমরা অন্ন চাই। আমরা বস্ত্র চাই, আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই। সেখানেও তেমনি একদিন উৎপীড়িত মানুষের কন্ঠের আওয়াজ এক হয়ে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।" (পৃ.১২৪)

এ গল্পটিতে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি গহের হাজীর সাথে স্কুল শিক্ষক বক্সো আলী পন্ডিত এবং দরিদ্র চাষী ফইজদ্দির দ্বন্দ্বের কাহিনী। বক্সো আলী নিজের জমিতে স্কুল স্থাপন করেছিল বত্রিশ বছর আগে। তাঁর আশা ছিল স্কুল ক্রমশঃ উন্নত হবে। পাকিস্তান আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন সে আশায়। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয়নি। স্কুলেরও উন্নতি হয়নি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যে আশা দিয়েছিল নেতারা তাও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এই সময়ের মধ্যে উন্নতি হয়েছে, ক্ষমতা বেড়েছে গহের হাজীর। নিজের এলাকায় স্কুলের বিরুদ্ধে কাজ করে সে স্কুলটি প্রায় বন্ধ করেছে। গ্রামের চাষী ফইজদ্দীর নিরক্ষরতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে সামান্য জমিটুকু দখল করে নেয়। তার কাজে সহায়তা করেছে সরকারী আমিন, নাজির ইত্যাদি। কিন্তু ফইজউদ্দি বা বক্সো আলী পন্ডিত আশা হারায়নি। তারা ভেবেছে একদিন না একদিন গহের হাজীদের পতন হবেই।

---

২. সরদার জয়েনউদদীন, খরস্রোত। প্রকাশক: আজিজুররহমান চৌধুরী; ইসলামপুর, ঢাকা।
প্রথম প্রকাশ: ১লা ফাল্গুন ১৩৬২।পৃ.১১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রবল আশাবাদী পন্ডিত ঢাকা গিয়েছে চোখের ছানি কাটতে। যাতে সে আসন্ন শুভদিন দেখে যেতে পারে। ঢাকায় গিয়ে ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের মিছিল দেখে উৎসাহিত হয়ে যোগ দেয় এবং পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। এই গল্পে গ্রাম প্রধান গহের হাজীর সমস্ত কুকীর্তির বর্ণনা আছে এবং দিনে দিনে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবারও বর্ণনা আছে। তার সাথে যোগ দিয়েছে দেশের প্রশাসন। এত কিছুর পরেও নির্যাতিত ও নিপীড়িত গরীব মানুষগুলো মাথা নোয়ায়নি। সকল অত্যাচারের মুখেও তারা তাদের সাহস এবং আশা বজায় রেখেছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কাজ করে নতুন যুগ আনার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

পন্ডিত ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কাহিনী সাধারণ মানুষের শুনিয়েছে, মানুষকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে। পন্ডিতের আশাবাদ, স্বপ্ন ও দৃঢ় মনোবল জানা যায় নিম্নোক্ত উদ্বৃতি থেকে। "এ কথায় পন্ডিত যেন কিছু আলো দেখিতে পাইল। আবার সুন্দর পৃথিবী দেখিবার একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা তাহার মন প্রাণ জুড়িয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সে বলিল, তুমি ঠিকই বলেছ ফইজদ্দি সে দিনের জন্যে আমার চোখের হারানো আলো ফিরিয়ে আনা দরকার, আমি ঢাকাই যাব ফইজদ্দি, ঢাকাই যাব। চোখ দুটোরে বাঁচাইয়া রাখি। আগে ভাবছিলাম এই সব কুকর্ম যত না দেখতে হয় ততই মঙ্গল, তাই না হয় যে কয়দিন বাঁচি কানা হয়েই বাঁচি। এখন ভাবছি না, ঝড় যখন আসছে তখন মেঘ আবার উড়ে যাবেই আর আলোর রোশনাই জাগবেই। সেদিন সবার সাথে মিশে মিশে আমোদ আহলাদ করা, জৌলুশ দেখা এসবের জন্যেও আমার চোখ দুটোকে বাঁচান চাই।"(পৃ.১২৬)

নতুন আজাদ পাকিস্তানের শুরুতে ছোট্র পরিসরে শ্রেণী বিকাশ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের চমৎকার আলেখ্য এই গল্পটা।

'বীরকণ্ঠীর বিয়ে' গল্প গ্রন্থের 'তালাক' গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে নূরজাহানের জীবনের বিড়ম্বনা নিয়ে। দুধে আলতায় মেশানো চাঁপার মতো' দেখতে মেয়েটার- ফ্যাকাশে চেহারা; কঞ্চির মতো হাত পা গুলো কাঠি কাঠি হয়ে যাওয়া- সবই হাশেম মৌলভীর কর্মের ফল। নূরজাহানের দীর্ঘশ্বাসের শেষ নেই। এবার সে বড়ই নিরাশ। শরীর আর পারে না। এবার হামেল (অন্তসত্তা) হওয়ার পর থেকেই চিন্তা আরো বেড়ে গেছে। জীবন মৃত্যুর অজানা রহস্যের মধ্যেও 'বাঁচবার জন্য একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে কেমন আকুলি ব্যাকুলি করে উঠে।' কতই বা বয়স? চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ে সে। তের থেকে শুরু করে বছরে একটা করে জন্ম নিয়ে মোট দশটি সন্তানের জননী নূরজাহান। সব কটা বাঁচলে এক পাল হয়ে যেত। গায়ের রক্ত সব শুষে নিয়েছে। সময় মতো দুটো খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে কিছুটা রক্ষা ছিল। তার বদলে প্রায়ই উপবাস ও "ওষুধের নামে দেওয়া তাবিজ, বড়জোর গোপাল ওঝার টোটকা টাটকি, নয়তো পীর সাহেবের ফুঁ ফাঁ।"[৩] এ সবে নূরজাহানের কোন বিশ্বাস নেই আর। আজকাল প্রচন্ড ক্ষেপে যায় তাবিজ কবজের প্রসঙ্গে। জাফরান দিয়ে লিখে তাবিজ ভরে আনলে নূরজাহানের

Dhaka University Institutional Repository

শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। মুরগী তাড়ানোর শক্তি নেই শরীরে। ভাতের হাড়িটা চুলো থেকে নামাতে হাপুস খায়। এক একটা পেটে আসলে তাবিজের সংখ্যাও বাড়ে। দশ- দশটা তাবিজের বোঝা বীষের মতো লাগে। এখন তার সহ্যের বাইরে চলে গেছে। প্রবল আক্রোশে বলে-"আমি এ বোজা গলায় নিয়ে আর টানতে পারবো না। যদি মরি তো মরণই হোক। এত জ্বালা আর সয়না আমার। কিছুই হয় না, ওদিকে নাজেহালের অন্ত নেই। ডাক্তার নাই, বদ্দি নাই, যত সব ছাই পাশ বেঁধে বেঁধে জীবনটা আমার শেষ করে দিলে।"(পৃ.১০০)

নূরজাহানের স্বামী হাশেম মৌলভীর খেয়াল অন্যদিকে। আল্লার নামে অশ্রদ্ধায়, তার তওবা বোলের শেষ নেই। নূরজাহানের আল্লার নামে শ্রদ্ধা নেই।,সে শিহরে ওঠে– 'সবগুলো বেঁচে থাকলে কেন্নো কেঁচোর মতো কিলকিল করতো আজ'। তার মনে হয়- 'নিজে বসবার জায়গা নাই শঙ্করীর মাকে ডেকে আন।'(পৃ.১০১) হাশেম মৌলভীদের বোধোদয় হয় না। তারা যুগ যুগ ধরে তাবিজ কবজ, আল্লাহ-রসুল, পাপ পূণ্যের দোহায় দিয়ে সব জায়েজ করে নেয়। নূরজাহানের চরম পরিণতি বা মৃত্যুর মতো করুণ দশায় তাদের মন গলে না। ক্রমেই নূরজাহান মরিয়া হয়ে উঠে। স্বামী হলে কি হবে? তবে কি সত্য কথা বলা যাবে না? সে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করে বলে, –"রোজ হাশর আমার একারই আছে, না তোমারও আছে? পরকে রোজ হাশর ভেস্ত দোযখ এসব দেখিয়ে লাভটা কি, নিজের মনটাকে দেখাও না দেখবে পাপ পুর্ণ্য কোথায়?" (পৃ.১০২) হাশেম মৌলভী অস্থির হয়ে পড়ে। 'এ বাড়ী আজাজিল ঢুকেছে রে, আজাজিল ঢুকেছে। আর এ দোযখে বাস করা যাবে না।' ..... মুখে বলল, "আল্লাহ নাজাত দেও এদের। নাজাত দেও। তওবা, তওবা, তওবা।" (পৃ.ঐ) স্বামী নিয়ে কি করবে নূরজাহান? অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বেরিয়ে আসছে তীব্রভাবে। আখেরাতের ভাবনা কাবু করতে পারে না নূরজাহানকে। অতীত দিনের স্মৃতিতে কেবল লাঞ্চনা, গঞ্জনা, যাতনা। বড় লজ্জা পায় পিছনের দিকে তাকালে। সহপাঠী 'বাসন্তী' কে খুব মনে পড়ে। 'বাসন্তী' আরবী পড়তে যেতে নিষেধ করতো। 'বাসন্তী' হাশেম মৌলভীর কুমতলব বুঝতে পারতো। 'বাসন্তীর' নিষেধ বেশ মনে পড়ে'- "ও মৌলভীটাকে আমি দুই চোক্ষে দেখতে পারি না, কেমন কেমন করে যেন শয়তানী চোখে তাকায়। তুই নিজেও সামলে চলিস। সত্যি ভাই বড্ড কেমন যেন লোকটার চাহনী।"(পৃ.১০৪) 'বাসন্তীর ভবিষ্যৎ বাণীই সত্য হলো। নূরজাহানের অবস্থাকে গল্পকার সরদার জয়েনউদ্দীন রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন এভাবে।–"মাজা ভাঙ্গা সাপ যেমন নিরুপায় হয়ে ক্রোধে নিজের গায় কামড়ে ধরে আর মাঝে মাঝে ফনা তোলে, নূরজাহানেরও তেমনি ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের অদৃষ্টটাকে জ্বলন্ত আগুনের হলকায় লোহা গলানোর মত- গলায়, নয়তো মৌলভীর মুন্ডটা চিবিয়ে খায়।"(পৃ.১০৫)

---

৩. সরদার জয়েনউদদীন; রীরকণ্ঠীর বিয়ে; প্রথমপ্রকাশ- ১৩৬২, প্রকাশক আজিজুর রহমান চৌধুরী, ইসলামপুর, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক ভেবে চিন্তে নূরজাহান কৈশরের সাথী-'বাসন্তী' কে ভিখারীর মাধ্যমে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল তার দুর্দশার কথা। 'বাসন্তী' চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছিল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে শৈশব কৈশরের সে সব রঙিন দিনগুলো। কপাটী, গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু খেলে হল্লা করে ছুটে রেড়াতো নূরজাহান- শরীফুন, বাসন্তী, আলতাফুন, জাহানারা উষা সহ পাড়ার আরো অনেক ছেলেমেয়েদের সাথে। 'বাসন্তী' ছাড়া আর কাউকে তেমন মনে নেই। 'শরীফপুর দেবেন বোসের সাথে বাসন্তীর বিয়ে হয়েছে। বোসবাবু খুব বড় ডাক্তার, দেশ জোড়া নাম কাম।'

'বাসন্তী' নূরজাহানকে নিয়ে গেল-চিকিৎসার জন্য। 'বাসন্তীর স্বামী বোস বাবু বড় ডাক্তার। বাসন্তী অভয় দিয়ে বলে, "তোকে এভাবে বিনা চিকিৎসায় মরতে আমি কিছুতেই দেবনা।"(পৃ.১০৬) কে চায় মরতে এই সুন্দর ভুবনে? সবাই চাই বাঁচতে। মরণের কথা শুনতেই কেঁদে উঠেছিল নূরজাহান হাউ মাউ করে।

হাশেম মৌলভীর কোন পরিবর্তন নেই। কুয়োর ব্যাঙের মতো তাদের জীবন যাপন। তাদের চিন্তা চেতনা ও ক্ষুদ্র পরিসরে ঘুরপাক খায়। নূরজাহানের কাছে জানতে চায় কোথায় যাওয়া হচ্ছে। বজ্র কঠিন স্বরে নূরজাহানের জবাব, "তোমার এ দোজখ থেকে বাঁচতে। আমি শরীফপুর বোস ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা হতে যাবো।"(পৃ.ঐ) নিজের পরাধীন অবস্থা থেকে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে চায় নূরজাহান। কোন শৃঙ্খলে বাধা পড়ে থাকতে চায় না সে। হাশেম মৌলভী পুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার কথা শুনে- নাউজুবিল্লা বলতে বলতে মন্তব্য করলেন। "তোমাকে শরার গায়ের কাজ শুরু করতে আমি দেব না, তুমি আমার ইস্তিরী মনে রেখ।" (পৃ.১০৭) 'বাসন্তী' ও প্রতিবাদ করে বলে উঠল–"আইনের চোখে আপনি দন্ডণীয় হবেন মৌলভী সাহেব। আর আইনকে বাদ দিলেও কারো জীবন নিয়ে খেলার অধিকার আপনার নাই। চল নূরজাহান তুই আমার পাল্কীতে উঠে বোস"। হাশেম মৌলভী চিৎকার ও আস্ফালন করে বলে।–"এক পা সামনে রাখছিস কি কাটে ফেলাব, এক্কেবারে কাটে ফেলাব, জানে মারবো।"(পৃ.ঐ)

পুরুষের অত্যাচারে নারীদের অবস্থা আমাদের দেশে খুবই করুন। বিশেষ করে মোল্লা মৌলভীদের ধর্মীয় গোঁড়ামী অনেক নারীর জীবন যৌবন ধ্বংস করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর লালসালু উপন্যাসের 'মজিদের ধর্মান্ধতা ও কূট কৌশল স্মরণ করনা যেতে পারে। 'তালাক' গল্পে হাশেম মৌলভী এমনই এক চরিত্র। নূরজাহানের কোন স্বাধীনতা ছিলনা। বছরে বছরে সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করেছে নূরজাহানকে স্বামী হাশেম মৌলভী। দশ দশটি সন্ত ান ধারণ করেছে নূরজাহান। শরীর আর পারে না নূরজাহানের। তাবিজ-কবজ ছাড়া হাশেম মৌলভী আর কোন চিকিৎসায় বিশ্বাস করে না। অগত্যা বিদ্রোহ করতে হয় নূরজাহানকে স্বামীর বিরুদ্ধে। নূরজাহান বাঁচতে চায়। এ জন্য ছেলেবেলার খেলার সাথী 'বাসন্তীর' স্বামী-বোস বাবুর কাছে চিকিৎসা করাতে চায় 'বাসন্তী'। বাসন্তীর আশ্বাসে নূরজাহানের মুখে উচ্চারিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

"নারে, মরতে আমি চাইনা, আমি মরতে পারবো না, আমি যাবো, আমি বাঁচবো। মরণে যে আমার বড় ভয় করেরে।"(পৃ.১০৬) নূরজাহান মৌলভীর বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে ডাক্তার বোসের কাছে চিকিৎসা হতে গেলে হাশেম মৌলভী নূরজাহানকে তালাক দেয়। মৌলভীর ভয় ভীতির তোয়াক্কা না করে নূরজাহান বলে, "তাই হোক মুরোদ থাকে কেটেই ফেলাও, আমি যাবই।"(পৃ.১০৭) মুক্তির আনন্দে, 'হাজার শুকুর' বলে ওঠার মধ্যে নূরজাহানের জয় ঘোষিত হয়েছে।

'খরস্রোত' গল্পগ্রন্থের নামগল্প খরস্রোত।গল্পের পটভূমিতে আছে একুশে ফেব্রুয়ারী। খান বাহাদুর মীর্জা গোলাম হাফিজ- অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। চুল-দাঁড়ি পাকলেও তাঁর দামী নাগরা, চুড়িদার পাজামা, আদ্দির পাঞ্জাবী পরিহিত ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের অহঙ্কার এখনও তুঙ্গে। মনে কোন শান্তি নেই মীর্জা সাহেবের। পায়াচারি করতে করতে ভাবছিলেন।–'লঘু গুরু জ্ঞান, পাপ পুণ্যের বিবেচনা, মান-সম্মানের খাতির ও সব যেন সংসার থেকে উধাও হয়ে গেছে।' মুখে মুখে জীবনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত হলেও স্ত্রী পরিজন নিয়ে বিত্ত ভৈববের মধ্যে জীবনযাপন করতে চায় মীর্জা সাহেব। এম.এ পাশ ছেলেটাকে মস্ত বড় চাকুরী জোগাড় করে দেয়ার দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর। কিন্তু ছেলে মনিরের খেয়াল নেই বাবার ইচ্ছার প্রতি। জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ব্যস্ত সে। মীর্জা সাহেবের স্ত্রী মরিয়ম বেগম ভাষা আন্দোলনকে মনে প্রাণে সমর্থন করেন বরকতের মায়ের কান্নার সুর তাঁর মর্মে স্পর্শ করে। তাঁর মাতৃহৃদয় কেবলই পশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল। "এ পোড়া দেশের মায়েদের হৃদয় সাগর ভরে এ আগ্নেয়গিরির জ্বলন আর কত কাল জ্বলবে।"(পৃ.৬৪) মরিয়ম বেগম আল্লাহর উপর ভরসা করে দোয়া করে। "আল্লাহ তুমি ছেলেদের জয়ী করে দাও, সত্যের জয় হোক। আর সে সত্যের মধ্যদিয়ে চির অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাক-বরকতের মায়ের স্নেহের বরকত।"(পৃ.৬৫) এ আন্দোলনে মির্জা সাহেবের মেয়ে ফরিদাও যোগ দিয়েছে। ফরিদা মাকে বলে।-"জান মা, আজ আমাদের প্রভাতফেরী ছেলেদের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। তবে দাদু ভাইদের দলে ছেলে ছিল অনেক বেশী। আমরাও কিন্তু কম যাইনি মা, কয়েকটা স্কোয়াড মিলে প্রায় হাজার মেয়ে হবে। সকাল থেকে না খেয়ে থাকার আফসোস করলে মা-কে ফরিদা বুঝিয়ে বলে। "জান মা, আমার চাইতে অনেক ছোট ছোট মেয়ে কিছু না খেয়ে ছিল।"(পৃ.৬৫) আন্দোলনে মা-মেয়ের পরিকল্পনার বর্ণনা গল্পকার এভাবে দিয়েছেন। –"অনেক কাজ করতে হবে আজকে, আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারী, কত প্রোগ্রাম করা হয়েছে।"(পৃ.ঐ) মায়ের আগ্রহ উৎকণ্ঠার শেষ নেই যেন। মা-মেয়ের কাছে জানতে চান, "কোন পথ দিয়ে মিছিল যাবে; সব ছেলে মেয়ে মিলে মিছিলে কত লোক হবে, কি তাদের দাবী হবে, আমাদের এ পথ দিয়ে মিছিল যাবে তো?" (পৃ.৬৬)

কিন্তু মির্জা গোলাম হাফিজ এ আন্দোলন পছন্দ করেনা। জীবনের পঞ্চাশটা শীত-বসন্ত 'লোহার খাঁচার মত করে পাঁজড়ার হাড় দিয়ে' আগলে রেখেছেন যে আভিজাত্য, তার,শেষ

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষায়- খান বাহাদুর খুব উদ্বিগ্ন। ছেলেটার একি দশা! সিভিলিয়ানের ঘরে জন্ম। আক্ষেপের শেষ নেই।-"কোথায় বাঘের বাচ্চা বাঘ হবে, না রাত দিন চাষা-ভূষো, মুচি-মেথর যতসব ছোট লোকের জাত নিয়ে ঘাটাঘাটি। ছো, ছো ইজ্জতটা একেবারে নোংরা করে ছাড়লো, বংশ মর্যাদার মুখে কালি লেপে দিল দেখছি।" (পৃ.৬৩)

একমাত্র ছেলে মনিরের কাছে আন্দোলন সংগ্রামের প্রয়োজনে অনেক লোক আসে। মেথর পল্লীর কোন লোকের তো প্রয়োজন হতেই পারে। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ভেদাভেদ করা চলে না। কিন্তু খান বাহাদুর তা মেনে নিতে পারে না। তার তো উপর তলার লোকজনদের সাথে চলাফেরা, আদান-প্রদান সভ্যতা-ভব্যতা সবকিছুই।

অধিকারের দাবিতে নারীরা পিছিয়ে নেই। গল্পে মীর্জা গোলাম হাফিজের সম্বিত ফিরে পায়নি তখন পর্যন্ত। শাসনের অধিকারে গম্ভীর গলায় জানতে চায় পুত্র মনিরের কাছে। "মুনির, তোমায় আমি আজ কোথাও যেতে নিষেধ করেছিলাম। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"(পৃ.৬৬) বোধের সর্বোচ্চ শিখরে, মুক্তি ও স্বাধীনতার শোনিত ধারায় সুদৃঢ় প্রতীতী মনিরের বিনীত উত্তরে।-"উপায় ছিলনা বাবা। দেশের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে যখন দেশেরই দাবী নিয়ে আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলছে, তখন আমি নির্বাক হয়ে বাড়ী বসে থাকতে পারিনে বাবা, দেশের প্রতি আমারও কর্তব্য আছে। তাই সবার সঙ্গে প্রভাত ফেরীতে বেরিয়ে ছিলাম।"(পৃ.ঐ) চোখে মুখে গভীর বিষাদ ছেয়ে গেল মীর্জার। শত চেষ্টা করেও টিকিয়ে রাখা গেল না বংশের গৌরব ও অহঙ্কার!

রাষ্ট্রীয় দমননীতির কোপানলে পড়ল মুনির। মুনিরকে একদল পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। খান বাহাদুর একটি কথা ও বলতে পারল না। একেবারে স্তিমিত হয়ে গেলেন তিনি। ভাবনার অথৈ সাগরের অতলে তলিয়ে যেতে থাকেন। কূল কিনারা নেই। বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে মেয়েদের প্রভাত ফেরীর করুণ গানের সাথে 'বরকতের' মায়ের কান্নার সুর ও মসজিদের মিনার থেকে আযানের ধ্বনি একাকার হয়ে ব্যাথা জাগানিয়া মুহূর্তের সৃষ্টি হল। অরুণোদয়ের সাথে ইউনিভার্সিটির দিক থেকে হাজার কণ্ঠের বজ্র কঠিন স্লোগান। "শহীদ সেনারা অমর হোক।" উচ্চস্বরে অনেকে মুনিরকে আহবান করল। "মুনির তোমার যে শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য দিতে হবে, শীঘ্র এস ভাই।" গল্পের শেষ দৃশ্যে- খান বাহাদুর মীর্জা হাফিজের বোধোদয় ঘটে। অধিকার আদায়ের মিছিলে তিনিও সামিল হতে চান। অনুশোচনায় চোখে জল টলমল করছে তাঁর। সমর্পিত স্বীকৃতিতে সমবেদনা ও সতীর্থ হবার বাসনায় বলে।-"মুনিরকে যে কাল পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, আমি গেলে চলবে বাবা সকল?"(পৃ.৬৮)

ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়- শ্রেণী সংগ্রাম চলে আসছে সেই আদিম সাম্যবাদী কালের পর থেকে। এখনও চলছে। হয়তো ধ্বংস হবে উভয় শ্রেণী, নয়তো শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায়।

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পের প্রথম দিকে মীর্জা সাহেবের মনে শ্রেণীগত অবস্থান ও মনোভাব ছিলো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। "গতকাল যাকে দেখেছি, দারিদ্রের একটা চরম দৃষ্টান্ত হয়ে পথে পথে কুকুর বিড়ালের সঙ্গে আহার খুঁজতে, আগামী পরশু হয়তো সেই তোমাকে মুখের উপর দু'কথা শুনিয়ে যাবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে। .... সুতরাং আর কেন? এ বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয়না। সংসারটা ছোটলোকের ঔদ্বত্যে উৎপীড়িত হয়ে উঠেছে।"(পৃ.৬২)–এ মনোভাব গল্পের শেষে পরিবর্তিত হয়েছে। ছেলে মুনিরকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর বাবা মীর্জা গোলাম হাফিজের মিছিলে অংশ গ্রহণ করতে যেতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে। 'খরস্রোত' নামের তাৎপর্যও রক্ষিত হয়েছে- গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রেণী দ্বান্দ্বিক আবহ খরস্রোতের মতো প্রবাহিত থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

১৯২৬ সালের ১ নভেম্বর শরীয়তপুর জেলার নাড়িয়া থানাধীন শিরঙ্গল গ্রামে আবু ইসহাকের জন্ম হয়। তিনি উপসী তারাপ্রসন্ন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪২) এবং ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ (১৯৪৪) পাশ করেন। এখানে তাঁর শিক্ষাজীবনের বড় একটা ছেদ পড়ে। ১৬ বছর পর ১৯৬০ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটান। দেশের মধ্যে বিভিন্ন পদে চাকুরী করার পর বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কূটনৈতিক মিশনে যোগ দেন। তিনি ছিলেন আকিয়াবে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভাইস কনসাল এবং কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী। ২০০৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্মময় জীবনে আবু ইসহাক সাহিত্য চর্চায় সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 'সূর্যদীঘল বাড়ি' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬) নামে তাঁর আরেকটি উপন্যাস আছে। তার রচিত ছোটগল্প গ্রন্থ হলো : 'হারেম' (১৯৬২) ও 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩)। তিনি আরো রচনা করেছেন কিশোর রহস্যোপন্যাস 'জাল' (১৯৮৮), স্মৃতিকথামূলক 'স্মৃতিবিচিত্রা' (১৯৮১) তার একটি ব্যতিক্রমী রচনা 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান' (১৯৯৩)। 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে অনেক সমালোচক চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজী, রুশ, ফরাসী ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে। এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছে। ছোট গল্প 'মহাপতঙ্গ' অবলম্বনে রচিত চিত্রনাট্য 'The Dragon fly'সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার লাভ করেছে।

সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি নানাভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬৩) সুন্দরবন সাহিত্য পদক (১৯৮১), এবং একুশে পদক (১৯৯৭) লাভ করেন

দুই

হারেম সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো হচ্ছে-কানাভুলা, ঘুপচি গলির সুখ, দাদীর নদী দর্শন, পন্ডশ্রম। পিপাসা, প্রতিষেধক, বনমানুষ, বোম্বাই হাজী, শয়তানের ঝাড়ু, হারেম। গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন, স্বামী পরিত্যক্তা নারীর দুর্বিষহ জীবনযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে গল্পগুলো রচিত। সেগুলোতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের আলেখ্য তেমন নেই। তার জন্য আমাদের মহাপতঙ্গ গল্পসংকলনের দ্বারস্থ হতে হয়। এই সংকলনে ১১টি গল্প আছে। সেগুলোর মধ্যে বিস্ফোরণ, খুঁতি, জোঁক, উত্তরণ, শ্রেণীদ্বন্দ্বের পটভূমিকায় লেখা। গল্পগুলোতে সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থিত উচ্চবিত্তের সঙ্গে বিত্তহীনদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

'বিস্ফোরণ' গল্পে একদিকে আছে আতাউল্লাহ খাঁ নামের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অন্যদিকে অবস্থান করছে 'মাঝি' ইয়াসিন'। এ দু'শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে ইয়াসিন ও পরিবানুর

Dhaka University Institutional Repository

দাম্পত্য জীবনে আতাউল্লাহ খাঁ নামের প্রতিপত্তিশালী লম্পটের অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে। কদমতলী গয়না সার্ভিসের মালিক আতাউল্লাহ খানের নৌকার মাঝির কাজ করে ইয়াসিন। ইয়াসিন অনেক খেটেছে এ লোকটার জন্য। চোরাকারবারী আতাউল্লাহ খাঁর সাহায্যকারীদের মধ্যে ইয়াসিন ছিলো প্রধান।"গয়না নৌকার পাটাতনের নিচে চিনি, কেরোসিন ও সূতা বোঝাই করে সে বন্দরে বন্দরে চোরাচালান দিত। সেই চোরাকারবারের টাকা ঢেলে দৌলত মইশালকে হাত করেছে আতাউল্লাহ খাঁ"। [১]

ঘটনাচক্রে দেখা হয় পরিবানুর সাথে আতাউল্লা খাঁর। কদমতলীর দু'মাইল উজানে নয়াকাঠিতে বোরকা পরিহিতা একটি মেয়েকে তার আব্বীয়ার সাথে দেখতে পায় আতাউল্লাহ খাঁ। শিকারীর মতো চোখ আতাউল্লা খাঁর ; তাঁর চোখ এড়ানো যায় না। গল্পকার পরিবানুর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন ;–"পরিবানু ধলাগাঁয়ের কলুবংশের মেয়ে। এই কলুবংশকে লোকে বলে 'পাকনা শোশার ঝাড়'। এ বংশের প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ের গায়ের রঙ পাকা শশার মত। শুধু পাকা শশার মত রঙই ছিল না পরিবানুর। যেমন ছিল তার মুখের গড়ন, তেমন অঙ্গসৌষ্ঠব। তেমন স্বাস্থ্য। রূপের সবরকম উপাদানের এরূপ সমাবেশ কদাচিৎ ঘটে"। (পৃ.২) এখন যার রূপ-তার তো রক্ষে নেই। বিশ্বস্ত অনুচর রমজানকে ডেকে আতাউল্লাহ জানতে চায় কোন বাড়ীর মেয়ে পরিবানু। রমজান বুড়ির কাছ থেকে জানতে পারে মেয়েটা তার নাতিন। আরো জানতে পারে চাঁদপুর গয়নার মাঝি ইয়াসিনের সাথে পরির ভালবাসাভাসি। 'পীরিতের নায় বাদাম দিছে দুইজনে'। বিয়ের সম্বন্ধও নাকি পাকাপাকি।

বোরকা পরা অবস্থায় কতটুকু আর দেখা যায় পাকনা শশার মতো মেয়েটার? আতাউল্লাহ-চাটুকার রমজানকে বলে–"এমন চীজ শুধু পায়ের পাতা দেখিয়ে চলে যাবে? তুমি মন করলে সব পারো। তোমাকে দিয়ে কত কাজ হাসিল করেছি। আর...."। (প্র.৪) অনেক ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে রমজানের সহায়তায় –'বোরখা খুলে পরীবানুকে দেখায় তার দাদী'। পরিবানুর রূপে অবাক হয়ে যায় আতাউল্লা খাঁ। কলুর ঘরের মেয়ের এতরূপ যেন সে বিশ্বাস করতে পারে না। মোকামে ফিরে গিয়েই ইয়াসিনকে ডাকা হয়।

"আচ্ছালামু আলায়কুম! কেমন আছেন ইয়াসিন সা'ব"? (পৃ.৮) কারো ওপরে অসন্তোষ হলে খাঁ সাহেব এমন করে আচরণ করে। ইয়াসিন অসন্তোষের কারণ বুঝে উঠতে পারে না। রমজানকে ডেকে বলে খাঁ সাহেব "ধল গায়ের কলুবাড়ীর ঘানিতে জুড়ে দিয়ে এসো তো হুজুরকে"। এবার বুঝতে অসুবিধা হয় না ইয়াসিনের। নির্বাক হয়ে যায় ইয়াসিন! রমজান বলে– "ভাল মাইনষের পোলা অইয়া কলুর ঘরে বিয়া করতে যায় কেউ? (পৃ.৯) গর্জে ওঠে ইয়াসিন –"কেন, কলু কি মানুষ না? তারাও ত মুসলমান"।

---

১. আবু ইসহাক: মহাপতঙ্গ: প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর-১৯৬৩। প্রকাশক: মুশতাক কামিল। ঢাকা। পৃ. ১০-১১

Dhaka University Institutional Repository

রমজান ও ইয়াসিনের বাদানুবাদ শুরু হয়। রমজান বলে, "আরে, মুসলমান অইলেও ওরা ছোড জাত"। ইয়াসিনের স্পষ্ট উত্তর –"ছোড জাত! মুসলমানের মধ্যে আবার ছোড বড় কি? কলুরা নৌকার মাঝির তনে কোন দিক দিয়া খাডো"? (পৃ. ঐ)

রমজান বুঝাত ব্যর্থ হয় ইয়াসিনকে। উঁচু নিচু বংশের দোহাই দিয়ে ও খাঁ সাহেব বুঝাতে থাকে। ভাল বংশের খুব সুরত মেয়ে এ কথা বলে পরিকে টাকা দেওয়ার আশ্বাস দেয় খাঁ সাহেব। ইয়াসিনের মন কোন কিছুতেই সায় দেয় না। ..... "মাপ করবেন হুজুর, তা অয়না"। (পৃ. ১০) রেগে গর্জন করে খাঁ সাহেব বলে, "আমার কথার ওপরে কথা, অ্যাঁ! এতবড় সাহস! আচ্ছাবেশ, কাল থেকে তুমি আমার গয়নায় পা দিওনা"। (পৃ. ঐ) হুজুর হুজুর করে ইয়াসিন হাতজোড় করে। তাতে কোন লাভ হয়না। ইয়াসিনকে খেদিয়ে দিয়ে থেমে থাকেনি খাঁ সাহেব। কাজ হারিয়ে ইয়াছিন 'একমাল্লাই নৌকা কিনে ভাড়া বাইতে শুরু করেছিল'। কদমতলীর ঘাটে নৌকা ভিড়ায়ে একদিন রাতে ঘুমিয়েছিল ইয়াছিন। ঘুমের মধ্যে পানির ছোয়ায় জেগে ওঠে দেখে নদীতে নৌকা ডুবে যাচ্ছে। নৌকা মাঝ নদীতে। নৌকার দু'দিকের ঝাপ বন্ধ করা। সে তো ঝাপ বন্ধ করে ঘুমায়নি। আর নৌকার তলা ছিদ্র না করলে তো নৌকা এভাবে ডুবে যাবার কথা নয়। ইয়াসিন সব বুঝতে পেরে কৌশল করে ক'দিনের জন্য গা ঢাকা দিয়েছিল। আতাউল্লাহ খাঁ মনে করেছিল তাদের ষড়যন্ত্র সফল। নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ের দিনও ধার্য্য করেছিল। কিন্তু সে গুড়েবালি। বিয়ের আগের দিন জানতে পারে –'পরিবানু পালিয়েছে কি জন্য ও কার সাথে ইত্যাদি বুঝতে অসুবিধা হয় না খাঁ সাহেবের'।

তারপর পাঁচ পাঁচটি শীত বসন্ত কেটে গেছে। অনেক জল গড়িয়েছে কদমতলী, নয়া কাঠির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে। পরিবানুর পাকা শশার মত রঙের চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। অনাহারে অর্ধাহারে সূতিকা রোগের প্রকোপে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। রূপ-লাবণ্য কিছুই অবিশিষ্ট নেই। 'দাঙ্গা, পাটকলে রায়ট লাগছে'। কপর্দহীন অবস্থায় ইয়াসিন পরিবানু ও তাদের একমাত্র শিশু কন্যাকে নিয়ে কোনোরকমে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে তারা 'রায়ট' থেকে। পালিয়ে আসলেও জীবনের হিসাব-নিকাশ বড়ো কঠিন। জীবিকাই সেখানে বড় সত্য, সেখানে কে দেখাবে দয়া-মায়া-মমতা-করুণা? লঞ্চের খবর নিয়ে ইয়াসিন ফিরে এসে পরিবানুকে জানায়। চেনা-জানা কাউকে পাওয়া গেল না। পরিবানুর প্রশ্ন –'কিন্তু ভাড়া'? ইয়াসিন পুরুষালি ভঙ্গিতে উত্তর দেয়–"তা একটা অইবই। ওডো, আর দেরী করণ যায় না"। শিশু কন্যাসহ তারা লঞ্চে ওঠে বসে।

জীবন ধারণের জন্য সমাজে ধন সম্পদই প্রধান নিয়ামক শক্তি। টাকা ছাড়া লঞ্চে তো আর পারাপার হওয়া যায় না। লঞ্চ চলে মালিকের লাভের জন্য। লঞ্চের ভাড়াটাই সেখানে মুখ্য। লঞ্চের কন্ট্রাক্টর ভাড়া আদায় করতে আসে। ইয়াসিন করজোড়ে অনুনয় বিনয় করে বলে- "হুজুর আমাগ বড় বিপদ। পাটকলে 'রায়ট' লাগছে। আমরা জান লইয়া পলাইয়া আইছি।

Dhaka University Institutional Repository

ট্যাকা পয়সা কিছু আনতে পারি নাই"।করুণ অসহায়তা ও দারিদ্র্যের চিত্র ধরা পড়েছে ইয়াসিনের কথায়। লঞ্চের ভাড়া আদায়কারী কন্ট্রাক্টর যখন কিছুতেই বুঝতে চায়না যে, তাদের কাছে কোন টাকা নেই, তখন করুণ সুরে ইয়াসিনের মিনতি–"কইলাম ত হুজুর পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই"। (পৃ.১২)

ইয়াসিন এ যাত্রায় রক্ষা পাবার ভরসা না পেয়ে লঞ্চ মালিকের দয়ার ভরসা করে। তার মনে হয় লঞ্চ মালিক কথা রাখবে, বিশ্বাস করবে। দয়া-মায়া দেখাবে। লঞ্চের শেষ স্টেশন কদমতলীতে মালিক থাকনে। ইয়াসিন সেই হিংস্র শ্বাপদের গুহায় ঢুকেছে। আতাউল্লাহ খাঁ'রও চিনতে ভুল হয় না ইয়াসিনকে। ফুল শুকিয়ে গেলে যেমন অবস্থা হয় পরিবানুরও তেমন অবস্থা। এমনটিই তো চায় আতাউল্লাহ খাঁ। চোখেমুখে 'ক্রূর হাসি'। মনে মনে বারুদের মতো জ্বলে ওঠে। "এই সেই কলুর মেয়ে যার রূপ যৌবনের অহঙ্কার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল"।

আর ইয়াসিন! ইয়াসিন তো তার অধীনে সামান্য মাঝি মাত্র। সে মনিব, কিন্তু ইয়াসিন তাকে পাত্তা দেয়নি। এ যে মনিবের বড়ো পরাজয়। এ পরাজয়ের গ্লানিতো ভুলে যাবার নয়। দু'জনকেই হাতের নাগালে পেয়েছে আজ। এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায় সে। কেরানীকে শরীর তল্লাশী করতে হুকুম দেয় খাঁ। ইয়াসিনের কাছে কিছুই পেল না কেরানী। মেয়ের গলার রূপার 'চেন' ছড়া খুলে দেয় ইয়াসিন। তাতে রাজী নয় আতাউল্লা খাঁ। সে চরম আক্রোশে কেরানীকে আদেশ দেয় "ঝাড়া লাও মাগীটারে"। পরিবানু ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। ইয়াসিনের রক্তে আগুন ধরে যায়। চেঁচিয়ে বলে- "এই মিয়া, তুমি মানুষ না? মাইয়া লোকের গায়ে আত দিবা তুমি"? (পৃ. ১৫) কেরানীর মানবিক সত্তায় আঘাত লাগে। সে ব্যর্থ হলে আতাউল্লাহ খাঁ গর্জে ওঠে। কেরানীকে লক্ষ্য করে বলে- "খবরদার, লঞ্চে যেন দেখি না তোকে আর। আমার হুকুম অমান্য"! কেরানী জামাল বেরিয়ে যায়। হিংস্র জানোয়ারের মতো খাঁ পরিবানুর দিকে এগিয়ে আসে। পরিবানু স্বামীর গা-হাত জড়িয়ে ধরে। ইয়াসিন প্রবল শক্তি নিয়ে বলে "খবরদার, যদি মাইনষের বাচ্চা অও, তবে মাইয়া লোকের গায়ে আত দিও না"। আতাউল্লাহ খাঁর কণ্ঠে তখনও ভাড়া আদায়ের নেশা– "কেন? ভাড়া দেবার সময় মনে থাকে না"? খাঁ পরিবানুর আচল ধরলে ইয়াসিন "ঝাপিয়ে পড়ে আতাউল্লাহ খাঁর ওপর"। (পৃ. ১৬)

মাটি কাটা, বৈঠা টানা পেশীবহুল ইয়াসিনের সাথে আতাউল্লাহ খাঁর মেদবহুল শরীর কুলাতে পারেনা। গল্পকারের বর্ণনা –"ইয়াসিন তার বুকের ওপর চেপে বসে। দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করে ভীম তার রক্ত পান করবে বুঝি"। (পৃ.ঐ) কিন্তু না। ইয়াসিনরা জিতে গিয়েও হেরে যায়। শ্রেণীগত অবস্থানকে তারা ভাঙতে পারে না। বৈষম্যকে তারা দূর করতে পারে না। তার প্রমাণ গল্পের শেষে পাওয়া যায়। গল্পকার সে দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন এভাবে "জামাল ফিরে এসে বাধা না দিলে ইয়াসিন হয়ত তাকে খুনই করে ফেলতো। তাকে টেনে তুলে জামাল বলে- খুব হয়েছে আর নয়। এবার পালাও"। অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াসিনদের জন্য এটাই যথেষ্ট। তাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কোথায়– বৈষম্যের পাহাড় সম সমাজ বাস্তবতায়!

প্রয়োজন বোধে দুর্বলের ইচ্ছে শক্তির কাছে প্রবল যে শোচনীয়ভাবে পরাভূত হয়, ইয়াসিন একটি অসুরের কবল থেকে তার পত্নীকে রক্ষা করে তার প্রমাণ দেয়। প্রতিবাদ ও শক্তির বিস্ফোরণ ও ঘটেছে বলা যায়।

'খুঁতি' গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে এভাবে- আফজাল থানার বড়ো দারোগা। 'মাইনের গনা কটা টাকায়' তাকে চলতে হয়। সে আর পাঁচজন পুলিশের মতো নয়। ন্যায়নীতি আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়নি। বাবা আকবর সাহেব ছেলের এমন আদর্শে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। অন্যান্য ছেলেদের সাথে তুলনা করে পুত্রবধুকে জানায়–আজমল নামের ছেলেটা ইনকামট্যাক্সের অফিসার। ঢাকায় দো'তলা বাড়ী। "ওভারসিয়ার দেওর আকমল চাটগাঁয়ে জায়গা কিনছে। আসছে শীতে বাড়ি তৈরি শুরু হবে। মাস কয়েক আগে সে বাড়ী এসেছিল। তখন জমি কিনেছে দুইকানি"। (পৃ.২১)

বাবা, দারোগা ছেলের বাসায় এসেছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। নাতি নাতনি জুলু ও মমী। তাদের মোটা কাপড় আকবর সাহেবের পছন্দ নয়। পুত্রবধু হালিমা শ্বশুরের কথার প্রতিবাদ করলে বংশ গৌরবের জৌলুস সদম্ভে জাহির করে আকবর সাহেব। "মোটা নয়ত কি? বালিশের খোলের কাপড় এগুলো। এই গরমে কাপড় চাই রশুনের চোকলার মতো পাতলা। জিজ্ঞেস করে দেখ জুলুর বাপকে। ওদের ছেলেবেলায় কেমন জামাকাপড় দিয়েছি। সিল্কের পাজামা পাঞ্জাবী পরে, জরীর টুপি মাথায় দিয়ে ওরা যখন বেরুতো তখন লোকে চেয়ে থাকত। বলাবলি করত নিজেদের মধ্যে, ছেলে বটে কাজী সাহেবের। কী আর বলবো মা, সাব রেজিষ্ট্রারের ছেলেরা পর্যন্ত ওদের কাছে হট খেয়ে যেত সাজ-পোশাকে। আর জুলু–মমি কি রদ্দি কাপড় পড়েছে। ওদের দেখে কেউ চিনতে পারবে, বলো? কে বুঝতে পারবে ওরা থনার বড় দারোগার ছেলেমেয়ে"? (পৃ.২০-২১) সে আশায় গুড়েবালি আকবর সাহেবের। ভাবলে শিউরে ওঠে বাবা আকবর! ভেবে কুল কিনারা পায় না শেষে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে ছোট দারোগার বাসায় মাছ নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কথা বার্তার মধ্যে। "তুমি ভাবছ আমি কেমন করে জানলাম? শোন বলছি সন্ধ্যার সময় যখন ওদের নিয়ে ফিরছি তখন জুলু বলে 'দেখো দাদু, কত বড় একটা মাছ'। চেয়ে দেখি একটা চিতল মাছ নিয়ে এ বাসার দিকে আসছে তিনটে লোক। আমি ভেবেছিলাম-বুঝি তোমাদের বাসায়ই আসছে। ও মা! দেখি তোমাদের বাসা পেছনে ফেলে ঐ কোণের বাসাটায় টুক করে ঢুকে পড়ল"। পুত্র বধু হালিমা এসব ফিরিস্তি শুনে বলেছিল–"আপনার ছেলে এসব পছন্দ করেন না"। (পৃ.২২) আজমল আকমলের জমিজমা ও বাড়ী প্রসঙ্গে বলতে বলতে আসল কথাটা বলল আকবর সাহেব–"আমি আশা করেছিলাম, তুমি মাসে মাসে কিছু বেশি করে পাঠাবে। তোমার জন্যে ভাল জমি কেনব"। (পৃ.২৭) কিন্তু ছেলেতো বাবার মতো লোভী নয়। সৎ উপায়ে জীবন যাপন করতে চায়। আকবর একটা ফাঁদ

Dhaka University Institutional Repository

পেতে রেখে এসেছে উত্তরের বাড়ীর কিতাবালির সাথে। আকালের বছর দশ মন চাল নিয়েছিল কিতাবালী। ষাট টাকা দরে চাল নিয়ে খেয়েছিল। এখন তো বিশ টাকা দরের চাল নেয়া যেতে পারে না। "এখন আমাকে দিতে হলে তিরিশ মন চাল দিতে হবে, নয়ত ছ'শো টাকা"। (পৃ.২৮) পিতার অবিবেচনা সুলভ অর্থ-লিপ্সায় পুত্রের প্রতিবাদ– "এ রকম দাবী করা কোন মতেই উচিৎ হবে না, আব্বা"।(পৃ.ঐ) শোষণের মুখোশ উন্মোচন করে পুত্রের কণ্ঠ শোষিত মানুষের পক্ষেই সোচ্চার হয়। "হ্যাঁ, উচিৎ ত হবেই না। আমাদের গোলায় ছিল তাই সে অভাবের সময় নিয়ে খেয়ে বেঁচেছে। আর দিশা ফিশা না পেয়েই কাগজে দস্তখত করেছে। এখন তার উপর এমন".....। (পৃ.২৯) আসল কথাটা বলেই ফেলল-আকবর সাহেব। কিতাবালী পঞ্চাশ টাকা দর দিতে চেয়েছে। কিন্তু দেব দিচ্ছি করায় জমি বেচতে বললাম। সে রাজী হয়েছে। "আরো পাঁচশো টাকা দিলে সে তার এক কানী ধানি জমি সাফ কবালা করে দেবে। সব ব্যবস্থা পাকা করে তাই তোমার কাছে টাকার জন্যে এসেছি। জমিটা তোমর নামেই রেজেষ্ট্রি হবে"। (পৃ.৩০) এ প্রস্তাবে পুত্র আফজলের দৃঢ় উক্তি– "টাকা ত নেই, আব্বা! আর থাকলেও এ কাজের জন্যে একটা পয়সাও দিতাম না"।(পৃ.ঐ) একই রক্তের হলেও পিতা পুত্রের মাঝে বিরাট ব্যবধান! এ ব্যবধান নীতি নৈতিকতার। আদর্শ ও অনাদর্শের মধ্যে।

ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে আকবর সাহেব চলে যায়। পরক্ষণে আবিস্কৃত হয় সেই 'খুতি'টা। জুলুর কাছে সেটা সাপের বাচ্চা রাখার খুতি। যেটা আকবর সাহেব মনের ভুলে ফেলে রেখে গেছে। পুত্রবধু ভেবেছিল শশুরের খুতিটাতে বোধ হয় টাকা পয়সা আছে। অবশেষে টিপে–খালি খুতি দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। স্বামীকে প্রশ্ন করে পুত্রবধু হালিমা। পুত্র আফজল ঠিকই বুঝতে পারে। এ জন্য কোন উত্তর দেয় না। হালিমারও বুঝতে অসুবিধা হয় না-কি জন্য শশুর খালি খুতি নিয়ে এসেছিল। গল্পের শেষেও পিতা আকবরের সম্পদশালী হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। "আফজলের মনে পড়ে তখনকার কথা যখন সে বড় ভাইয়ের বাসায় থেকে কলেজে পড়ত। এই খুতিটা পকেটে নিয়ে আব্বা সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন আর কোমরে বেঁধে বাড়ী ফিরতেন"।(পৃ.৩১) খুতিটা ভরে টাকা নিয়ে জমি জায়গা সম্পত্তি এভাবেই করেছে আকবর সাহেব।

এ গল্পে প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উল্লখ না থাকলেও নাতি-পুতনিদের কম দামের পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি দাদা আকবরের তাচ্ছিল্যভাব এবং আজমল আকমলের ছোট বেলার দামী পোশাকের উল্লেখ করা- শ্রেণী চেতনাকে ইঙ্গিত দেয়।

'জোঁক' গল্পে ক্ষেত মজুর শ্রেণীর প্রতিনিধি ওসমান ও শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি মহাজন। এ দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব নিয়ে কাহিনী রচিত হয়েছে। গল্পটি আবু ইসহাকের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসের মতো গল্পটি বহুল পঠিত ও সমালোচিত। কোন কোন

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচক জোঁক গল্পটিকে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীদ্বন্দ্বমূলক গল্প বলে চিহ্নিত করেছেন। শ্রেণীদ্বন্দ্বের এমন বাস্তব ও নিখুঁত চিত্র বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় খুবই অল্প।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসমান। অভাবের তাড়নায় পেটের ক্ষুধা মেটায় মিষ্টি আলু 'পেটে জামিন' দিয়ে। পঁচা পানির কামড়ে গা চুলকানো থেকে রক্ষার জন্য রয়নার তেল মালিশ করে দেয় মাজুবিবি। 'ঘাস-লতা-পাতা-কচু-ঘেচু' পঁচে বিলের পানিতে চুলকানির সৃষ্টি হয়। ওই পানি শরীরে লাগলে কুটকুট করে। উপায়তো নেই। কাজতো করতেই হবে। অগত্যা পা থেকে গলা পর্যন্ত তেলমালিশ করে পাট কাটার কাজে নেমে যায়– শ্রাবণ শেষের ভরা মাঠে-ওসমান। গল্পকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আবহের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। "শ্রাবণ মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। থাম খেয়ালী বর্ষণ বৃষ্টির। আইশ ধান উঠে যাওয়ায় আমন ধানের গাছগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগা চিক চিক করছে ভোরের রোদে"। (পৃ.৬৪)

পাটগাছগুলো এবার বেশ মোটা ও লম্বা হয়েছে। প্রায় দুই মানুষ সমান লম্বা। ওসমানের চোখে মুখে তৃপ্তি। তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। রোদ বৃষ্টি মাথায় করে ক্ষেত চষা, ঢেলাভাঙ্গা, ঘাস বাছোট করা, চিকন গাছগুলো তুলে ফেলে দেয়া, আরো কতো খাটুনি! এতো খাটুনির ফলতো ওসমানের একার নয়। জমির মালিক তো সে নয়। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী। 'ঢাকায় বড় চাকুরী করেন'। গোমস্তা রেখে 'কড়ায় গুন্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়'। মরশুম এলে ছেলে ইউসুফ ঢাকা থেকে গায়ে এসে ধান পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে যায়। গত বছর থেকে আলাদা ফন্দি করে ওয়াজেদ চৌধুরী– "গত বছর বাইনের সময়ও একবার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগ চাষীদের। এর আগে জমির বিলি ব্যবস্থা মুখে মুখেই চলত"। (পৃ.ঐ) পাটগাছের হৃষ্টপুষ্ট চেহারায় ওসমানের মনে অনেক আশার আলো সঞ্চার হয়েছিল। মনে মনে তার আফসোস –"আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত"। (পৃ.ঐ)

কবিরাজের পাচনের মত দেখতে পাটক্ষেতের পানি। তাও আবার বুক সমান হবে। ডুব দিয়ে পাট কাটা ছাড়া উপায় নেই। স্কুল পড়ুয়া ছেলে তোতাকে ছুটি নিয়ে স্কুল থেকে আগে ফিরতে বলে ওসমান। মাষ্টার ছুটি দিতে চায়না বললে ওসমানের ক্ষোভ –"কামের সময় ছুটি দিতে পারব না, কেমুন কথা।(পৃ.৩৫) ছুটি না দিলে জিগাইস, আমার পাটগুলো জাগ দিয়া দিতে পারবনি তোগ মাষ্টার"। ওসমানের কর্মযজ্ঞ চলতে থাকে ডুবের পর ডুব দিয়ে পাট কাটতে কাটতে। প্রথম দিকে দমটা বেশি থাকে বলে- তিনচার ডুবে একহাতা পাট হয়ে যায়। একের পর এক দশ বার ডুব দেয়ার পর জিরোবার দরকার হয়। দম হালকা হয়ে আসলে শেষের দিকে এক ডুব পর পর জিরানো লাগে। পেটের জামিন তো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তামাক

Dhaka University Institutional Repository

টেনে শরীরটা গরম করে নিতে হয় মাঝে মাঝে। তাও আর কত সময় স্থায়ী হয়? নাড়িভুড়ি মোচড় দিতে শুরু করে খাবারের অভাবে। মাথা ঝিম ঝিম করে শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়।

ওসমান ভাবে বাড়ী ফিরে যাবে। কিন্তু আশিহাতা পাটকাটার তো ইচ্ছে ছিল' অর্ধেকও হয়নি এখনও। তাছাড়া এখনও তো ঘরে রান্না হয়নি। হঠাৎ নজরে পড়ে শালুক ফুল। আশ্বস্ত হয় ওসমান। পাশেই খাদ্যের সংস্থান থাকতে তা আবিষ্কার না করতে পারায় নিজের উপর বিরক্ত হয়। দশ বারোটা শালুক তুলে বিকটগন্ধ আমল না দিয়ে কাঁচা খেয়ে ফেলে ওসমান। আবার শুরু হয় পাটকাটা। 'হাতা বাঁধা'। এ কাজ তো তাকেই করতে হবে। জীবিকা যে বড়ই নিষ্ঠুর। সে কোনো অজুহাত মানতে চায় না। পঁচা পানিতে দীর্ঘক্ষণ থাকার পর 'শরীরে মালিশ করা তেল ধুয়ে যায়'। পচা পানির কামড় শুরু হয়। ওসমান ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। স্ববিরোধী আক্রোশে বলে –"আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি, আর এই শালার পাটগুলা মোট্টা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান, চিক্কণ চিক্কণ অইতে দোষ আছিল কি? হে অইলে এক পোচে দিতাম সাবাড় কইরা"।(পৃ.৬৭) চুলকানোর সাথে রাগও বেড়ে যায় ওসমানের। বৃষ্টি আর পঁচা পানির উদ্দেশ্যে গালি, শেষে-জমির মালিকের ওপর পড়ে সমস্ত ক্ষোভ। শ্রেণীগত অবস্থান না বুঝলেও তার কথায় সেটাই উন্মোচিত হয়। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরীর উদ্দেশ্যে ওসমান বলে–"ব্যাডা ঢাকার শহরে ফটেং বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিয়া আধাডা ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডারে একদিন পচা পানির কামড় খাওয়াইতে পারতাম"।(পৃ.ঐ)

ওসমানের ছেলে তোতা স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে আগে আসতে পারেনি। বরং মায়ের কথামত ভাতের ফ্যান আনতে গিয়ে বিলম্ব করেছে। এ জন্য বড্ড ক্ষোভ ওসমানের। লবণ মেশানো এক খোরা ফেন পেয়ে এক চুমুকে খেয়ে ওসমানের পেট ঠাণ্ডা হয়ে যায় অনেকটা। স্ত্রীকে ও মনে মনে ধন্যবাদ জানায়। কাজ আর কাজ। পাটগুলো সব নৌকায় তোলা হয়ে গেলে – ওসমান অতিকষ্টে নৌকায় উঠলে, তোতা বলে- "তোমার পায়ে কালা উইডা কী, বা জান? ..... উঁই যে! জোঁক না জানি কী"? ওসমান ঠিকই বুঝতে পারে ওটা জোঁক। "প্রায় বিগত খানেক লম্বা। করাতে জোঁক। রক্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে"। (পৃ.৬৮)

এত বড় জোঁক দেখে তোতা শিহরে ওঠে। তার কণ্ঠে বিস্ময় ভরা প্রশ্ন – "জোঁকটা কত বড়, বাপপুসরে"। ওসমানের উত্তরে অন্য রকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তোতা সে বড় জোঁকের কথা বুঝতে পারে না। তাইতো ওসমান ছেলেকে বলে– "দুও বোকা। এইডা আর এমুনকী জোঁক। এরচে' বড় জোঁকও আছে"।(পৃ.৬৯) সে জোঁক বড় রক্ত চোষা! সে জোঁক এ জোঁকের মতো নয়। সে মানুষরূপী জোঁক।

তেভাগার নিয়মানুযায়ী ওসমানের ভাগে পড়ে ফসলের দু'ভাগ, বাকী একভাগ জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরীর। গোমস্তার কথা শুনে ওসমান অবাক হয়ে যায়। নতুন আইনে নাকি জমির মালিক দু'ভাগ পাবে। গোমস্তার মুখের কথায় ওসমান বিশ্বাস করতে পারে না। বৈঠকখানায় ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফের কাছে জানতে চায়। ইউসুফ টাকা নিয়ে টিপসই

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার কৌশল স্মরণ করিয়ে দেয়। ওসমানের সাফ উত্তর –"আমি টাকা নেই নাই। এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য করব না"।(পৃ.৭১) পিতা ওয়াজেদ চৌধুরীর মতো ছেলে ইউসুফেরও রক্তচোষা জোঁকের মত কথা- "যা–যা ব্যাটা, বেরো। বেশি তেড়ি বেড়ি করলে এক কড়া জমি দেব না কোন ব্যাটারে"। (পৃ.ঐ) উপর তলার মানুষের মতো কথা। তেভাগা, দু'ভাগা তো তাদের মর্জির উপর নির্ভর করবে। ওসমানের মতো দিন মজুরদের তাতে প্রশ্ন করলে চলেনা। শ্রেণীগত অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে তাদের নীল নকশা পূর্ব থেকেই নির্দ্ধারণ করা থাকে।

ইউসুফের মুখে ক্রূর হাসি। – "তেভাগা! তেভাগা আইন পাশ হওয়ার আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রাখছি। আইন! আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে! আমরা সুচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই। হোকনা আইন। কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁ হ্ হুঁ"।(পৃ.৭১) জানে বলেই তো শ্রেণী বৈষম্যকে বহাল রাখতে চায় তারা। নিজেদের শ্রেণীতে স্থান দিতে চায় না ওসমানদের মতো শ্রমিক মজুর শ্রেণীর লোকদের, যারা উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে।

গল্পের শেষে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ বিদ্রোহে পরিণত হতে দেখা যায়। করিম গাজী, নবু খাঁসহ আরো দশবারোজন ভাগচাষী সংগঠিত হয়। ওসমানকে দিয়ে জমি বর্গা দেয়ার ছলে টিপসই করিয়ে নিয়েছে দলিলে, সে কৌশল সকলের জানা হয়ে যায়। করিম গাজীর কণ্ঠে-"হ বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে"। ওসমানের আহাজারি-"আমারে মিয়া মাইর‍্যা ফালাইছে এক্কেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচশ"! করিম গাজী ওসমানকে সাহস দিয়ে বলে–"আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু"? ওসমান ছেলেকে বাড়ি যাবার নির্দেশ দিয়ে মনে সাহস সঞ্চার করে প্রতিবাদের সুরে বলে "হ, চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে"।(পৃ.৭৩)

জোঁক যেমন নীরবে মানুষের রক্ত শোষন করে, এরাও তেমনি হতভাগা চাষীদের মেহনতের ফসল চিটে ফোঁটা তাদের দিয়ে বাকীটা দ্বিধাহীণ ভাবে। নিজেদের সম্পদ হিসেবে গন্য করে। আত্মসাৎ করে।" তিনি আরো বলেন, জোঁক গল্পে লেখক দেখিয়েছেন মালিক কৌশলে নিরক্ষর চাষীদের টিপসই নিয়ে তাদেরকে ধার গ্রহণের অজুহাতে দেখিয়ে নিজে ফসলের তিনভাগ নিয়ে চাষীকে এক ভাগ দেয়। চাষীরা তার প্রতিকার করার জন্য এক জোট হয়। জোঁকের মতো রক্ত শোষণকারী মাহজনের কৌশলগত শোষণের এ চিত্র তুলে ধুরেছেন আবু ইসহাকে তার এ গল্পে। লেখকের সাম্য বাদী চিন্তা চেতনার ও সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপস্থাপনায়। গল্পে শোষক ও শোষিতের মধ্যে চরম দন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে।

'উত্তরণ' গল্পে দুধের যোগানদার রুস্তমের আত্মদ্বন্দ্ব অবশেষে শ্রেণীদ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছে। রুস্তমের গাই গরু দুটো চুরি হলে সেও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে হিন্দুস্থানের গরু চুরি

Dhaka University Institutional Repository

করতে যায়। সেখানে ব্যর্থ হয়ে দুধে পানি মিশিয়ে যোগান দেয়া শুরু করে। গল্পে হিন্দু মুসলমানের শ্রেণীগত বৈপরীত্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

'দর্শনার কাছাকাছি জয়নগর গ্রাম'। বিভক্ত বাংলার সীমান্ত। জমি-জমা কিছুই না থাকলেও দুটো ভালো দুধেল গাই ছিলো রুস্তমের। গাইয়ের দুধ বেচেই সংসার চলত। এখন সে দিন নেই। 'গাই দুটোকে সরকারী রাস্তার পাশে গোচর দিয়ে সে দুধ যোগান দিতে গিয়েছিল দর্শনায়'। ছেলেমেয়ে ছিলনা রুস্তমের। এ জন্য বোধ হয় সব আদর যত্নের ভাগ পেত গাই দুটো। আদর করে গাই দুটোর নাম দিয়েছে "চাদক পালী আর লাল দুলালী"। দুধ যোগান দিয়ে ফিরে এসে আর পায়নি গাই-বাছুর। সীমান্তের কাজ কারবার এমনই। স্মাগলারদের দ্বারা এ কাজ হয়। এর আগেও রহিমুদ্দির গাই চুরি হয়ে যাচ্ছিল। সময় মতো দেখতে পেয়েছিল বলে স্মাগলাররা গাই ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। আশা ছাড়েনা রুস্তম। স্মাগলাররা নিয়ে গেলেও ওপারে হয়তো নিরাপদ জাগায় ছেড়ে দেবে। সীমান্তের সীমারেখা ধরে চার-পাঁচ মাইল হাটে সে। সুযোগ মতো ওপারেও চলে যায়। গাই গরু রুস্তমের গলার আওয়াজ চেনে। এ জন্য নিজস্ব ভঙ্গিতে নাম ধরে ডাকে রুস্তম। গাই শুনতে পেলে হাম্বিয়ে উঠে সাঁড়া দেবে ডাকে। কিন্তু সাঁড়া মেলে না। সংসারের অবস্থাও খুব শোচনীয়। "আশ্বিনের ভাটার টান লাগে"। যোগান দেয়া দুধের দাম বাকী ছিল যে ক'টা টাকা তা তুলে আনে। ক'দিনেই ফুরিয়ে যায় সে টাকা। এখন কি করবে রুস্তম? নিজের মধ্যে নিজেই প্রশ্নবানে বিদ্ধ হয়। একটা প্রতিবাদ যেন তীব্রবেগে বেরিয়ে পড়ে–"ওপারের ওরাই ধরে নিয়ে গেছে আমার গাই। আমি কেন চুপ করে বসে আছি? আমিও ওদেরটা ধরে নিয়ে আসব"। (পৃ.১১০)

নির্যাতিত শোষিত মানুষরাও প্রতিবাদ করতে পারে। হোকনা তা অসংগঠিত, অপরিকল্পিত। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলোচ্য গল্পের হতভাগ্য রুস্তম। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরের গরু ছলে বলে ধরে আনতেও দ্বিধাবোধ করেনা। তবে তার উদ্দেশ্য সফল হয় না। রাখালদের ঢিলের আঘাতে পিঠ থেতলে যায়। আশা ছাড়ে না রুস্তম। তাকে তো বাঁচতেই হবে। নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। আর সেটা হবে ভেজাল দুধের ব্যবসা।

গল্পের বর্ণনা এরূপ "তার রাগ এবার আরো বেড়ে যায়। প্রতিশোধের উপায় খুঁজে বেড়ায় তার ঘা খাওয়া মন"। (পৃ.১১১) পাঁচসেরি একটা কলসের মুখে গামছা বেধে দুধ কেনার নামে কলসীতে ঢেলে, তাল বাহানা করে দুধ ফেরত দিয়ে পানির সাথে মিশিয়ে দশ আনা ছ-আনা করে যোগান দেয়ার পরিকল্পনা করে সে। প্রথম দিকে স্ত্রী জমিলা প্রতিবাদ করত–এ কারবার করার জন্য। যুক্তি হিসেবে রুস্তম বলতো –"রেখে দে তোর জবাব। আমি ত কোন মুসলমান ভাইকে ঠকাই না। আমি দুধ রোজান দিই হিন্দুবাড়ী। হিন্দুস্থানের মালাউনরা আমার গাই নিয়ে গেছে না? ওদের জাত ভাইদের ওপর দিয়েই এর শোধ তুলব আমি"।(পৃ.১১১) পাক ভারতের মাটিতে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রচিত হয়েছিল-অপরিণামদর্শী রাজনীতিকদের হাতে- তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের জীবন হয়ে গিয়েছিল ছিন্ন ভিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে অনুভূতি প্রবণ ও বুদ্ধিমান। দয়া, মায়া-মমতা ও অনেক বেশী মানুষের। কলসীর মুখে গামছা বেধে ভেজাল দুধ বেচা-কেনার ধূর্তামি প্রকাশ হয়ে গেল। এবার সে গুড়ু দুধের সাথে পানি মিশিয়ে কিছু খাঁটি দুধ মিশিয়ে আবারও জীবন যুদ্ধ চালাতে শুরু করল। কিন্তু মনের একটা কোণে স্মৃতির নরম-কোমল বাৎসল্যের কাছে ধরা দিতে হয় কখনও মানুষকে। জীবিকার চেয়ে মানবতাই জয়ী হয় তখন। এমন এক মুহূর্তের মুখোমুখি হয় বোস বাবুর বাসায় দুধ দিতে গিয়ে। দোলনার ভিতর একটা শিশু কাঁদছে ওঁয়া ওঁয়া করে। রুস্তমের মনে পড়ে ক্ষুধা পেলে তার বাচ্ছাটা এমন করে কাঁদতো। সেটা স্মৃতির পাতায় ঠায় নিয়েছে। গল্পকারের ভাষায় "শিশুর কান্না। রুস্তম চমকে ওঠে। পুরানা স্মৃতির তারে-কে যেন টোকা দিয়ে যায়"।(পৃ.১১২)

রুস্তমের মন বাৎসল্য রসে ভরে যায়। সে শিশুটির কান্না সহ্য করতে পারে না। তার কলসীর দুধে তো ভেজাল। ভেজাল দুধ তো নিজের শিশুকে খাওয়াতো না। এ শিশুকে কোন অমানবিক স্পর্ধায় খাওয়াবে? তার ভিতর মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। নিজের শ্রেণীগত অবস্থার কথা ভুলে যায়। প্রধান ভাবনা হয়ে যায় শিশুটির খাঁটি দুধ খাওয়ানোর বিষয়। মানব শিশুটির কান্না রুস্তমের বুকের মধ্যে গেঁথে গেছে। রুস্তম দুধের সন্ধানে, খাঁটি দুধের যোগাড় করতে কলসী নিয়ে ছুটে যায় তে-মাথার রাস্তায়। ছল-চাতুরি করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য নয়। মানবিক মূল্যবোধের নিজস্ব তাগিদে।

'উত্তরণ' গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকাশ পেয়েছে রুস্তমের কথায়। স্ত্রী জমিলা যখন প্রতিবাদ করল ভেজাল দুধের ব্যবসা করার জন্য তখন রুস্তমের মনে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ কাজ করেছে। রুস্তম বলেছে, 'আমি ত কোন মুসলমান ভাইকে ঠকাই না'। আমি দুধ রোজান দিই হিন্দুবাড়ী। হিন্দুস্থানের মালাউনরা আমার গাইনিয়ে গেছেনা? ওদের জাতভাইদের উপর দিয়েই এর শোধ তুলব আমি। (পৃ.১১১)

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দীন আল আজাদ (জন্ম ১৯৩২)

আলাউদ্দীন আল আজাদের জন্ম হয় ১৯৩২ সালের ৬ মে নরসিংদীর রায়পুরে। তাঁর পিতার নাম গাজী আব্দুস ছোবহান। তিনি নারায়ণপুর শরাফতউল্লা উচ্চ বিদ্যায়ল থেকে প্রবেশিকা (১৯৪৭), ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৪৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক সম্মান (১৯৫৩), ও এম.এ (১৯৫৪), এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের জীবন ও কবিতা' নিয়ে গবেষণা করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে- ঢাকা কলেজ–(১৯৭৪); প্রিন্সিপাল, নিয়ারার ঢাকা (১৯৭৪-৭৫); এডুকেশ অ্যাটাস, বাংলাদেশ দূতাবাস, মস্কো (১৯৭৬-১৯৮১), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (১৯৮২-৮৯); প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৯-৯৬); চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যায় (১৯৯০-৯২); প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯০-৯৩); নজরুল প্রফেসর, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯০-৯৩)- প্রভৃতি জায়গায়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ সাহিত্যের সব শাখায় বিচরণ করেছেন। তাঁর সাহিত্য কর্মের বিবরণ নিম্নরূপ:

ছোটগল্প গ্রন্থ ঃ জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১); মৃগনাভি (১৯৫৩); অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮); উজান তরঙ্গে (১৯৬২); যখন সৈকত (১৯৬৭); আমার রক্ত; আমার স্বপ্ন (১৯৭৫); জীবন জমিন (১৯৮৮); নির্বাচিত গল্প (১৯৯৫); মনোনীত গল্প (১৯৮৭); শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৭)।

উপন্যাস ঃ তেইশনম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), কর্ণফুলী (১৯৬২); ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪); খসড়া কগজ (১৯৮৬); শ্যামল ছায়ার সংবাদ (১৯৮৬); জ্যোৎস্নার অজানা জীবন (১৯৮৬); যেখানে দাঁড়িয়ে আছি (১৯৮৬); পাটরাণী (১৯৮৬); স্বাগতম ভালোবাসা (১৯৯০); অপর যোদ্ধারা (১৯৯২); পুরানা পল্টন (১৯৯২); অন্তরীক্ষ বৃক্ষরাজি (১৯৯২); প্রিয় প্রিন্স (১৯৯৫); পুরুদ্রুজ (১৯৯৪); ক্যাম্পাস (১৯৯৪); অনূদিত অন্ধকার (১৯৯৫); স্বপ্ন শিলা (১৯৯৫); কালো জ্যোৎস্নায় চন্দ্রামল্লিকা (১৯৯৬); বিশৃঙ্খলা (১৯৯৭)।

কবিতা : মানচিত্র (১৯৬১) ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২); সূর্যজ্বালার সোপান (১৯৬৫); লেলিহান পাণ্ডুলিপি (১৯৭৫); নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৮৩): আমি যখন আসবো (১৯৮৪); এ্যাসেস এ্যান্ড স্পাক্‌র্স (১৯৮৪); সাজঘর (১৯৯০); চোখ (১৯৯৬); শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৭)।

নাটক ঃ ধন্যবাদ (১৯৫১); মরক্কোর জাদুঘর (১৯৫৯); মায়াবী প্রহর (১৯৬৩); নি:শব্দ যাত্রা (১৯৭২); নরকে লাল গোলাপ (১৯৭২); জোয়ার থেকে বলছি (১৯৭৪); মেঠোফুলের ঠিকানা (১৯৭৫); সংবাদ শেষাংশ (১৯৭৫); হিজলকাঠের নৌকা (১৯৭৬); হে সুন্দর জাহান্নাম (১৯৮৮)।

কাব্য নাট্য ঃ ইহুদির মেয়ে (১৯৬২); রঙিন মুদ্রারাক্ষস (১৯৯৪)।

প্রবন্ধ ঃ শিল্পীর সাধনা (১৯৫৮); সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু (১৯৭৪); নজরুল গবেষণাঃ ধারা ও পৃকতি (১৯৯২); মায়াকভস্কি ও নজরুল (১৯৮৫); রবীন্দ্র ক্লাসিক আবিষ্কার (১৯৮২); সাহিত্য সমালোচনা (১৯৮৯)

জীবনী ঃ অজিতকুমার গুহ (১৯৮৯); মুজফ্‌ফর আহমদ (১৯৯০); হামিদুর রহমান (১৯৯২); রশিদ চৌধুরী (১৯৯৪)।

শিশু সাহিত্য ঃ ঃ জলহস্তী (উপন্যাস, ১৯৮২); আন্দামান বন্দীর আৱকাহিনী (১৯৫৯); জাতকের গল্প (১৯৬০); আধুনিক গল্প (১৯৬১)

আলাউদ্দিন আল আজাদ যে সব পুরষ্কার পেয়েছেন তা হলো বাংলা একাডেমী পুরষ্কার (ছোটগল্প, ১৯৬৪), ইউনেস্কো পুরষ্কার (উপন্যাস, কর্ণফুলীর জন্য; ১৯৬৫); জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার (১৯৭৭); সাইট এ্যান্ড চলচ্চিত্র পুরষ্কার (১৯৭৭); আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহিত্য পুরষ্কার (১৯৮৩); আবুল মনসুর আহম সাহিত্য পুরষ্কার (১৯৮৪); লেখিকা সংঘ পুরষ্কার (১৯৮৫); রংধনু পুরষ্কার (১৯৮৫), অলক সাহিত্য পুরষ্কার (১৯৮৬); একুশে পদক (১৯৮৬); শেরে বাংলা সাহিত্য পুরষ্কার (১৯৮৭); নাট্য সভা ব্যক্তিত্ব পুরষ্কার (১৯৮৯); কথক একাডেমী পুরষ্কার (১৯৮৯); পূববী পদক (১৯৮৯); কালচক্র পদক (১৯৮৯); লোক ফোরাম স্বর্ণপদক (১৯৯০); দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জণ দাশ স্বর্ণপদক (১৯৯৪)।

আলাউদ্দিন আল আজাদের লিখিত গল্পের সংখ্যা একশত বিশটি। কেবল গবেষণার কালসীমায় রচিত ছোটগল্প গুলো আলোচনায় রাখা হয়েছে। সমাজের নিম্নশ্রেণীর জীবন জীবিকা তাঁর গল্পে

Dhaka University Institutional Repository
প্রতিফলিত হলেও শ্রেণীদ্বান্দ্বিক ঘটনা প্রবাহ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর যে সব গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ প্রকটভাবে ধরা পড়েছে, তা নিম্নরূপ:

'কাঠের নকশা, কয়লা কুড়ানো দল, শিষ ফোটার গান, মহামুহূ র্ত, ধোঁয়া, মোচড়, চেহারা, জবানবন্দী, মাঝি, চারগুন্ডা, ধানকন্যা, ছায়ামৃগ, সুন্দরী, সুন্দরী, সৃষ্টি,.... এ পর্যায়ে উক্ত গল্পগুলোতে প্রতিফলিত শ্রেণীদ্বন্দ্বের আলোচনা করা হলোঃ

'কাঠের নকশা' গল্পটা উত্তম পুরুষের জবানিতে ব্যক্ত হয়েছে। কথকের বাবা রাজমিস্ত্রীর সরদার। মা কাঠের নকশাকে কেন্দ্র করে রুচিবোধের কারণে বাবাকে পরের জন্যে সময় ব্যয় করাকে বৃথা বলে স্মরণ করে দিত। বাবার অবসর নেই, কাঠের নকসা নিয়ে গবেষণা করছে দিন রাত- কিভাবে দালানকোঠা আরো ভালো করা যায়। ঘটানাচক্রে বাবা জেলে গেলে-সংসারে অভাব দেখা দিল। কাঠের নকশাগুলো মা বুকের মধ্যে আগলে ধরে রাখতে চায়। বাবার অধীনে যোগানদানের কাজ করতো রহমান ওস্তাগার। অল্পদিনের মধ্যে জোগানদারের কাজ ছেড়ে মিস্ত্রীর কাজ করতে লাগল সে। বাবার জেলে যাবার সুযোগে রহমান ওস্তাগার হাত করে নিতে চায় কাঠের নকশাগুলো। মা জানতে পারলে কিছুতেই দেবে না কাঠের নকশা। গল্পকথক মাকে না জানিয়ে সংসারের অভাবের তাড়নায় কাঠের নকশাগুলো রহমান ওস্তাগারের কাছে বিক্রী করতে গেলে মায়ের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং থমকে গিয়ে কাঁদতে থাকে।

এ গল্পে একদিকে আছে কথকের বাবার কর্মের প্রতি নিষ্ঠা অন্যদিকে রহমান ওস্তাগারের মত ফাঁকিবাজ মিস্ত্রীর অল্প সময়ে ধনী হবার বাসনা। গল্প থেকে উদ্ধৃত দেয়া যাক। "দু'মাসের মধ্যেই যোগানদারের বেলচা ছেড়ে মিস্ত্রির কর্নি ধরল রহমান কাকা। একদিন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে উঠল, 'চেষ্টা করলে গিরগিটি, কুমির হতে পারে, কি বলো? .... জীবনে উন্নতি করতে চাইলে অপরের প্রতি এত দরদ থাকলে চলে না। দেখেছি টাকা না থাকলে ফেরেস্তার মত লোককেও কেউ দিয়ে পুছে না । .....আর পকেটটা একটু ভারি হলে সবাই এসে এসো এসো করে। কাজেই দুনিয়াতে নিজের স্বার্থ দেখাই বুদ্ধিমানে কাজ। নিজে বাঁচলে বাপের নাম।" [১]

রহমান ওস্তাগারের অল্পদিনের ধনী হওয়ার পিছনে রয়েছে শোষণ। সে সোজা পথে, সৎ উপায়ে পরিশ্রম করে ধনী হয়নি। উপরওয়ালাদের সাথে হাত মিলিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে বানচাল করার হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে। তাছাড়া 'চেষ্টা করলে গিরগিটিও কুমির হতে পারে' রহমানের এ কথার মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১। আলাউদ্দিন আল আজাদ; শ্রেষ্ঠগল্প; গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, (ঢাকা-২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পে শ্রেণীসংগ্রামের চিত্র প্রত্যক্ষ ভাবে ফুটে উঠেছে-রাজমিস্ত্রীদের সংগঠিত হয়ে মজুরি বাড়ানোর দাবীর মধ্য দিয়ে। –"ইতোমধ্য রাজমিস্ত্রীর আর একদল এসে হাজির। এখনো থামেনি মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন। সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে রহমান ওস্তাগার। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার যোগসজাসের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। ওরা চোখ রাঙাল, ঠাটানি দিল। ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে দেরি হয়ে গেল।" (পৃ.৬)

শ্রেণীসংগ্রামের চিত্রের পাশাপাশি গল্পে আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। সেটা হলো রাজমিস্ত্রীর তৈরি 'নকশা'র মূল্য অনেক বেশী রাজমিস্ত্রির স্ত্রীর কাছে। তাঁর স্বামী যদিও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের পক্ষে আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্যে জেলে গিয়েছে তার পরেও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার ঘাটতি নেই। এমনকি ঘরে চাল নেই, ওষুধ নেই, তার পরেও দৃঢ় মনোবল বজায় রয়েছে। "কিছু না হোক, কোন কাজেই না আসুক, তবু এগুলো আমারই কাছে থাকবে. আমারই কাছে থাকবে।" (পৃ.১০)

আরেকটি বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক; তাহলো শ্রমিকদের মজুরি রাড়ানোর দাবীকে সমর্থন করার কারণে রাজমিস্ত্রির জেলে যাওয়া। রাজমিস্ত্রী নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেনি-রহমান ওস্তাগরের মত। প্রকারান্তে সৎ, পরিশ্রমী রাজমিস্ত্রী শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীকে সমর্থন করে শ্রেণী সংগ্রামের নজির স্থাপন করল। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান বলেন- "তার স্বামী যেমন প্রবলের বিরুদ্ধে নিষফল সংগ্রাম করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে, তেমনি সংসারের অভাব মিটাতে গিয়ে সে ওইসব নকশা হাতছাড়া করবে না। ..... যেখানে রাজমিস্ত্রির এই শিল্পকর্মের ভাষা আর তার সংগ্রামের ভাষা মিলেমিশের যায় সম্পূর্ণভাবে।"[২]

'কয়লা কুড়ানো দল' গল্পে কাহিনী শুরু হয়েছে-গেদু, মনু, লালু, সোনাভান, রুপভানদের রেলওয়ে ষ্টেশনের পাশে কয়লা কুড়ানোকে কেন্দ্র করে। তারা ভোর হতে কয়লা কুড়ানোর কাজে লেগে যায়। ষ্টেশন পাহারায় নিয়োজিত 'সুবেদালী কনেষ্টবল' কয়লা কেড়ে নেয় ওদের কাছ থেকে। ওরা একত্র হয়ে সুবেদালী কনেষ্ঠবলের গায়ে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করে দেয়। সুবেদালী অনুতপ্ত হয়ে মনু, লালু সোনাভানদের সাথে এক হয়ে যায়। এদিকে ষ্টেশন মাষ্টারের চোরাইমালের বুকিংয়ে ঘুষ দেয়ার বিষয়টা সুবেদালী জানে। মাষ্টার সুবেদালীকে দিয়ে বাড়ীর বাজার করা থেকে শুরু করে অনেক কাজ করিয়ে নেয়। সুবিদালী মাষ্টারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলো। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। যে কয়লা পাহারা দিয়ে রাখবে সুবেদালী কনেষ্টবল, সেই কয়লা ষ্টেশন মাষ্টারের চোখ ফাঁকি দিয়ে মনু-লালুদের নিয়ে যেতে সাহায্য করতে থাকে।

২। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। *শ্রেণী গল্পের ভূমিকা*। (ঢাকা-২০০০) পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পে আরেকটি প্রতিবাদী চরিত্র সোনাভান। কয়লার টুকরির ন্যায্য দেয়না হোটেল মালিকরা। চশমখোররা বিনে পয়সায় কিনতে পারলেই যেন খুশী হয়– ভাবটা এমন। সোনাভানের কাছে এসব জারিজুরি খাটে না। সে তার মূল্য আদায় করে ছাড়ে। কিভাবে হোটেলওয়ালাদের কণ্ঠরোধ করতে হয় সে জানে। বাড়ীতে কানা বাপটার সেই তো একমাত্র ভরসা। এভাবে উদয়াস্ত পরিশ্রমে জীবন নৌকা চলছিল তরঙ্গতাড়িত দ্বন্দ্ব হতাশায়। এদের মাঝে আছে কালু চোরের ভাই লালু।

এক সাথে কাজ করলেও সঙ্গীরা তাকে কোনদিন বিশ্বাস করেনা। লালু বরাবরই গোলমেলে স্বভাবের। সকলের পরে এসে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বেফাঁস কথা বলে, চড়চাপড় মারে। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। তবে সবার কাছে লালু দু'চোখের বীষ। একদিন লালু এসে ধমক দিয়ে বলে–'এই তোরা সব কয়লা কুড়িয়ে ফেললি যে?' কারো মুখে কথার উত্তর না পেয়ে লালু চেঁচিয়ে ওঠে-"কি কারো মুখে রা নেই কেন?" সোনাভান জবাব দেয়–'রা করে কি হবে?' লালু বলে–তোরা জানিস না যে, আমি আসব? গেদু সাহস করে বলে- 'জানলে কি হবে'? আমরা হাত পা গুঠিয়ে বসে থাকব নাকি?'

লালু-মনুর কয়লার টুকরি থেকে নিজের টুকরিতে কয়লা ভরতে থাকে আক্রোশে। শুরু হয়ে যায় অধিকার আদায়ের শক্তি-পরীক্ষা। "ওদিকে সকলের হাত থেমে যায়। ও করছে কি? এমন জুলুম মুখ বুজে সহ্য করতে হবে? সোনাভান ওর কান্ডকারখানাটা দেখছিল। সে আর ঠিক থাকতে পারল না। এক পাশ থেকে ঝট করে উঠে এসে ওর হাত ধরে বলল, 'ওর কয়লা জোর করে নিয়ে যাচ্ছ যে?' (পৃ.১৮) শুরু হল মারামারি ধস্তাধস্তি, সোনাভান লালুর মধ্যে। অন্যেরা এসে লালুকে কিছুটা কাবু করল। চিৎকার শুনে সুবেদালী কনেস্টেবল ছুটে এল খাদের কাছে। ভাগ ভাগ বলে তাড়িয়ে দিতে চাইল"। এই কনেস্টবল শ্রেণীর লোকেরাও শোষক। আইন শৃঙ্খলা, রক্ষা জনগণের নিরাপত্তার জন্য এদেরকে নিয়োজিত করা হলেও সবচেয়ে অন্যায় অপরাধ এরাই করে। জনগণের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

একদিন এমনি এক ঘটনা ঘটল– 'মনু-ফুঁপিয়ে কাঁদছে', গেদু আপন মনে আওড়ায়, 'গেলে মার খেয়ে ফিরতে হবে'। লালু পূর্বের সব তুচ্ছ ঘটনা ভুলে দৃঢ়স্বরে বলে– 'কেন? মার খেয়ে ফিরতে হবে কেন? 'কেন দেখনা গিয়ে। আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে'। কে? হঠাৎ এক পা এগিয়ে লালু ওদের মুখের দিকে তাকাল। গেদু বলল, 'কে আবার? ওই কনেস্টবল শয়তানটা। আমাদের আর কয়লা কুড়াতে দেবে না'। 'দেবে না? ওর বাপের ধন নাকি? লালু মাথা ঝাড়া দিয়ে বলে, চলতো দেখি'। লালুকে দেখে সুবেদালী কনেস্টবল খাতির করলেও লালু কোন পাত্তা না দিয়ে মনুর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে। চোখ থেকে আগুন ছিটকে পড়ার

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রম। কনেস্টবলকে আচ্ছাভাবে শাসন করে-লালু, মনু, গেদু, কানা, রূপভান-সবাই পদ্মামাসির ওখানে শলা পরামর্শ করে-খুব ভোরে আবছা অন্ধকারে কনেস্টবল আসলেই অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরেদিন সবাই পাথর নিক্ষেপ করে সুবেদালীকে আহত করে। সুবেদালী উপায় না দেখে লালু গেদুদের সাথে হাত মিলায়। এখানেও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। ষ্টেশন মাষ্টারের চোরাই মাল বুকিংয়ের ঘুষ নেয়া ও বেশি বেতন-সুবেদালী কনেষ্টবলের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার চেয়ে কয়লার টুকরি লালু, গেদু, কানা, সোনাভানদের মাধ্যমে পাচার করে দিলেই তো দু'আনা বেশি আয় করা যায়। এ সুযোগ ষোল আনাই সে ব্যবহার করে। এক প্রহর রাত বাকি থাকতেই সুবেদালী কয়লা পাচারের কর্মটি সম্পাদন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। গল্পকার পরোক্ষভাবে অসম প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুবেদালী কনেস্টবলের-লালু-গেদুদের দলে ভিড়ে যাওয়া পরিবর্তনের আভাস দেয়।

'কয়লা কুড়ানো দল' গল্পে দু'মুঠো অন্নের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে লালু-মনু-গেদু-সোনাভান,–অথচ হোটেলওয়ালা ন্যায্য দাম দেয়না। এখানে শোষণের দিকটা চিহ্নিত হয়েছে। "কয়লাতো অনেকেই কুড়ায়, কিন্তু তা দিয়ে পয়সা তুলতে পারে কয়জন? আর হোটেল ওয়ালারা যা চশমখোর, বিনি পয়সার জ্বালানী পেলেই যেন বাঁচে। ভরা এক টুকরি কয়লার দাম পাঁচ ছ আনার বেশি দিতে চায় না। ঠকায় একলা পেলেই।"(পৃ.১৩) এ গল্পে পদ্মামাসি-কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে মনুকে ভবিষ্যতে ব্যাবসা করার আশ্বাস দেয়ার মধ্যেও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত আছে। পদ্মমাসির মনুকে বলছে।–"আর কটা দিন বাবা। এর পর থেকে আর এ কাজে পাঠাব না। সাড়ে সাত টাকা হয়েছে। আর আড়াই টাকা, ব্যস। দশ টাকা হলেই মুড়িভাজার পয়সা হয়ে যাবে। তখন তোকে স্কুলে পাঠাব কেমন?" (পৃ.১৫) শ্রেণীদ্বন্দ্বের আরো নজির আছে সুবেদালী কনেস্টবলের সাথে স্টেশন মাষ্টারের দ্বন্দ্বে। এবং স্টেশন মাষ্টারের সাথে সুবেদালী কনেষ্টবল ও মনু, লালু, গেদু, সোনাভানদের সাথে দ্বন্দ্বের মধ্যে। এ গল্পের সমালোচনায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন- যে কনেস্টবল নিত্য তাদের পীড়ন করে, একদিন সেও রূপান্তরিত হয়ে ভিড়ে পড়ে এদের দলে। এই রূপান্তরের মধ্যে লেখক দেখতে পান নতুন সূর্যের আলোকপাত।[৩]

'শিষফোটার গান' গল্প শুরু হয়েছে আব্দুল মজিদ নামের পরিশ্রমী এক কৃষককে অবলম্বন করে। সখিনা অভাবের জন্যে ঘরে খোটা দিতে কম করেনা। মজিদ মমিনাকে ধৈর্য্য ধরতে বলে। ক্ষেতের ধান পাকার কথা বলে আশ্বাস দেয় মমিনাকে। সারাদিন ভূতের মত খেটে শরীর তামাটে হয়ে গেছে মজিদের-তবু একটা মধুর ভাবনায় সারা অস্তিত্ব জুড়ে থাকে তার। একদিন অভাব কেটে যাবে। এই আশায় স্ত্রী মমিনাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মায়ের দেয়া জেওর (গহনা) বিক্রী করে মিঞা বাড়িতে সেলামী দিয়ে আধা বিঘা জমি চাষ করল।

---

৩. পর্বোক্ত, পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য বছরের তুলনায় ধানে ভরে গেছে মাঠ। নতুন ধানের শিষের সুবাসে মজিদের মনে শিহরণ জাগায়। মনে মনে গুণ্ডন করে গান করে মজিদ। ভোর রাতে ঘুম থেকে মমিনাকে ছেড়ে খামারের ধারে গিয়ে পাইচারি করে মজিদ। ধানের নেশায় তার চোখে ঘুম নেই। মাঝরাতে উঠে মজিদ মনসুরালির সাথে পরামর্শ করে। সেলামি দিয়ে জমি বর্গা করে ধানের ভাগ অর্ধেক, মিঞাকে দেবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়। গ্রামের অনেকেই মজিদও মনসুরালির সাথে যোগ দেয়। উপযুক্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সড়কি কাস্তে নিয়ে তারা খামার পাহারা দেয়। ধান পাকলে মিঞা বাড়ির লোকজন এসে কাটার নির্দেশ দিলে–মজিদ, মনসুরালিসহ উপস্থিত সকলেই প্রতিরোধ-সংগ্রামে ফেটে পড়তে চায়। সুসংগঠিতভাবে খামারের ধানকাটার ইমেজে তারা আৱহারা হয়ে যায়? যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্যে তারা প্রস্তুত হয়ে আছে। এমনকি মজিদের স্ত্রী- যে নাকি মজিদকে ভৎসনা করে বলেছিলো-'চোখ নাই তোমার? দেখতে পাওনা?' বৌরে কাপড় দিতে পারনা এমন মরদের আবার বিয়া করবার শখ'? শরম করেনা? সেই মমিনা মজিদকে বলে, "যে টাকা দিয়া অলংকার বানাইবা, তা আমরার পঞ্চায়েতের জন্য খরচ কর। আমি সব পঞ্চায়েতরে দিয়দিলাম। তা করলেই আমি সুখী অইয়াম। আরও অনেক সুখী"! (পৃ.৩৬)

'শিষ ফোটার গান' গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উদাহরণ মূল গল্প থেকে চয়ন করা যায়। –"একটা কথা বিষমাখা তীরের মতো কানে বিঁধল, 'ভারি তো দুইকানি খেত। তার মইধ্যে অর্ধেক যাইব গা বর্গাদারের গোলায়। দুকখ থাকব না। না, না! হঠাৎ চেচিয়ে উঠতে চায় মজিদ, কিন্তু তার ঠোঁটের দু'কশ দিয়ে ফেনা ছুটল। কোন কথাই বেরুল না।' কি জন্য এত আক্রোশ! এত রাগ! কন্ট্রাক্টরী ও কালোবাজারীর টাকায় মিঞা কিনে নিয়েছে মজিদ, মনসুরালিদের পৈতৃক জমি। এখন মজিদ নিঃসম্বল। স্ত্রী মমিনার জেওর (গহনা) যা নাকি মজিদের মায়ের অন্তিম বাসনার সাথে স্মৃতি হয়ে আছে; তাই মজিদকে বিক্রি করতে হচ্ছে। মিঞাবাড়ির জমিন পত্তন নিতে হলে এছাড়া কোন উপায় নেই। যা সে কল্পনাও করতে পারেন নি। তাই করতে হচ্ছে। জমি পত্তনি নেওয়ার জন্য। বেঁচে থাকার কি আশা! "হুইন্যা আইলাম মিঞাবাড়ির সব জমিন পত্তন দিতাছে। কিছু জমিন রাখতে পারলে অন্তত চার পাঁচ মাসের খোরাকিও যদি অয় জানডা অনেক হালকা অইব।" (পৃ.৩১)

মিঞারা অভাব অনটনের সুযোগে কুমিরের মত গ্রাস করছে খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কে রক্ত মজ্জা। মজিদ মনসুরালিরা জোট বাঁধে প্রতিকার করার জন্য অধিকার আদায়ের জন্য। মজিদ জানে এ প্রতিরোধ সংগ্রামে বিপদ আছে। জীবনের ভয়ও কম নয়। তারপরও সে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। "তার মনে উজ্জ্বল বিশ্বাসের দীপ শিখা হঠাৎ যেন দপদপ করে জ্বলে উঠেছে। সবকিছু মুখবুজে সয় বলেই ওরা আস্কারা পায়, তা নইলে এতটাকা নিয়েও অর্ধেক ধান দাবি করার পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে। বছরে একবার মাটিতে পা ফেলে না, জুতো পায়ে

Dhaka University Institutional Repository
মচ্‌মচ্‌ করে ঘুরে বেড়ায় অথচ রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, হাড়মাস চূর্ণ করে ফলানো যে ফসল, তাও ঘরে তুলতে পারবে না?" (পৃ.৩২) শ্রেণী স্বার্থের মজিদরা দলবদ্ধ হয়েছে। ন্যায্য পাওনা তারা আর ছাড়বে না; কড়ায় গোন্ডায় বুঝে নিতে চায়।

মজিদ জাতচাষী। ধানের শীষের আগমনে সে আত্মহারা। স্ত্রীকে বলে আবেগমথিত কণ্ঠে–"সুরয উঠতাছে মনি, সুরুজ! কই অহনো অনেক রাইত। একটু অবাকই হয়, মমিনা বলল, 'তুমি কি কইতাছ?' ওর হাত ধরে ঘরের দিকে যেতে যেতে মজিদ অদ্ভুদ গলায় বলল, 'তুমি কিচ্ছু বুঝ না মনি। চাষীর জীবনে সুরুজ তো একবারই ওডে, সে ফসল জাগার সময়"। (পৃ.৩২-৩৩) ফসল জাগার সময়ে সুর ঝংকারের মতো বেজে ওঠে গ্রামের চাষীদের মন প্রাণ। সবার ভিতর একটা টানটান ব্যস্ততা ও উত্তেজনা কাজ করে। ধান পাকতে শুরু করে। চাষীরা প্রস্তুত। বন্দরে যে সব জোয়ান ছেলেরা কাজ করে, তারাও বসে নেই। তাদের হাতে শক্ত লম্বা লাঠি।

মিঞাবাড়ীর সরকার পেয়াদা সাথে করে ধান ক্ষেতের কাছে হাজির। অনেক প্রতিবাদের শব্দ তার কানে আসে। না শোনার ভান করে বলে–"এবার যে বড় তোড়-জোড় লাগেরে। কি ব্যাপার"! ধান ফলেছে প্রচুর? পাঁচ বছরের মধ্যে এত ধান আর দেখা যায়নি। সরকারের মনের মধ্যে গিজ গিজ করে চটকলের প্রাথমিক ব্যবস্থাটা পাকা করার বিষয়টি। সবুর না করে-বলেই বসে-'কালই কাডা লাঘব নাহি ধান'? এ গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ আরো উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে সরকারের ধান কাটার কথা শুনে। –"মজিদের গা জ্বালা করছিল। তার মনে হচ্ছিল, আসল কথাটা সোজাভাবে বলে দিলেই যেন লোকটার উপযুক্ত শিক্ষা হয়। কিন্তু নিজেকে দমিয়ে রাখল। ঠোঁট কামড়ে বলল, 'তা ঠিক করেন গিয়া, ধান কাডায় তো তিন চারদিনের বেশি লাগব না"। (পৃ.৩৫) আমাদের দেশে কৃষক শ্রমিক আন্দোলন মাঝপথে ভেঙে যায়। কিছু সুযোগসন্ধানী কৃষক শ্রমিক নেতা ও মিঞা সরকারদের হয়ে কাজ করে। 'শিষ ফোটার গান' গল্পে গল্পকার সরাসরি প্রতিবাদ বা সংঘর্ষকে এড়িয়ে গিয়ে পরোক্ষভাবে শ্রেণী সংগ্রামকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভাষা ও শব্দ ব্যবহারেও রূপকের আশ্রয় নিয়ে শিল্পসৌন্দর্য বহাল রেখেছেন। তদুপরি সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়েও যে প্রতিরোধ করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ গল্প। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানের মন্তব্য-'শিষ ফোটার গানে' আরেকটু এগিয়ে যান লেখক। জমির মালিকের সর্বগ্রাসী লোলুপতার বিরুদ্ধে সেখানে গড়েওঠে সশস্ত্র প্রতিরোধ'। [৪]

'মহামুহূর্ত' গল্পে শিষ ফোটার গান' গল্পের মত ধান ভাগাভাগি নিয়ে কৃষক ও মহাজনদের মধ্যে কাহিনী বিস্তৃতি লাভ করেছে।

---

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পে রহিম বখশ, মজিদ, শুকুর মধুদের জীবন জীবিকা চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। তাদের 'মাটির টিলার ওপর একেকটা বাড়ি, হয়তো তিন চারটে করে ছনের ঘর'। জোতদারের বাড়িটা এক তলা দালান। নতুন চুন কাম করা। এলাকার জমিজমার সেই একচেটিয়া মালিক। পরহেজগার ঈমানদার বলে এলাকায় তাকে এক বাক্যে শ্রদ্ধা করে সকলে। হজ করে এসেছেন তিনি এবার। বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনার ভার বড় ছেলের উপরে ন্যস্ত থাকলেও পুরানো গোমস্তার হাতেই সবকিছু রয়েছে এখনও। মাঠের অর্ধেক জমি খামারের অন্তর্ভূক্ত রেখে বাকী জমি বর্গা কিষাণদের মধ্যে দেয়া আছে।

শোনা গেল জোতদার এবার ভাগ দেবেনা কৃষকদের। শুকুর কোথা থেকে শুনেছে ঠিক বলতে না পারলেও রহিম বখ্শ মজিদরা এ নিয়ে চিন্তিত। ক্রমান্বয়ে সব খবর নিয়ে জানা গেল জোতদার এবার ধানের ভাগ দেবে না কৃষকদের। কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সন্তর্পণে কাজ করে যায়। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। লাঠিয়াল সর্দারও তাদের সাথে যোগ দেয়।

'মহামুহূর্ত গল্পে' লাঠি সুরকি হাতে দাঁড়িয়েছে ওরা, প্রায় দুইশত মুক্তি সংকল্প মানুষ' কিসের মুক্তি? কিসের নেশায় তারা দলবদ্ধ? বঞ্চনার অবসান চায় তারা। রহিম বখ্শ, মজিদের নিস্তার নেই পৌষ মাসের কন কনে শীতের প্রকোপ থেকে। দু'মুঠো অন্নের যোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয়। আধাখুদ, আধাচালের জাউ খেয়েই দিনাতিপাত করতে হয়। জাউ রান্নার আগুন থামলেও রহিম বখশের বুকের মধ্যে বঞ্চনার আগুন থামে না। একটু ফুঁ দিলেই যেন জ্বলে উঠবে। আশার আলো হাতছানি দিয়ে ডেকে যায়। এ ডাক বড়ই প্রয়োজন। শুকুরের মতো বর্ণচোরাও আশ্বাসের কথা বলে হতবাক করে দেয়।

ধান পাবে না চাষীরা এবার। ছোটসাব ধান দেবে না রহিমবখশ, মজিদ-শুকুরদের। রহিম বখশের বজ্র কণ্ঠ-গল্পের থেকে উদ্বৃত করা যায়।-"দেখমু নে কোন হালা ধান নিতে না দেয়'। খেলা আর কি! ধান কাটলাম এত কষ্ট কইরা আর নিতে দেবে না হুঁ। মগের মুল্লুক পাইছে নাকি? বেশি তেরিমেরি করলে দেহাইয়া দিয়াম, হুঁ"। (পৃ.৪০) ছোট সাহেবেরাও কৌশল কম জানে না। তাদের হাতে রয়েছে পুলিশ ও নামকরা লাঠিয়াল বাহিনী। এভাবে টান টান উত্তেজনার পর অবশেষে মহামহূর্ত এসে যায় খেটে খাওয়া মানুষগুলোর চোখের সামনে। ছোট সাহেবের-ভাড়াটে লেঠেল সর্দার শোষিত, বঞ্চিত রহিম বখশদের দলে ভিড়ে গেল। ছোট সাহেব পালিয়ে গেছে।

ছোকরা লেঠেলরা পেরে উঠল না। রহিম বখশ অবাক হয়ে যায়। সে বিশ্বাস করতে চায় না যে, লেঠেল সর্দার ছোট সাহেবের পক্ষ অবলম্বন না করে তাদের দলে ভিড়ে গেছে। যে লেঠেল সর্দার নিজেকে চিনতে শিখেছে। নিজের ভুল ভেঙে গেছে তার। নিজের অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে এখন সে সচেতন। সে তো আসলে রহিম, মজিদ শুকুরদের জ্ঞাতি। ছোট সাহেবরা তার মাথা কিনে নিয়েছে। অবস্থার শিকার হয়ে আর কত দিন! নিজের শ্রেণীতে ফিরে যাওয়াই তো আসল কাজ। ফিরে যেতে হয় শিকড়ের সন্ধানে। গল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদ চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। রহিম বখ্‌শের সন্দেহের জবাব দেয় লেঠেল সর্দার-"কেন? খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল সর্দার, জানো এতদিনে ওস্তাদের বিদ্যা কাজে লাগাইবার জায়গা পাইলাম। এদ্‌দিন জুলুম কইরাছি নিজের উপর। নিজের উপরই লেলাইয়াছি নিজের তাকত। অহন ত লাগাইব নিজেরে বাঁচাইবার লাইগা। এর চাইতে আনন্দ কই আছে"? (পৃ.৫০) কৃষকরা প্রতিরোধ সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে, একতাবদ্ধ হয়ে ছোট সাহেবের অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ বাহিনীকে হারিয়ে দিয়ে মহামুহূর্তের জন্ম দিয়েছে।

'মহামুহূর্ত' আলাউদ্দিন আল আজাদের বিপ্লব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গল্প। অন্যান্য গল্পে পরোক্ষভাবে প্রতিবাদের প্রসঙ্গ ব্যক্ত হলেও এ গল্পে সরাসরি সংঘর্ষ- সংঘাতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। "তা যদি অয় গরিবরা এক অইলে বড়লোক হালারা কয়দিন টিকব। শুকনা পাতার মতন উইড়া যাইব না? হালা ডাকাতের দল"(পৃ.৪১)। আন্দোলন বানচাল হবার কারণ, বিশেষ করে দলে ভাঙন ধরার বিষয়টি গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। "গরিবরা মিলে আর কই?" এই বার লোকটা মনোযোগ দিয়ে কথা বলল, 'এবার মধ্যি যতসব বেইমানি। দশ জন রুইখা দাঁড়াইলে আর নয়জন গিয়া বড়লোকের পা চাটব। সবাই এক অইলে জমিন দখল করতে, ঘরে ফসল আনতে কতক্ষণ লাগে? এই দেহ, আমি আধি করি। সারা বছর গতর খাইটা তিন মাসের ভাত ও পাই না, ওদিক দিয়া ঘরে লেপ তোষকে ঘুমাইয়া জোতদার বেডারা আধা ধান নিয়া যায়। এসব সহ্য অয় কয়দিন"(পৃ.৪১-৪২)? তারা সহ্য করেনি। এ ছাড়া গল্পে একটা কাগজের প্রসঙ্গ এনে, যে কাগজে শহর থেকে সংগ্রামের কর্মসূচি লেখা আছে, সে কাগজ তাদেরকে পরিকল্পনা করে প্রতিরোধ করতে শিখিয়েছে। সাদরে তারা গ্রহণও করেছে। "পৃথিবীতে এ যেন তার এক গর্বের জিনিশ, গৌরবের বস্তু। এ ছোট কাগজের টুকরো তার কাছে নতুন জীবনের সংবাদ এনে দিয়েছে।" (পৃ.৪৭) সেই সাথে কাঙ্ক্ষিত মহামুহূর্তের জন্ম দিল ফসলের অধিকার আদায় করে।

'ধোঁয়া' গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে পাহাড়ী বাঙলোয় চাকরীরত আবিদ ও পাহাড়ী মেয়ে কালীকে কেন্দ্র করে। আবিদের স্ত্রী রাহেলা। রাহেলা বাঙলোর টিলার ঢালুতে নেমে বেড়িয়ে দেখছিল পাহাড়ী প্রকৃতি। কালীকে দেখে রাহেলা পরিচয় চাইলে কালী নামের মেয়েটি মুখের পরে তাচ্ছিল্যভরে সাহেবের সাথে তার চেনা জানা আছে বলে দেমাক ভরে জানিয়ে দেয়। রাহেলা অপমানিত বোধ করেও ভাবছিল–"সে কতকটা বিহবল ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল মেয়েটাকে, কালো -বেশ কালো তবু আশ্চর্য সুন্দর। বাঁশীর মতো শরীরটা, প্রথম যৌবনের জোয়ার এসে তাকে ভরে তুলেছে।"(পৃ. ১৭০) রাহেলা মা-বাবার অনুগতা; ধর্ম-কর্ম ও স্বামীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা মায়ের মাধ্যমে রক্তের ধারায় তার ভিতর প্রবাহিত। খান্দানি পরিবারের মেয়ে হলেও ক্লাব পার্টির ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। স্বামী আবিদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। গ্রাম শহর থেকে বহুদূর নির্জন এলাকায় তারা দুটি মানব মানবী বাস করছে। ঘটনা মোড় নেয় অন্য দিকে। ইতোমধ্যে 'কালীর' সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আবিদের। আবিদ প্রেম-প্রীতিভরা কথাবার্তায় কালীকে প্রেমিকার আসনে বসিয়েছে। 'কালী' অধিকার নিয়ে আবিদের বাঙলোয় এসে হাজির। পর্যায়ক্রমে ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসা প্রবল হতে থাকে।

'কালী' নির্ভীকভাবে বাঙলোয় প্রবেশ করে। রাহেলা অবাক হয়ে যায়। আবিদ না বোঝার ভান করে 'কালীকে' পাগলী বলে ঘটনা অন্যদিকে নিয়ে যেতে চায়। 'কালী' প্রস্তুত হয়ে এসেছে। মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও সুন্দর গ্রীবায় দোল দিয়ে বলল,–"সায়েব তুই মুকে নিবিনে?"(পৃ.১৭৭) আবিদ আরো কৌশল করে বলে, –"কি কয় পাগলী!" আবিদ বিকার গ্রস্থের মত ডাকল, রুহি! শোনো, দেখে যাও। তোমার সেই পাগলীটা এসেছে–হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ"! (পৃ.ঐ) 'কালী' দমে যায় না। সাহস নিয়ে বলে, "তুই সাচ জানিস সায়েব আমি পাগলী নই। তুই মুকে প্যার করেছিলি মনে নেই সায়েব"? (পৃ.ঐ) আবিদ তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান বজায় রাখতে চায়। যে কোনো উপায়ে কালীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি ধামা চাপা দিতে চায়। কিন্তু সহজে তা হবার নয়।–"কালো কালো সারবদ্ধ কুলির দল টিলার ধার থেকে সূর্যমুখীর কেয়ারী পর্যন্ত, সামনে মেয়ে ও পিছনে মরদরা, নির্বাক এদিকে তকিয়ে আছে। কালীর সঙ্গে মিছিল করে এসেছে ওরা?" (পৃ.১৭৮) মতলব" পরিবেশটা থমথমে, কি জানি কি হয়ে যায়। আবিদ না জানার ভান করে বলে, –"তোমরা কি চাও? কি চাও তোমরা? কালীর মুখে সেই একই কথা, এবার সে জোর দিয়েই বলল, 'তুই যে বলেছিলি, মুকে লিবিনা সায়েব"? (পৃ.ঐ) আবিদ ক্ষেপে যায়। 'শাটআপ বলে চিৎকার করে বলে–"আমি জানি, হ্যাঁ আমি জানি তোমাদের মতো জানোয়ারদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়।" (পৃ.ঐ)

সে হান্টার দিতে বলল ঘনশ্যামকে। চাকর ঘনশ্যাম-মনিবের হাতে হান্টার দিয়ে দিল। 'তোর বদমাইশি বার করবো বলে' দাঁত কিড় মিড় করে উঠল। 'কালী' অবিচল! "কালী নড়লো না একটুও, বরং বুনো বিড়ালের মতো ফুঁসে উঠল। তারপর খিল খিল করে হাসতে থাকে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, মোর পেটে তোর লেড়কা আছে, সে কুলি হইব তাকে মারিস" ।(পৃ.ঐ) হান্টার নিয়ে আবিদ দৌড়ে গিয়ে গুলি করে শেষ করে দিতে চায়। কিন্তু না, সামনে আছে সারিবদ্ধ কুলির দল, স্পন্দনহীন। আবিদ ওদের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকে। মিছিল নিয়ে কুলিরা চলতে থাকল। রাহেলা সব বুঝতে পারল। আবিদ রাহেলাকে নিয়ে ঘরে গিয়ে মদের মধ্যে ডুব দিতে চায়; রাহেলা এক গ্লাসের পর আরেক গ্লাস খেতে উদ্যত হয়।–"আহা কি

Dhaka University Institutional Repository

মধুর! দাও না লক্ষ্মীটি! আরেকটু দাও!" রাহেলা পাগলের মতো বিলাপ করে। খোটা দিয়ে বলে–"আমি তাহলে ঐ দিকে চেয়ে থাকবো না। হি হি হি" ।(পৃ.ঐ)

আবিদ শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কুলি মজুরদের প্রতিবাদের মুখে টিকতে পারেনি। মাদক দ্রব্যের মাঝেই ফিরতে হয়েছে, পরাজয়কে ভুলে থাকতে। কিন্তু পারেনি, চারদিকে কেবল প্রতিবাদ মিছিলের 'ধোয়াই' দেখেছে। শ্রেণীবৈষম্যের রূপটিও ধরা পড়েছে জ্বলন্তভাবে।

'মোচড়' গল্পের বর্ণনায় দেখা যায়–দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ। নিউজএডিটর উপরওয়ালাদের ভয়ে তটস্থ। ময়মনসিংহ থেকে একটা হাঙ্গামার রিপোর্ট কাটছাট করছে-বলে নিউজ এডিটর সম্পাদককে জানায়। সম্পাদক তা মেনে নিতে রাজী নয়। কিষাণদের ক্ষেত থেকে ধান কেটে নিয়ে আসল– সরকারী অফিসাররা, সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে। সংঘর্ষে মূল রিপোর্টে সাতজন নিহত, তেরোজন গুরুতর আহত, সেখানে সাতজনকে করা হয়েছে একজন আর তেরোজনকে করা হয়েছে তিনজন। রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তি ও আমলাদের ইশারায় নিউজ এডিটর এটা করেছে বলে বোঝালেও সম্পাদক সত্য প্রকাশে অটল। সম্পাদকের চিন্তা চেতনার মাঝে দেশের অনেক প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্র ভেসে ওঠে। চাকুরী জীবনের পনেরোটি বছরে নিজের হাতের কলম নামের অস্ত্রে জখম করেছে অনেককে। এখন সবকিছুর মূল উৎস জানার পর-সম্পাদকের বিবেকের দংশন তীব্রভাবে আঘাত হানছে। এ গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র আন্দোলন সংগ্রামের স্রোত একজন দায়বদ্ধ পত্রিকার সম্পাদকের চেতনায় পঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রভাব ফেলেছে। সম্পাদকও মিলে যেতে যায় জনতার মাঝে। জনতার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মাঝে।

'মোচড়' গল্পে নিউজএডিটরের সাথে পত্রিকার সম্পাদকের কথোপকথনে শ্রেণীগত অবস্থান ব্যক্ত হয়েছে। মাইনে, এলাউন্স ইত্যাদি বিষয়ে কর্মচারীদের সচেতনতাকে সমর্থন করেন সম্পাদক সাহেব। কিন্তু মালিকের সাথে তাকে জড়ানো তো ঠিক মনে করেন না। সম্পাদক তো নিউজ এডিটরসহ অন্যান্য কর্মচারীদের দলভুক্ত। সুযোগ-সুবিধা, ন্যায্য দাবি আদায়ে তার আপত্তি থাকার কথা নয়।

কিষাণের উপরে পুলিশের সশস্ত্র হামলা। প্রকৃত ঘটনা সাতজন নিহত ও তেরজন আহত। নিউজএডিটর সাতজনের স্থানে একজন ও তেরোজনকে তিনজন করেছেন। সম্পাদক সাহেবের মন বিষাদে ভরে গেল। সে কি করবে ভেবে চঞ্চল হয়। নিউজ এডিটরকে বলে প্রকৃত সংবাদ কম্পোজ করতে নির্দেশ দিলে কেমন হয়? পত্রিকার মালিক, আমলা, মন্ত্রীদের দাপট আরো সব ঝামেলার কথা ভেবে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, অবশেষে সাহস করে নিউজ এডিটরকে সংবাদটা পরিবর্তন করার আদেশ দিলেন, পুলিশের উপর উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণ, এখান থেকে উচ্ছৃঙ্খল শব্দটা কেটে দিল।' আত্মরক্ষার জন্য, এসব বাদ দিয়ে লিখুন শুধু পুলিশের

Dhaka University Institutional Repository

গুলীবর্ষণ।' নিউজ-এডিটরের খেদোক্তিও উল্লেখ করার মতো– "রিপোর্টে যা আছে আমরা করে দিয়েছি ঠিক তার উল্টো। সরকারী অফিসাররা সশস্ত্র পুলিশ লাগিয়ে কিষাণদের ক্ষেত থেকে সব ধান নিয়ে এল এর একটা পোঁচও আমাদের খবরে দেয়নি।"

প্রকৃত সত্য খবর দেবে কি করে? সম্পাদক সাহেবের ক্ষমতা তো সীমিত। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় সম্পাদকের বেশ জানা আছে– অন্যায়, অসত্যকে টিকিয়ে রাখতে গণ পরিষদের শ্যেন দৃষ্টির সীমা কতদূর বিস্তৃত-"সম্পাদক আজ বড়োই বিচলিত। ঘরের দেয়ালে লটকানো জাতির পিতা, এশিয়ার লৌহমানব তার দিকে চেয়ে যেন ভর্ৎসনা করছে। বুদ্ধি, বিবেচনাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। যুগে যুগে শোষক শ্রেণীর আভিজাত্য আর ভদ্রতার পালিশ করা ঝকঝকে পোষাকের ঝলকানি সম্পাদকীয় ভরে গেছে। সহস্র শোষিত মানুষের জীবনের রক্ত মাংস নিয়েই শোষক শ্রেণীর কীর্তির রামধনু গড়া;– এ অমোঘ সত্যটা প্রকাশ করা দরকার। সম্পাদক ধীরে ধীরে সে সব সত্যের খবর কম্পোজ করতে নির্দেশ দেয়-"অমানুষিক জুলুমের প্রতিবাদ এবং নিম্নতম মানবিক অধিকারের জন্য বিভিন্ন জেলে প্রায় দশ হাজার রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দীর অনশন ধর্মঘট শুরু। ..... দাবী পূরণ না করা হলে আমরণ অনশনের ঘোষণা। বন্দীদের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করতেও কর্তৃপক্ষ রাজী নয়"। বন্দীদের দাবীর সমর্থনে জনসভা। ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুলের ছাত্রদের ধর্মঘটের আহবান, আগামীকাল পূর্ণ হরতালের উপর কাঁদুনে গ্যাস, লাঠি চার্জ, পুলিশ ও জনতার সংঘর্ষ। আলোচ্য গল্পের কথক পত্রিকার সম্পাদকের মাতামহের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর কণ্ঠে ছিলো তীব্র শক্তি। গাঁয়ে একতারা নিয়ে মারফতী গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। সমস্যার মধ্যে ছিল-বাম কানে সে শুনতে পেত না। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেও রোষে জ্বলে উঠতেন। উত্তেজনায় বেরিয়ে পড়ত বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর। গল্পকার বর্ণনা করেছেন–"খোদ কাছারিতে দাঁড়িয়ে খাজনার ব্যাপারে কথা কাটাকাটি করায় নায়েব শয়তানটা এক চড় মারে কান ঝাপটে, তাতে কানের পর্দা ছিঁড়ে যায়। চড় খেয়েও নমো নমো করবার পাত্র তিনি ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে নায়েবের মুখ থেৎলে দিলেন ঘুষিয়ে।" (পৃ.১৭১)

কথকের স্মৃতিচারণের সুরে পিতামহের আমলের জমিদার কাছারির অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনীর সাথে কিষাণদের প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করতে গল্পকার সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। 'মোচড়' গল্পের শেষ দিকেও গল্পকার চিত্তাকর্ষক চিত্রকল্পের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ছবি এঁকেছেন।" (পৃ.ঐ) "কারা যেন ডাকছে পেছন দিক দিয়ে ; দেশের বাড়ির সামনেকার প্রান্তর থেকে, যেখানে পাকাধানের সোনালী ছড়ায় পিচকারির আলতার মতো তাজা রক্ত ছিটকে পড়েছে"। (পৃ.ঐ)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া গল্পে অন্তঃসত্তা নারীর অনশন ভঙ্গ না করার বিষয়টা-প্রচন্ড বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ বলে বিবেচিত। দেশের সর্বত্র আন্দোলন মোচড় দিয়ে উঠেছে।

'চেহারা' গল্পের কাহিনীতে আছে- দুই বাল্য বন্ধুর- অনেক বছর পর সাক্ষাতের বিবরণ। গ্রামে তারা এক সাথে লেখাপড়া করতো। ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র ছিল আহসান। কথক দুইবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে বিয়ে করে কন্যার বাপ হয়েছে। আহসানের দেখলে চেনা যায় না। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে চশমা, ঢোলা পায়জামা, ছেড়া শার্ট'- কবি কবি ভাব। ছোটবেলায় অনেক স্মৃতিচারণের পর দু'জনার মধ্যে অনেক ঘটনার জট খুলে গেল। আহসান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পলাশী ব্যারাকের পাশে এক স্যাঁত-স্যাঁতে জায়গায় অবস্থান করে। ছাত্র পড়িয়ে দুটো খাবার ব্যবস্থা করেছে। আহসানের বাবা-মা একে একে সব মারা গেলেও স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজের পাঠ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। অবাক হয়ে যায় গ্রামের বন্ধু। দুই বন্ধু গল্প শেষে ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে আহসানের কাছে লোকজন আসাতে- আহসানের বাল্য বন্ধুটির বুঝতে আর বাকী থাকে না কিছু। আহসান নিজের জন্যে, নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যে চিন্তা না করে জনগণের মুক্তির পথ দেখানোর জন্যে এ পথ বেছে নিয়েছে। কথক বাল্য বন্ধুটি- গল্পের শেষে আহসানের সাথে থেকে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। আহসানের সাথে মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে প্রবল বাসনা জেগে ওঠে তার মধ্যে।

স্কুল জীবনের জনৈক বাল্য বন্ধুর প্লাটফরমে অপেক্ষার পর আরেক বন্ধুর সাথে সাক্ষাত ঘটে। কথোপকথনের মধ্যে দেশের অনেক প্রসঙ্গ আলোচনায় আসে। গ্রামের বন্ধুটি সীমান্ত অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে মন্তব্য করে। "আর চোরাকারবার তো চলছে সমানে। এমন অবস্থা–সাধারণ মানুষের দেশে টেকা দায়। মানুষ বিদ্রোহ করে না? এক আশ্চর্য প্রশ্ন আহসানের, আমি অর্থ বুঝলাম না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, বিদ্রোহ আর কি করে না, কিন্তু করলেও আর কি হবে। সে অল্পক্ষণ। তারপর সব ঠাস আর ঠিস"। আহসানের মনে অনেক প্রশ্ন। বিশেষ করে জনগণের অধিকার আদায় করার কোন সংগঠন আছে কিনা। প্রতিবাদ হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর গ্রামের সংসারী বন্ধুটি দিতে পারে না। আহসান জানে কি করা উচিত।

আহসানের মতো মেধাবী সম্ভাবনাময় ছেলেদের অনেক জানতে হয়। আগ্রহের সীমানা বাড়াতে হয়। ঝুঁকি নিতে হয় জীবনের। ছাত্র জনতার পাশে দাঁড়াতে হয় দাবী আদায়ের সংগ্রামে। যদিও আহসান থাকে শ্রীহীন স্যাঁতসেতে বস্তির পাশে। গল্পের শেষে সাবলিল প্রতীতী মূর্ত হয়েছে কথকের মুখে "বিড়িতে একটা সুখটান দিয়ে বললাম, যদি আপত্তি না থাকে যে কয়দিন শহরে আছি তোর এখানেই থাকব। তোর কোন অসুবিধা হবে না? আমার কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য হয়েও জিজ্ঞেস করলে আমি শান্তভাবে বললাম, না জায়গাটা আমার বেশ ভালো

Dhaka University Institutional Repository

লাগছে। আহসান কোনো কথা বলল না। হয়তো মনে করেছে বিদ্রুপ করছি; কিন্তু আমিতো জানি, কথাটা বেরিয়ে এসেছে আমার অন্তরের গভীর থেকে, যেখানে এখন সবই স্ফটিকের মত একটা ঝর্ণাস্রোতের কলধ্বনি" ।সে কলধ্বনি আর কিছু নয়। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার তাড়না। অন্যায় অত্যাচারকে রুখে দেয়ার স্পর্ধা।

'জবানবন্দী' গল্পের শুরু হয়েছে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির আলাপচারিতার মাধ্যমে। তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থকে বহাল রাখতে বদ্ধপরিকর। তাদের মধ্যে নওশের আলী খান বেশী মেজাজী মানুষ, আর আছেন ফয়েজ চৌধুরী ও নীলকোর্তা নামে পরিচিত–এক কালের কলামিষ্ট। তিনি রসালো কলাম লিখে হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েছিলেন বলেও শোনা যায়। নবীনদের মধ্যে আছে–'সাজ্জাদ' ও নওশের আলীর কন্যা 'জেবুন্নিসা'। সাজ্জাদ নওশের আলীর ভ্রাতুষপুত্র। আগে থেকে ভাইকে সাবধান করেছে সাজ্জাদ সম্পর্কে, কিন্তু কাজ হয়নি। সাজ্জাদ মানবতার পক্ষে কাজ করবে। তাঁর শিল্প সাধনা মানুষের কল্যাণের জন্য। সাত চল্লিশের দেশ ভাগাভাগির পর নওশের আলীদের মতো কায়েমী স্বার্থবাদী কিছু লোক যুগের পরিবর্তনকে মেনে নেয়নি। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে সবকিছুই করেছে। নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার সাথে মোটেই মিল হচ্ছিল না। এমনকি নিজের মেয়ে জেবুন্নিসা ও সাজ্জাদের পক্ষ নেয়। মানবতার মুক্তির নেশায় কাজ করে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেলে সাজ্জাদ। এমনটি হয়ে যাবে ভাবতেই পারেনি চাচা নওশের আলী। সাজ্জাদ জেবুন্নিসা আন্দোলন সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তাদের এই পথ থেকে ফেরানো কঠিন। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব জিজ্ঞাসার চিত্রই বার বার ব্যক্ত হয়েছে।

'জবানবন্দী' একটি দ্বন্দ্বমুখর গল্প। পুরাতন–নতুনের দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রসারিত হয়ে সত্য বেরিয়ে এসেছে। নওশের আলী খান ওরফে নীলকোর্তা ও বন্ধু ফয়েজ চৌধুরীরর কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা আধুনিকতাকে ধ্বংস করতে চায়। পুরানো সংস্কারেই মুখ গুজে থাকবে। সূর্যের আলোর ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে চোক বুঁজে পড়ে থাকবে, –ভাবটা যেন এমন। তা হয় না। যুগ ধর্ম কথা বলে যায়। জানানা দিয়ে যায় কালস্রোত। জীর্নজ্বরা-পুরাতনকে নতুন সাজে সজ্জিত করতে কাউকে তো এগিয়ে আসেত হবে। এ গল্পে এগিয়ে এসেছে নওশেরআলী খানের ভ্রাতুষপুত্র সাম্মুদ ও তনয়া- জেবুন্নিসা। নওশের আলী খানের বড্ড ভয় এসব উড়নচন্ডি ছেলে ছোকরাদের নিয়ে। কখন কি করে বসে।

নওশের আলীরাও ছাড়বে না সংস্কার। বন্ধু মহল তথা ফয়েজ চৌধুরী গল্প বর্ণনা কারী তো রীতি মতো সংগঠন করে, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে ফেলেছে। সবাই মিলে স্বাক্ষরও করেছে। জাতির নেতৃত্ব তো তাদের দিতে হবে। জাতির ভালোমন্দ কর্মপনাহ তাদেরই নির্ধারণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। গল্পকার সাবলিভাবে বর্ণনা করেছেন–"নওশের আলীর কলারের ভেতর থেকে জিরাফের মতো গলাটা বার করে উন্নত মস্তকে বলতে লাগলেন, এ কথাটা বার বার বলার দরকার নেই যে, জাতি গঠনের গুরু দায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি বলে মনে করবেন না, একটা বই দিয়েই খালাস হয়ে গেল। আসল কাজ শুরু হবে আজ থেকে। বদ হাওয়ায় আমাদের তরুণ তরুণীদের মাথা গরম হয়ে উঠেছে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে সুপথে।" কোন এক গুরু দায়িত্ব চেপে বসেছে নওশের আলী খানের। নবীন প্রভাতের নতুন কর্ম-প্রবাহ তারা মানতে পারছে না। শ্রেণীগত অবস্থান বাধা হয়ে পড়েছে। তাদের আক্রোশ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ও কম নয়। পেশশক্তির প্রয়োগ করতে পিছপা হয় না তারা। প্রয়োজন হলে–"যারা মানতে চাইবে না, কঠোর হস্তে দমন করতে হবে তাদেরকে। এখানে ও দুর্বলতার প্রশ্রয় দিলে চলবে না। মোটকথা, গঠনতন্ত্রের দুনম্বর মূলনীতি অনুযায়ী তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের সকলরকম প্রচেষ্টাকে চুরমার করে দিতে হবে। এ অবস্থার পাশাপাশি সাম্মুদ, জেবুন্নিসাদের প্রতিবাদ কম নয়,– "তার (নওশের আলী খান) বক্তৃতা শেষ না হতেই পাশের কামরার ভারী কাঠের দরজাটা এমন প্রচন্ড শব্দে বন্ধ হয়ে গেল যে, আমরা সবাই একসঙ্গে চমকে চাইলাম। শব্টার ভেতরে থেকে যেন ঘৃনা, বিতৃষ্ণা ও উত্তেজনা দারুন আক্রোশে ছিটকে বেরিয়েছে। নওশের আলী খান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?" (পৃ.১৯০)

সাজ্জাদ ন্যায়ের পক্ষে কথা ছোট বেলা থেকে। গল্প কথক তার প্রসঙ্গ এনেছেন-নিমক দান আনতে ভুল করলে বাড়ীর চাকর ছোকরাকে শূয়রের বাচ্চা বলে গালি দিলে সাজ্জাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয়। "কি বললেন? বাসন থেকে হাতটা তুলে সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করলে। গরম মেজাজেই জবাব দিলাম, যা বলেছি তা তো শুনেইছ। হ্যাঁ শুনেছি। উইদ্র দা ওয়ার্ড। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে বলতে লাগল, যে আপনার বাড়ির চাকর হতে পারে, তা বলে শূয়রের বাচ্চা নয়। ননসেন্স। সেদিন ভাত না খেয়ে সাজ্জাদ বাড়ী থেকে উধাও হয়েছিল।

এমন স্পর্ধার কাছে নত হতেই হয় সংস্কারাচ্ছন্ন, অত্যাচারী ব্যক্তিদের। এটাতো অহমিকা নয়। স্পষ্ট প্রতিবাদ। দীন দরিদ্র মানুষদের পক্ষে কথা বলা। হোক তারা শ্রাদ্ধস্পদ। তাকে স্নেহ করলে, সেটা তুচ্ছ বিষয়। বাড়ী থেকে উধাও হবার পরে সাজ্জাদের এক চিঠিতে স্পষ্ট সাম্য প্রতিধ্বনিত দেখা যায়।"আপনার ভাষায় তারা ছোটলোক কিংবা শূয়রের বাচ্চা হলেও আমার কাছে তারা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। তাদের হাতে হয়ত গোবর লেপটে আছে, তবু আপনাদের সাবান আতর মাখা ধোপ দুরস্ত শরীর থেকে তা অনেক বেশি পবিত্র॥

পালা-পার্বন, উৎসব আবহমান বাংলার সংস্কৃতিতে মিশে আছে। বর্ষা-উৎসব ও তো এসবের বাইরে নয়। এ ধ্রুব সত্যটা কায়েমী স্বার্থবাদীরা তোবার মানতে চায় না। বরং

Dhaka University Institutional Repository

বিজাতীয় ভাবধারা বলে বিরোধিতা করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে রুখে দিতে হেন কাজ নেই যে করে না। এদেশের সন্তানদেরকে এদেশের শত্রু বলে অভিহিত করে সংস্কৃতি কর্মীদেরকে। সাজ্জাদ জেবুন্নিসারাতো রাষ্ট্র যন্ত্রের কেউ নয়। এ পর্যায়ে বড় কন্টকাকীর্ণ। অনেক কষ্টে নদী পেরিয়ে এ বাংলাকে এ দেশের শ্রেষ্ঠ মনে করে সামুদ্দরা। এদেশের সাথে তাদের নাড়ির টান। রক্তে মজ্জায় মিশে গেছে এদেশের মাটি। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মানুষেকে মানুষের অধিকারকে কড়াগেন্ডায় বুঝে দিতে হবে। সাজ্জাদ ভেঙ্গে পড়ে কখনও বা। জেবুন্নিসা সান্ত্বনা দিলে পাল্টা ক্ষোভে ও জিজ্ঞাসায় ফেঁটে পড়ে সাজ্জাদের কণ্ঠ। "ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকা উচিৎ। দিনের পর দিন এই রাবিশ প্রপাগান্ডা কত টলা রেট করা যায়। এরা প্রচার করছে, এদের মতো দেশ প্রেমিক ইহসংসারে নেই। কিন্তু বলি, জনসেবার নামে কারা বার বার তহবিল তছরুপ করেছে? সাড়ে চার কোটি মানুষকে অজ্ঞ করে রেখেছে। কারা?

সাজ্জাদের ব্যক্তিগত ডায়েরীর পৃষ্ঠায় তার শিল্পী মনের আকুতি ধরা পড়েছে। সে আর পাঁচজন শিল্পীর মতো বাহবা কুড়াতে চায় না। গল্পে তার ইঙ্গিত। "আমি মানুষের শিল্পী, জনগণের শিল্পী। যুগেযুগে অনেক স্বার্থবাদী লোকের আকাশচুম্বী বঞ্চনার ইতিহাস, আমার এই বাংলায় বিশাল ও বিচিত্র গণজীবনের সুখ, দুঃখ প্রেম-ভালোবাসা আমার লেখার অক্ষরে অক্ষরে মূর্ত হয়ে উঠবে, অন্যদিকে নির্মমভাবে আঘাত হানবে গলিত সমাজ ব্যবস্থাকে। যেখানে সকল অগ্রগতি অনুর্বর চোরাবালিতে মুখ গুজেছে। এই অনুভূতি যেদিন ভুলব, সেদিনই যেন আমার মৃত্যু হয়"। গল্পের পরিনতিও সে আশাবাদকে উজ্জ্বল করে। জেবুন্নিসার অভয় বাণী সাজ্জাদকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করতে সাহায্য করে। সাজ্জাদ বুঝতে পারে শোষণের জগদ্দল পাথর অপসারণ করা তার একার কাজ নয়। সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্ভব। অবশেষে সাম্যের বৃষ্টিতে শোষকের হৃদয় ভিজে যাবার আশাবাদ ব্যক্ত হতে দেখা যায় এ গল্পে। শ্রেণী চেতনা ও দ্বন্দ্ব আরো প্রবলভাবে ধরা দিয়েছে গল্পের শেষে সাজ্জাদের উক্তিতে–"ভেবে অবাক হয়ে যাই একটু চিন্তার স্বাধীনতা যেখানে নেই, সে জাতি কেমন করে বাঁচতে পারে? না, না জীবন অসহ্য। গলায় ফাঁস নিয়ে আমি বাঁচতে পারব না।" (পৃ.১৯২)

'মাঝি' গল্পে আছে জহর আলী নাম মাঝির জীবন-সংগ্রাম ও প্রতিশোধের কাহিনী। দুই ছেলেকে নিয়ে মাঝি নৌকা চালিয়ে জীবনযাপনে হিমশিম খেয়ে যায়। আকাশের অবস্থা খারাপ জেনেও রোজগারের আশায় ঘাটে বসে থাকে। কাঞ্চির জাউ আর লম্বা আলু খেয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন গেছে জহর আলীর। লোকজনের কোন আভাস না পেয়ে নাও ভাসায়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হচ্ছিল জহর আলী-এমন সময় ডাক পড়ল নৌকায় করে নিয়ে যাবার জন্যে। দূর থেকে চেনা না-গেলেও নৌকার কাছে আসলেই আলী ঠিক চিনতে পারল- জাহের ভূঁইয়াকে। যে 'জাহের ভূঁইয়া' জহর আলীকে জুতা পেটা করেছিল নৌকা পারাপারের ন্যায্য ভাড়া দাবী

Dhaka University Institutional Repository

করাতে। আলী অপেক্ষায় ছিল অনেক দিন। আজ সুযোগ পেয়েছে প্রতিশোধের। 'জাহেরভূঁইয়া' অসহায় হয়ে আলীর সাথে খাতির করতে চেষ্টা করে। আলী চুপ-চাপ থাকে। কথাবার্তার ফাঁকে 'জাহেরভূঁইয়া' আলীর ছেলেকে তার গুদামে চাকরি দেয়ার আশ্বাস দিলে-আলী ক্ষেপে যায়। দা দিয়ে মুন্ডো নামিয়ে দেয়ার আস্ফালন করে। ভয়ে 'জাহের ভূঁইয়া' যত টাকা লাগে তত দিয়ে প্রাণভিক্ষা করে আলীর কাছে। আলী অনড়। দু'ছেলেকে শক্ত করে ধরে –জুতা পেটা' করে জাহের ভূঁইয়ার মুখ থেতলে দেয়। এছাড়া ঘটনা প্রবাহের মধ্যে আলীর জীবন যাপনের মাঝে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উল্লেখ আছে।

সেদিন আলীর মনে হয়েছিল চিংড়ী মাছের মাথার মত চিবিয়ে খায়। ভূঁইয়া সরে পড়েছিল, তাছাড়া সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঘিরে ধরেছিল। ওই ঘটনার পর থেকে অনেকদিন তাক করে থেকেছে আলী। ভূঁইয়াও যে সাবধানতা অবলম্বন করেনি, তা নয়। আজ কপাল টলে গেছে। সদুর নৌকা ভেবে জহর আলীর নৌকায় এসে পড়েছে। কি আর করার..। কৃত্রিম কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। "আলোর সামনে তৈরি করা হাসিটা দাঁতে মুখে ফুঁটিয়ে বলল, সিগারেট খাইবানি আলী? বেশ কড়া জিনিষ; তামুকের মতনই"। আলীর মনোভাবের পরিবর্তন না-দেখে ভূঁইয়া আহলাদ করে বলল,–"তুমার একদম বুদ্দিশুদ্ধি নাই মিঞা, ইমুন জোয়ান জোয়ান পোলা দুইড্যারে ও নাওয়ে লাগাইছ! কত কাম আছে! আমারে কইলে জনুরে গুদামের জমাদার বানাইয়া দিতাম"। আলী এসব আশ্বাসে নরম হয়না। প্রতিশোধের আগুন মনের মধ্যে দাও দাও করে জ্বলে ওঠে। "চুপ! তীব্র তির্যক কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে আলী, চুপ মাইরা থাক্ হারামজাদা। আমার মুহে জুতা মারছিলি মনে আছে? খুন করুম তরে আজগা। খুদার নাম নে! জনু রাম দাওডা বার করছ্যানরে"। জনু ওঠার আগেই আলীর পা জড়ায়ে মিনতি করে জাহের ভূঁইয়া–"মরিস না আলী, আমারে মরিস না! যা চাস তাই দিমু–এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার। যত টাকা চাস এই নে। হাউমাউ করে কেঁদে আরো কত মিনতি করল ভূঁইয়া। হারামী! আলী একটা লাথি মেরে তাকে সশব্দে ফেলে দিল পাটাতনের ওপর। ভূঁইয়া কঁকিয়ে উঠল।" (পৃ.ঐ)

নদীতে তুফান ওঠেছে। নৌকাটা ডুবু ডুবু প্রায়। প্রখর বৃষ্টি ও ঝড় ঝাপটায় ক্ষ্যাপা নদীর মধ্যে ঠেলা মেরে জাহের ভূঁইয়াকে ফেলে দিলে কোন হদিস মিলতো না। এমন সুযোগ পেয়েও তা করল না আলী। জীবনমরণ পণ করে উত্তাল তরঙ্গ থেকে ডিঙ্গিটাকে কুলে আনতে মুখে ফেনা ছুটেছে। ছেলে দুটো কাঁপতে কাঁপতে দাঁড় বেয়ে আলীকে সাহায্য করে এ যাত্রায় রক্ষা করল। এত বিপদের মুখে পড়ে উদ্ধার পাবার পর ভূঁইয়ার মনে আবারও আশঙ্কা দানা বাঁধলো। ঘাটের কাছে কোন লোকজন নেই। গ্রাম ও মাইল খানেক দূরে। সহসা আলীর কণ্ঠ–"পয়সাগুলো ফ্যালা। আট আনা আর দুই আনা দশ আনা। ভূঁইয়া কাঁপতে কাঁপতে আবার

Dhaka University Institutional Repository

খুঁতিটা এগিয়ে দিল, বলল, দশ আনা ক্যান, ন্যাও ন্যাও এই খুতিটাই নিয়া যাও! অনেক ট্যাহা আছে"। (পৃ.১৯৮)

আলীদের অনেক টাকার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু ন্যায্য পাওনা আদায় করা। যে পাওনা জাহের ভূঁইয়ারা পেশী শক্তির বলে কুক্ষিগত করে রাখে। কিন্তু আলীদের মতো বলিষ্ঠ প্রতিবাদী মাঝি মাল্লার পাল্লায় পড়লে সব দিতে চায়। অধিকার টাকা-পয়সা আরো কত কি! আলীরা সে সব গ্রহণ করেনা। অপমানের প্রতিশোধ অপমান। মারের শোধ মার। "তাকে (ভূঁইয়া) টেনে নিয়ে নামিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে দাঁড় করালো, দুইহাত ধরে দুই ভাই; আলী হিহি বাতাসের মধ্যেই গুলুইয়ের ওপর হারিকেনটা রেখে নেমে আসে। হাতে সেই জুতো জোড়া। আচমকা চপাট্ চপাট্ আওয়াজ, মারছে আলী, মারছে জুতো দিয়ে মারছে ক্ষিপ্তের মতো। গাল দু'টো দু'হাতে চেপে ভূঁইয়া বসে পড়তে চায়; কিন্তু দুই ভাই ধরে রাখে, যেন যমদূত। এতক্ষণে গরগর শব্দ করারও সামর্থ নেই"। ছেলে জুনুর ক্ষিপ্ত কণ্ঠ থেকে ক্রুদ্ধস্বর বেরিয়ে আসল–"কি জুতা দিয়া মারতাছ বাজান লও কাইট্রা খাদাইয়া যাইগা"! আলী জানে একটা খতম করলে তাদের শ্রেণীগত বৈষম্যের অবসান হবে না। চাই সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। দরকার শ্রেণী সচেতনতা। আলাউদ্দীন আল আজাদের অন্বিষ্ট' সেদিকেই –"ছেলের হাতের দা'টা ধরে নামিয়ে দিয়ে বলল, একটারে খাদাইয়া কি অইব রে! থাক।" (পৃ.ঐ)

'চারজন' গুন্ডার জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'চারগুন্ডা' গল্পের কাহিনী। ইবু, কালু, মালু, জবু এ চারগুন্ডার বাটপারি, কালোবাজারী করেই জীবন জীবিকা চলে। নিজেদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি বা ঝাগড়া ফ্যাসাদ হলেও বৃহৎ স্বার্থের খাতিরে তারা মীমাংসা করে নেয়। ইবুর সাথে সখিনার বিয়ের পর সখিনা চেষ্টা করে কিভাবে স্বামীকে সৎপথে আনা যায়। ইবু যে একদম বেকার হয়ে বসে থাকে তা নয়। দিনের বেলা ঘুমিয়ে কাটায়; রাত হলে চোরাই সূতা সরবরাহ করে। সখিনা দেওরসহ দু'জন কারিগর নিয়ে তাঁত বুনার কাজ চালিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ কালোবাজারির কারণে সূতার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। সখিনা বার বার পিড়াপিড়ি করলে ও দেওর ইসু সূতা আনতে যাবার ভরসা পায় না। অবশেষে ইবুগুণ্ডা সূতা আনতে যায়। ডিলারদের ষড়যন্ত্রে পারমিটের সূতা দেয়া বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাঁতীরা বড় বিপদে-একথা ইবুর মনে দাগ কেটে যায়। ইবু সহ চারগুন্ডা গুদাম ঘরের তালা ভাঙ্গে। উপস্থিত তাঁতীরা ও উচ্ছৈস্বরে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু পরের দিন পত্রিকায় সূতা লুণ্ঠনের খবর ছাপা হলো। চারগুন্ডার গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হলো। 'চারগুণ্ডা' গল্পে চারগুন্ডাকে নিয়ে শ্রেণীগত অবস্থান ও প্রতিবাদ চিত্রিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধান কন্যা গল্পে সমাজ সচেতনতার সুরে বর্ণিত হয়েছে- শেখ ফরিদ নামের একজন কৃষক জমি নীলামের ঘটনা। মনে পড়ে তার বাবা শেখ জমির 'দেওয়ান সাবের গালচাপ্পায় একটা থাপড় মেরেছিল' সে তো এক যুগ কেটে গেছে। তার প্রতিশোধ কি এতদিন পরে নিতে চায় জমিদার দেওয়ান!

তহশীলদার কোমরে গামছা বাধা শেখ ফরিদকে দেখেই বলে "কেমন বুঝলে মিয়া? এদিন কইলাম ভালয় ভালয় দেনাডা! চুহাইয়া দেও, গায় গতরে লাগল না। এইবার খোদ মালিকের হুকুম, অহন তেরি বেরি করবা কোনহান দা"? শেখ ফরিদের কণ্ঠে প্রতিবাদ, "খামকা মিছা কতা কইতাছানে আপনে।..... আপনে কোনদিন কন নাই যে বহেয়া না দিলে কোরক আইব। কইলে খাই না খাই মাজনের দেনা দিয়া দিতাম"। পুনরায় তহশীলদার বলে "অহনে এতা কইয়া লাভ নাই। তিন বচছর খাজনা দেও নাই, তাই সই। এবার ফরিদের কণ্ঠে প্রতিবাদ –"তাই সই! কইলেই অইল আর কি। ঠোঁট দু'টো উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।" (পৃ.১৯৩)

পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা তহশীলদারের। সব কথায় কান দিলে চলে না। ষন্ডা মার্কা কয়েকটি লেঠেল তার হুকুমে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল। বুড়িমা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল বারান্দায়। 'আমার বাছারে কি অইব গো। আমি কই খাইয়াম গো। ও 'মাগো'। এর মধ্যেই লেঠেলরা বড়ো চৌকিটা বের করেছে। 'কাফিলা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা গাইয়ের দড়িটা খুলছে একজন'। শেখ ফরিদের দেহে প্রচন্ড উত্তেজনা। "কানের দুপাশ দিয়ে গরম ছুটছে। একটা দুনির্বার ঘৃণার দমকা হাওয়া ছুটে এসে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে মন প্রাণ। অস্ফুট যাতনায় চেঁচিয়ে উঠে সে ঘরের দিকে ছুটল, চোখজোড়া অঙ্গারের মতো জ্বলছে। সাবধান! ফরিদ আবার চেঁচিয়ে ওঠে, কাজলীর গায় হাত দিবানা। বেশি ভালা অইব না কইছি"। এরপর যা হবার তাই হয়েছিল। তহশীলদারের মাথা ফেটে রক্ত বেরুলো গলগল করে। দেওয়ান বাড়ীর কর্মচারীর মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরানো! পরিণতিতে জেলের ঘানি টানতে হলো ফরিদকে।

শোষণ-বৈষম্যের নীরব সাক্ষী শেখ ফরিদ। জীবন তাকে নিয়ে পৈশাচিক খেলা খেলে। জেলের মধ্যেও কোন আইন নেই। মানবতার কোন চিহ্ন নেই। কাজে ঢিল দেওয়ায় জমাদার শাব্বীর খান কাঁধে ডান্ডা মেরেছিল। মনে মনে ডান্ডাটা কেড়ে নিয়ে একটা বাড়ি দিয়ে জমাদারের মাথাটা ভাঙতে চেয়েছিল, এমনকি হাতটা বাড়িয়ে দিয়েও ফিরিয়ে নিয়েছিল একটি কথা মনে পড়ায়। তুমি ফিইরা আও। আর কোন গোলমাল কইরোনা। তোমার পথ চাইয়া থাকুম আমি, তোমারই পথ চাইয়া থাকুম"। গল্পকার আজাদ বৈষম্যের চিত্রের পাশাপাশি মানুষের জীবনের সুন্দর অনুভূতি তথা মানবিক গুণাবলীর চিত্র আঁকতে ভুল করেনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার সাথে মানবিক বোধের বিশেষ করে প্রেম-ভালবাসা, পূর্বপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত আনন্দ বেদনার প্রতিচ্ছবি– প্রতিটি গল্পেই বিশিষ্ট আবেদনে চিত্রিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জেল থেকে ফিরে অবশেষে শেখ ফরিদ আরো করুণ আরো বিষাদময় পরিণতির সম্মুখীন হলো। কনকতারাও ভোলেনি স্মৃতিময় অতীতকে। "গলায় ফাঁস নিয়া মইরা গেল"। কনকতারার কবরের কাছে এসে নাম ধরে ডাকতে থাকল ফরিদ। ..... "মাঠের ওপর দিয়ে পাকা ধান ক্ষেত মাড়িয়ে। সে চিৎকার অনেকদূরে, দিগন্তে জাগাল প্রতিধ্বনি"। এ গল্পে তহশীলদারের বিরুদ্ধে ফরিদের প্রতিবাদ ও সংঘর্ষ, পরিণামে জেল খাটা ও প্রিয়তমা কনকতারার আত্মহত্যা সবই একসূত্রে গাঁথা। এ গল্পে ফরিদ শেখের বাবা-'দেওয়ান সায়েবের' গালে থাপ্পড় মারার ঘটনাও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেয়।

'ছায়ামৃগ' গল্পে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকাশ আছে। ওসমান শ্রেণীগত অবস্থার কারণে সহোদর ভাইকেও স্বীকার করতে নারাজ। স্ত্রী নূরজাহানের কাছে গোপন করতে চায় আসল পরিচয়। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময় থেকে নূরজাহানের সাথে তার পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়। নূরজাহানের বাবা মায়ের মত ছিল না। তারা বাড়ির খবর বা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলো না বিধায় মোটেই পাত্তা দিতো না ওসমানকে। নূরজাহান হাল ছাড়েনি। "পুরানো বাসাটা ছিল জঘন্য রকম। বস্তির ভিতরে আধা-ভাঙা একতলা, চুনকাম নেই, ইট আর সুর্কির গন্ধে টেকা দায়। আর সবচেয়ে অসহ্য, কলতলায় মেয়েদের ঝগড়াঝাটি।" এখন অবশ্য অনেক ভালো অবস্থানে। রেডিওতে স্থায়ী চাকুরী। কলোনীতে বাসা। 'মনের মতো ঘর' মনের মতো বর'এইতো কাম্য ছিল নূরজাহানের। কিন্তু মানুষের অন্তরের সব খবর জানা কঠিন। এমনকি অসম্ভব। কতটুকু জানে নূরজাহান ওসমান সম্পর্কে? ওসমানের গ্রামের বাড়ীর অবস্থা-প্রতিপত্তি সম্পর্কে এ নিয়েই দ্বন্দ্ব বিস্তৃত হয়েছে আলোচ্য গল্পে।

ওসমান নূরজাহানের সুখের সংসারে হঠাৎ একটি পত্রের আবির্ভাব অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন করলো তাদের। পত্রটি লিখেছে ভাবী সম্বোধনে-ওসমানেরই আপন ভাই। সে ভাইয়ের বাসায় থেকে লেখাপড়া করতে চায়। নূরজাহান চিঠি পড়ে জানতে চায় ছেলেটি কে? ওসমান সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে যায়। সত্য গোপন করে বলে–"আর বলো না, আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়েছি। আমাদের পাশের বাড়ীর ছেলেটি। এবারে যখন বাড়ি গিয়েছিলাম ওর মা এসে ধরে পড়লে একটু দয়া কর। ওর বাপের জমিজমা বেচে এতদূর নিয়েছি, এবারে পাশ করেছে, এখন বি.এ পড়তে চায়। তোমার বাসায় যদি থাকতে খেতে দাও, তাহলে"- ।(পৃ.ঐ)

সত্য গোপন! কঠিন সত্য গোপন। সত্য যে কঠিন; কঠিনেরে ভালোবাসতে পারেনি ওসমান। শ্রেণী বৈষম্যকে সে বোঝে। ভাষা আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক আপন ভাই–হাশমতকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি। 'আমি অস্বীকার করেছি রক্তের সম্পর্ককে'। নিজের মনে নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই সমাধান বের করে, নিজের সুখ শান্তির জন্য। নিজের উক্তি –"যাই করেছি, তার জন্যে অবশ্য এতটুকু অনুশোচনা আমার নেই, কেননা আমি শান্তি চাই, সুখ চাই, আমি চাই জীবনটাকে উপভোগ করতে। কারো কারণে সে যতবড়

Dhaka University Institutional Repository

আপনজনই হোক না কেন, তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখলে, সাহসীর মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হয়"। ছাত্র অবস্থায় ওসমানের বাড়ী থেকে মাত্র চল্লিশ টাকা পাঠিয়েছে। বন্ধুর কাছ থেকে ধার দেনা করে, স্যুট ধার করে নূরজাহানের সাথে সাক্ষাত করেছে। ঘড়িটাও হাত সাফাই করে নিতে হয়েছিল। পাঠ্য বই বিক্রি করে ব্লাউজের টাকা যোগাড় করতে হয়েছে। খুব মনে আছে। সদম্ভ স্বগতোক্তি। "এখন চাকরি পেয়েছি, আর সবাই যেন জোঁকের মতো ধরেছে। আমি কারো আত্মীয়তার ধার ধারিনে"। সবাই যেন রাজা, রাজার রাজত্বে। ওসমানও তার নিজ গড়া রাজত্বের বাইরে যেতে পারে না। ভাগ দিতে চায় না নিজের অর্জিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে। বাবা-মায়ের ওজর আপত্তি, আদেশ নিষেধে কান দিতে হবে-এমন কোনো কথা নেই। যদিও বাবার জমি বিক্রি করে তার লেখাপড়ার টাকার যোগান দিতে হয়েছে। শ্রেণী অবস্থানকে কিছুতেই নড়বড়ে করতে চায় না ওসমান। শ্রেণী চরিত্র প্রকট আকার ধারণ করেছে ওসমানের এ উক্তিতে– "সে বাসায় আসার পর হৃদপিন্ডটা একেকবারে ছাৎ করে উঠত বিতৃষ্ণায় : এসেছে, থাকুক। কিন্তু তা'বলে তার অধিকারের সীমা ডিঙিয়ে গেলে চলবে না। ভাই ডাকুক, আপত্তি করবনা; এমনিতেও অনেকেই ডাকে, তবে তা একই পিতৃত্বের সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ালে সহ্য করবনা। তার ছেঁড়া ময়লা পোশাক, আর হাড় গিলার মতো চেহারার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। যদি চায়, বড়জোর একটা পুরনো শার্ট দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু যখন-তখন আলনা থেকে আমার জামা কাপড় নিতে পারবে না। আমার আর তার দাঁড়াবার জমি এক নয়"। (পৃ.১৯৬)

ছোট ভাই হাশমত অনধিকারকে অধিকারের সীমায় নিয়ে যেতে চায়। মুন্সি নূরু মিয়ার হোটেলের খাবার টাকা পরিশোধ করতে তাগিত দিলে হাশমতকে বেরিয়ে যেতে বলে ওসমান। হাশমত অধিকারের সুরে বলে– "তোমার চাকরির টাকায় আমার ভাগ রয়েছে। খানিকক্ষণ চুপ হয়ে থেকে হাশমত অবিকৃত স্বরে বললে, আমি যাব না"। একটা অজানা আশঙ্কা নূরজাহানও ওসমানের পিছু নেয়। দু'জনেই যেন শুন্যের মধ্যে পরস্পরকে আকড়ে ধরে আছে। ছায়ামূর্তির মধ্যে যেন বিলীন হয়ে যায় তারা। এছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনে হাশমতের অংশগ্রহণ, শ্রেণীদ্বন্দ্বকে স্পষ্ট হতে সহায়তা করেছে।

'সুন্দরী, সুন্দরী' গল্পে এক বিধবা মহিলার জীবনসংগ্রামের সাথে কৃষক সমাজের অসহায়তার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। সুন্দরীর স্বামী মারা যাবার পর তাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। কেউবা সুন্দরীকে ভোগ করতে চেয়েছে। যদিও গায়ের রঙ কালো কুচকুচে সুন্দরীর। এ গল্পেও নায়েব-জোতদারদের অত্যাচারের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। শিলাবৃষ্টির কারণে কৃষকরা আকালের বছরে খাজনা দিতে পারেনি। কাছারী থেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মহাজনের পাইক পিয়াদা কৃষকের জমি নিলামে দিয়ে দিলো। সুন্দরীর মনে পড়ে তার বাপ, বাঁশ হাতে নিয়ে মহাজনের লোকজনকে মারতে উদ্যত হয়েছিল, সংখ্যায় ওরা বেশি থাকাতে-বাঁশ দিয়ে বাবার কলজে থেৎলে দিয়েছিল। সুন্দরীর, সে সব ঘটনা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে

Dhaka University Institutional Repository

অনুপ্রাণিত করে। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকের নামে মামলা করেছে নায়েব। কারো কারো জমি দখল করে নিয়েছে জমিদার। কৃষকদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদস্বরূপ কাছারি ঘরে আগুন দেয়া হয়। পুলিশ গ্রামের সাবইকে জিজ্ঞাসা করছে। আয়নদ্দি, শবদ্রালিরা আগুন দেয়ার ঘটনা বলতে গেলে সুন্দরী বাধা দিয়ে-নিজেই সব দোষ স্বীকার করে নেয়।

'সুন্দরী সুন্দরী' গল্পটি আজাদের শ্রেণীদ্বন্দ্ব মূলক গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট। সুন্দরী মূলত: কোন রমণীর কেউ নয়। "আসল নাম ছিল বুবি, গায়ের রং কুচকুচে কালো, তাই বোধ হয়, গ্রামের কোন রসিক পুরুষ তার নাম দিয়েছিল সুন্দরী। তার আসল নাম এই নামের তলায় চাপা পড়েছে অনেকদিন"। সুন্দরী নামের মহিলার সংগ্রামী জীবনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে গল্পের কাহিনী ও পরিণতি। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা সুন্দরীকে নিয়ে তামাশাও কম করেনা। সুন্দরী নামটা ছেলে বুড়ো-অনেকের কাছে রসিকতার বিষয়।

বিয়ের দু'বছরের মধ্যে স্বামী মারা যাবার পর থেকে সুন্দরীর সংগ্রামী জীবন শুরু। এ যেন 'ম্যাক্সিম গোর্কির' মাদার। গ্রামের সেরা লাঠি খেলোয়াড় আফেন্দি বিধবা সুন্দরীকে পেতে চেয়েছিল–অমাবশ্যার রাতে বাঁশের দরজা কেটে ঘরে ঢুকে। আফেন্দি পারেনি। 'সুন্দরীর' ধাক্কায় আফেন্দি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সুন্দরী তাচ্ছিল্যভাবে বলেছিল–"আফিন্দা এই তাকত লইয়াই আইছিলি বুবির কাছে।"

গল্পের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে সুন্দরী। সে ইলামিত্র রাশমনি হাজং, কুমুদিনী হাজংদের মত সাহসী ভূমিকা পালন করছে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কাছারি ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনার পর দারোগা তদন্ত করতে আসলে-আয়নদ্দি-শব্দরালিরা ক'জন ভিড় ঠেলে দারোগার সামনে হাজির। তারা মূল ঘটনা বলতে চায়। কারা আগুন দিয়েছে কাছারি ঘরে, বুড়ি তা বলতে নিষেধ করেছিল। আয়নদ্দি শব্দরালিদের তো এখানে আসার কথা নয়। আয়নদ্দি দারোগার কাছে কি যেন বলতে প্রস্তুত হচ্ছিল। বুড়ির অগ্নিদৃষ্টি আয়নদ্দির ঠোঁট জোড়া থামিয়ে দিল। বুড়ির অনেক মায়া। মা- মাটি মানুষের কাছে অনেক ঋণ তাঁর। সে মরলে ক্ষতি নেই। আয়নদ্দি, শব্দরালিরা মরলে বাচ্চা-কাচ্ছাগুলোকে কে দেখবে? অনেক দায়িত্ব সুন্দরীর। সকলকে অবাক করে দিয়ে আগুন লাগানোর দায়িত্ব স্বীকার করে নেয় সুন্দরী। "দারোগা বাবু! কারোর দোষ নেই। এইড্যা হাচা কতা। সবাইরে আপনে ছাইড়া দ্যান। ভাঁজ পড়া শান্ত মুখটা তুলে ঠান্ডা গলায় সুন্দরী বলল, আগুন আমিই লাগাইছিলাম"। বুড়ি সুন্দরীর হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে। পুলিশ হাতকড়া এগিয়ে নিল। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুন্দরী বুড়ি সম্পর্কে খালেদা হানুমের মন্তব্য-প্রণিধানযোগ্য– "গল্পের আসল আবেদনটি সৃষ্টি হয়েছে গল্পের শেষাংশে যেখানে সরকারী কাছারি ঘরে যারা আগুন লাগিয়েছিল সেই বিপ্লবী ছেলেদের দায় ভার সে নিজেই বহন করল। সুন্দরী ভেবেছে তাদের জীবনে আছে সম্ভাবনা নতুন পথ চলার স্বপ্ন। সুন্দরীর নিজের কেউ নেই কিন্তু এই স্বজনহীনারও আছে স্বদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম। জরাভারাক্রান্ত জীবন সে উৎসর্গ করল, কারণ মাতৃভূমিকে সে ভালবাসে 'মাদারের' মতই। কোন বিশেষ দর্শনতত্ত্ব তাকে এই অনুপ্রেরণা দেয়নি। সহজ বুদ্ধি আর সহমর্মিতাই তাকে দান করেছিল এই ত্যাগের দীক্ষা। সে বুঝতে পেরেছিল তার জীবন দিয়ে যাদের রক্ষা করল একদিন দেশ মাতৃকার বৃহত্তর কর্মকান্ডে সে জীবন নিয়োজিত হবে। গল্পের করুণ সুরের মধ্যেও বীর রসের এই ধ্বনি প্রবহমান।"[৫]

'সৃষ্টি' গল্পে মাহমুদ পন্ডিত নামের জনৈক পাঠশালার শিক্ষকের সংগ্রামী জীবনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠশালার চেহারা খুবই সঙ্গীন। ডাল পালার সাথে তিনটা বাঁশ বেঁধে মাচান বানিয়ে বিদ্যার্থীদের বসার ব্যবস্থা। চেয়ার একটাও নেই। মাহমুদ পন্ডিতের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় রাগ রাগ ভাব। কারো উপর যেন রাগ করে আছে। লম্বা, হাড় বেরুনো চেহারা তাঁর। পাঁচটি ছেলের মধ্যে কাউকে লেখাপড়া তেমন শেখাতে পারেনি। ইদানিং সংসারের টানা পোড়েনে-মাহমুদ পন্ডিতের শরীরে ক্লান্তির ছাপ। ক' বছর আগে কোন আফসোস না থাকলেও এখন যেন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বয়স তো আর কম হয়নি। ষাট পেরিয়ে গেছে।

অনেক স্বপ্ন ছিল মাহমুদ পন্ডিতের। বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে সব তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে গেছে। প্রিয় ছাত্র-শাহজাদা ওরফে শাহুর মধ্যেই খুঁজে পেতে চায় সেই আদর্শের আলো। শেষপর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে আন্দোলন সংগ্রামের ডাক আসে। শুভাকাঙ্খী প্রাণনাথ মন্ডল চিঠিতে লিখেছেন,– "আমাদের অঞ্চলের প্রাইমারী ইস্কুলগুলি দিন দিন বন্ধ হইয়া যাইতেছে, ঘর নাই, ছাত্র নাই, শিক্ষক নাই। তবু এখনও যাহা কিছু আছে, শুনিতেছি আইন করিয়া সেগুলি চিরতরে বন্ধ করিয়া দেবার ব্যবস্থা হইতেছে। একেতো দেশে শিক্ষা বলিতে কিছু নাই, তাহার উপর প্রাইমারী ইস্কুলগুলিও বন্ধ করিয়া দিলে আমাদের দুর্দশার সীমা থাকিবে না, আপনি সুস্থ চিত্তে ভাবিয়া দেখুন। প্রতিবাদের জন্য এ অঞ্চলের শিক্ষকদিগকে নিয়া একটা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। আশা করি, আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকিবেন"। "মাহমুদ পন্ডিত এমন সংগ্রামের অপেক্ষায় ছিলেন। মনে মনে ভাবছেন আর আর জিজ্ঞাসার সুরে বলছেন –"থাকব না কেন? কার ভয়ে থাকব না? দেশটারে ছারখার করে ফেলছে স্বার্থান্বেষীর দল!" সমাজের ওই স্বার্থান্বেষীদের একজন কাশেমালী চৌধুরী।' মাথায় জিন্নাহ টুপি 'বুক পকেটে সোনার শিকল লাগানো চকচকে ঘড়ি'। বাইরে মহাত্মার ভাব দেখালেও চোরাকারবারে লাল হয়ে গেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য সে।

---

৩. বাংলাদেশের ছোট গল্প। প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারী-১৯৯৭ ঢাকা। পৃষ্ঠা- ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

গল্পকার-কাশেমালী চৌধুরীর চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন- "ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগিরি করেছেন তিনি বৎসর যাবৎ। সবাই তাঁকে প্রেসিডেন্ট করবার জন্য উদগ্রীব হলেও তিনি নাকি প্রত্যেকবারেই সবিনয় হাস্যে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, কী চালাক লোকটা। এবার তিনি জেলা বোর্ড নির্বাচনে সদস্য হওয়ার জন্য দাঁড়াবেন, কারণ জনসেবাই তাঁর জীবনের ব্রত। গদীর জন্যে তিনি মোটেই লালায়িত নন, কেবল দশজনের চাপে পড়েই-কী, চালবাজ লোকটা"।

চালবাজরাই সমাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। এ প্রসঙ্গে জীবনান্দদাশের অদ্ভুৎ আধার এসেছে পৃথীবিতে আজ কবিতার কথা মনে আছে। এদের সুপরামর্শ ছাড়া রাষ্ট্র অচল। মাহমুদ পন্ডিতের আদর্শ স্বপ্নের কোন মূল্য নেই ওদের কাছে। ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এরই ধারাবাহিকতায় কাশেমালী চৌধুরীর কারখানা করা খেয়াল জাগে। খুটিতে বাধা বলদজোড়ার গেরো খুলতে লাগলেন ' ভুতে পাওয়া মানুষের মতো।' কাশেমালীর উক্তি- "কেপন্ডিত মিঞা নাকি? থাক্ থাক্ আপনার কষ্ট করতে হবে না"। (পৃ. ২০৫)

ঠাট্টা তামাশায় পন্ডিতের গা জ্বলে গেল। ঘৃনা ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইল, "শয়তানির আর জায়গা পেলেন না? শেষপর্যন্ত থাবা দিয়েছেন ইস্কুল ঘরের উপর। দুনিয়া ঘোরে কোন তালে টাকার গরমে বুঝতে পারেন না বুঝি?" কাশেমালীর কন্ঠে – "সাবধান! মুখ সামলে কথা বলো।" মাহমুদ পন্ডিতের প্রতিবাদ "রাখ। তোমার ধমকানিতে কেউ ডরায় না। সরকারেরও সাধ্য নেই ইস্কুল ঘরের ওপর হাত দেয়, আর তুমি কোন খানের জমিদার? ইস্কুল ঘরে গরু...।

পন্ডিত একটা গরু খুলে তাড়িয়ে দিতে আরেকটা দড়িতে হাত দিলেন। "কিন্তু দড়ি খোলা হল না। প্রথমে একটা শব্দ তারপর আর্তনাদ।" গ্রামের সব লোক। সমেবত হলো পন্ডিতের উঠানে। সকলের মনে বিষয়টা গভীরভাবে দাগ দিয়ে গেল। প্রচন্ড আঘাতে মুষড়ে গেলেও মাহমুদ পন্ডিতের কন্ঠে প্রতিশোধের ইচ্ছা-" আমায় ছেড়ে দে। আমি উঠবো। দেখে নেব একবার। এক একবার চিৎকার করে ওঠেন বালিশ ভিজে গেছে রক্তে....। "সমস্ত দেহ নিঃসাড়। বুকটা শুধু ধুক্ ধুক্ করছে।" সুন্দরের স্বাধ, সত্য ন্যায়- কল্যাণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে- ঠোটজোঁড়া কেঁপে অস্ফুট স্বরে-বেরিয়ে আসল, –"তুই এলি? এলি? এলি তুই শাহ্- শাহজাদা? ..... করিম, বজলু, সুজয়, শিশির তোরা আমার চোখের মনি, বুকের বল। আমি জানি তোরা না এসে পারিস না। আমি তোদের কত ভালবাসি।" (পৃ. ঐ)

মৃত্যু মুখে পতিত হয়েও অভয় বাণী শোনাচ্ছেন মাহমুদ পন্ডিত তাঁর প্রাণ প্রিয় ছাত্রদের। যাদের মাধ্যমে তিনি সমাজের বৈষম্য দূর করে সত্য সাম্যের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন। নিজের রক্ত দেখিয়ে বীরের মতো উক্তি করেছেন, "তাহলে এই দেখ- রক্ত, ওই বদমাশটারে আমি খুন করেছি। তোদের জন্য, খুন করেছি। একটা বুকভাঙ্গা চিৎকার"। সংশপ্তকের মতো

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীশত্রুকে খতম করার দৃঢ় অঙ্গীকার তাঁর কণ্ঠে। অনাগত দিনের জন্য মাহমুদ পন্ডিতের আরোৎসর্গ। শেষ মুহূর্তেও সে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। হাসতে হাসতে অদ্ভুত গলায়' মাহমুদ পন্ডিত বললেন, "কিন্তু এখানে বড় বেদনা। আমার বেদনা তোমাদের বেদনা হয়ে উঠুক এই আমি চাই। আর কিছু না"। এভাবে সংগ্রামী চেতনায় আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে গল্পের শেষে। গল্পকার শৈল্পিকভাবে সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন ছোটগল্পের ছোট পরিসরে। এ যেন বিন্দুর মাঝে সিন্ধুর ব্যাপ্তি।

এ সত্যকে স্বীকার করেছেন- খালেদা হানুম-"'সৃষ্টিতে' আছে সেই যুগ মানসের প্রতিধ্বনিঃ চিরকাল বুর্জোয়া কাশেমালী চৌধুরী শোষণনীতি প্রবর্তন করে আর মাহমুদ পন্ডিত অবিচল প্রতিজ্ঞায় অনঢ় থাকেন তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, চারিত্রিক মর্যাদা ও কর্মের সাধনাকে বাস্তবায়িত করতে। এ দার্ঢ্য অহঙ্কারের নয়, দৃঢ় প্রত্যয়ের, সততার এবং মানব মহিমারও"।[৬]

আলাউদ্দিন আল আজাদ সমাজ সচেতন প্রতিবাদী গল্পকার। উপরতলার কাঠমোর সাথে গাছতলার কাঠামোর একটা সংগ্রাম তিনি ছোট গল্পের ছাঁচে ফেলে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ভাবিত করেছেন। তিনি শ্রেণী সংগ্রামকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন ছোট গল্পে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ গল্পের অন্যান্য অনুসঙ্গের সাথে একাকার হয়ে নান্দনিক আবেদন নিয়ে মিশে আছে। তাঁর নিজের অভিপ্রায় এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। "আমার প্রথম গল্পটি একজন ক্ষেত মজুরের গল্প, যে প্রাণাধিক পুত্রকে হারিয়ে পাগল হয়ে গেছে।.... এর কারণ ছিল নিশ্চিতই, ছোটবেলা থেকেই আমার জীবন ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য। সতেরো বছর বয়সে প্রকাশিত আমার প্রথম গল্প গ্রন্থ 'জেগে আছি'র' গল্পগুলোতে যে শ্রেণীযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি তারও একই কারণ, আমার সাহিত্য আমার অভিজ্ঞতা ও আত্মচরিত"।[৭]

আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেন সাহিত্যিক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-

"জেগে আছি" সাম্প্রতিক মুসলিম সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ এবং সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা বই। আশ্চর্য স্টাইল আলাউদ্দিন আল আজাদের তির্যক, বলিষ্ঠ, আবেগময়। কাবিনীর মানুষগুলির সাথে তার পরিচয় তাঁ জীবন্ত, তাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ। জনসাধারনের সংগ্রাম তাঁর উপজীব হলেও ঘটনাকেই তিনি একান্ত করে দেখেন নি, কুশলী শিল্পীর মত তাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।"[৮]

---

৬. বাংলাদেশের ছোট গল্প। প্রকাশকাল-১৯৮৭ এ্যাভন পাবলিকেশন, ঢাকা। পৃষ্ঠা-২২১

৭. নিবেদন, শেষ্ঠগল্প, (প্রথম সং-১৯৮৭) পৃ. ৯-১০

৮. "দৈনিক সত্যযুগ, ১২জুন ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

হাসান আজিজুল হক (জন্ম ১৯৩৯)

হাসান আজিজুল হক জন্মগ্রহণ করেন ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ সালে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার যব গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ দোয়া বখশ। ১৯৫৪ সালে যবগ্রাম সরকারী কালীশ্বরী- হাইস্কুল থেকে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৫ সালে দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পরে তিনি দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পড়ার উদ্দেশ্যে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৫৮ সালে। তিনি ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি রাজশাহী সিটি কলেজ, সিরাজগঞ্জ কলেজ, খুলনা গার্লস কলেজ ও দৌলতপুর বি. এল কলেজে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

হাসান আজিজুল হকের সাহিত্যজীবন শুরু হয় গল্প লেখার মাধ্যমে। তিনি গল্পকার হিসেবেই বেশী পরিচিত। গল্প ছাড়াও যেসব বিষয়ে তাঁর রচনা রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ছোটগল্প গ্রন্থ ঃ সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য (১৯৬৪); আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭); জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩); নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫); পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১) আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৮); রোদে যাবো (১৯৯৫); মা-মেয়ের সংসার (১৯৯৭); নির্বাচিত গল্প (১৯৮৭); রাঢ়বঙ্গের গল্প (১৯৯১); হাসান আজিজুল হকের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯৫)।

উপন্যাস বৃত্তায়ন (১৯৯১)।

প্রবন্ধ ঃ কথা সাহিত্যের কথকতা (১৯৮১); অপ্রকাশের ভার (১৯৮৮);

শিশুতোষ রচনাঃ লাল ঘোড়া আমি (১৯৮৪);

ফুটবল থেকে সাবধান (১৯৯৮)।

গবেষণা ঃ সক্রেটিস।

ব্যক্তিগত রচনাঃ চালচিত্রের খুঁটিনাটি।

নাটক ঃ চন্দর কোথায় (ভাষান্তরিত)

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক রচনাঃ করতলে ছিন্নমাথা।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ-হাসান আজিজুল বেশ কিছু পুরস্কার অর্জন করেছেন। সেগুলো হলো-

আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭); বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭০) লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩); আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩); অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩); অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৯৮৪); ফিলিপ্স পুরস্কার (১৯৮৮)।

হাসান আজিজুল হক শ্রেণীসচেতন গল্পকার। তাঁর গল্পে চেতনাপ্রবাহ রীতি প্রাধান্য পেয়েছে। গবেষণার কালসীমার মধ্যে যে সব গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে- সে গুলো- 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'শকুন', 'আমৃত্যু, আজীবন', 'পরবাসী', 'খাঁচা'। এই গল্প গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

'আত্মজাও একটি করবী গাছ' গল্পে করবী গাছের রূপকে গল্পকার যে দিকটির ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটা হলো ভারত বর্ষের বিভাজন ও পাকিস্তান-ভারত দু'টো রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। ব্রিটিশরা খুব কৌশলে ধর্মের বিষবৃক্ষ রোপন করেছিলেন। এ বিষবৃক্ষ থেকে জন্ম নিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কংগ্রেস ও লীগের কর্তাব্যক্তিদের উস্কানি ও স্বার্থান্ধতা এ বিষবৃক্ষকে বেড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে এক বৃদ্ধের জীবনের সীমাহীন দুর্দশা ও অনিশ্চয়তা চিত্রিত হয়েছে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে। দাঙ্গাকবলিত ভারতের এক জনপদ থেকে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে আসা ও নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধের পারিবারিক জীবনের অভাব-অনটনের চিত্র জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে ছোটগল্পের পটভূমিকায়। বৃদ্ধটি হাঁপানির রুগী। সাত পুরুষের ভিটা ছেড়ে নিরাপদ জীবনের সন্ধানে গঞ্জের পাশাপাশি এলাকায় নতুন করে বসতি স্থাপন করল। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের বৃদ্ধটিক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা-জর্জরিত এলাকায় এসে নিজের অজান্তেই দুর্যোগের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে। এ এলাকার পরিবেশ খুব নোংরা। গল্পকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইনাম, ফেকু ও সুহাসের আলাপচারিতাকে তুলে ধরেছেন। নিম্নমানের কথোপকথন গল্পের অনেক জায়গা জুড়ে রয়েছে।

সুহাসের উক্তিতে আরো কদর্যতার প্রকাশ ঘটে। তার মামীর বোনগুলো নাকি দেখতে খুব সুন্দর। এ জন্য সে ঘন ঘন তাদের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। তাদের সম্ভোগ করতে পয়সা লাগেনা এটাই যেন তার কৃতিত্ব। অশ্লীল কথাবার্তার উল্লেখ করে গল্পকার সমাজের প্রকৃত অবস্থাকে দেখাতে চেয়েছেন। বুঝাতে চেয়েছেন রাজনৈতিক অন্তসারশূন্যতা। বিশেষ করে যারা শ্রেণীদ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে যারা দেশের চালিকা শক্তিতে অধিষ্ঠিত তারাই তো এসবের পিছনে ইন্ধন যোগায়।

হীন বাসনা চরিতার্থতার জন্য ইনাম, ফেকু, সুহাস যাচ্ছে বৃদ্ধের যুবতি কন্যা রুকুর সান্নিধ্যে। যেতে যেতে তাদের মধ্যে নানান বিষয়ের আলাপচারিতা স্পষ্ট করে তুলেছে সমাজ জীবনের অধ:পতনকে। মনে হচ্ছে সুন্দর মানবিক, উন্নত জীবন-যাপনের সুযোগই পায়নি তারা। কেন তারা নষ্ট হল? ফেকু কেন পকেট মারায় অভ্যস্ত হলো? এ দায় কি শুধু তাদের? না গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাই এর জন্য

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী। ফেকুর মধ্যে যে অনুশোচনা নেই তা নয়। সে তো মানুষ। তার কি ইচ্ছা হয় না মানুষের মতো বেঁচে থাকতে। অবশ্যই আছে সে ইচ্ছা। আর তাইতো নিজের ব্যর্থতাকে অকপটে বলে-যাচ্ছে বন্ধু মহলে–"কেন তার জীবন নষ্ট হোল, কে কে নষ্ট করল, আর পকেট মারার কৌশল, তার নিজস্ব নৈপুন্য, সাফল্য এবং পিটুনি খাওয়ার অভিজ্ঞতা বলেই যেতে লাগল। 'করবটা কি কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি না হয়–। লেখা পড়ার মুহি পেচ্ছাপ-ইনাম বলল'। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি-ফেকু ভেবে চিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়িয়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোয়ানে, জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি– কি কলাডা করবানে"?[১]

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য বৃদ্ধ নিজের মেয়ে রুকুকে বখে যাওয়া ছোকরাদের হাতে তুলে দেয়। রুকু অবশ্য প্রথম দিকে সম্মতি দেয়নি। পরে সয়ে গেছে। শাড়ীর যোগান দেয় তারা। মাথা পিছু দু'টাকা রেটের খরিদ্দার তারা। বৃদ্ধ অবশ্য আড়াল করার চেষ্টা করে-টাকা নিচ্ছেন ধার করে। সুযোগ বুঝে শোধ করবে বলে। বৃদ্ধ ওদের আগমনে খুশি হয়ে ওঠে।..... বৃদ্ধের উক্তি-"তারপর কি খবর? অ্যা? সব ভালো তো? এই তোমরা এক আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজ খবর নাও। সময় অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা, আমার পরিবার তোমাদের কথা বলতে অজ্ঞান। তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হোত এই জংগুলে জায়গায়-বুড়ো বলছে, বাড়ির বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমাদের কম্ম-হ্যাঃ। ও তোমরা জানো। .... সুহাসের চাদরের মধ্যে নোট খড় মড় করে-সেগুলো, ফেকু নিজের পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে-দলা পাকায়, ভাবে, ভয় পায়, শেষে বুড়োর দিকে ঝুঁকে পড়ে, সুহাস আর আমি দিচ্ছি। ..... তোমরা দিচ্ছ, তুমি আর সুহাস? দাও। আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে। কবেই বা শুধতে পারব এসব টাকা।"(পৃ.১৩৫)

এটুকু সঙ্কোচ বা সৌজন্য বৃদ্ধের না করলেই নয়। কিন্তু সেতো রুকুর বাবা। বিবেক তার এখনও আছে। বিবেকের দংশনে সে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। হৃদয়ের হাহাকারকে একাকার করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন করবী গাছ লাগানোর আড়ালে কঠিন এক পরিনতিটি অপেক্ষা করছে। পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় আগমন করে নিজের হাতে একটা করবী গাছ লাগিয়েছিলো-করবী ফুলের বিচি থেকে বিষ পাবার আশায়। বৃদ্ধ বিষজ্বালা থেকে মুক্তি পায়নি। নিজের হাতে লাগানো বিষকেই গলাধঃকরণ করতে হয়েছে তার। নিজের মেয়েকে গুন্ডাদের হাতে তুলে দেয়া কি বিষ পান করার চেয়ে কম? বৃদ্ধের জীবনের করুণ পরিনতির বর্ণনা গল্পকার এভাবে দিয়েছেন। "আমি যখন এখানে এলাম, সে গল্প করেই যাচ্ছে, আমি যখন এখানে এলাম। তার এখানে আসার কথা কিছুতেই ফুরোচ্ছে না-সারা রাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম-আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই-তখন হু হু করে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ীর শব্দ আর অনুভবে নিটোল সোনারঙের দেহ- সুহাস হাসছে হি হি হি- আমি একটি করবী গাছ লাগাই বুঝলে"। ..... (পৃ.১৩৬)

১। হাসান আজিজুল হক; রচনাসংগ্রহ- (প্রথম খণ্ড) প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারী-২০০১। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন; ঢাকা। (পৃ.১৩২)

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পে শ্রেণী চেতনার প্রকাশ পেয়েছে-পকেটমার ফেকুর খেদোক্তিতে-'করবটা কি কতি পারিস'? ..... লেখাপড়ার মুহি পেচ্ছাব। কাজ কোঁয়ানে, জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি-কিকলাডা করবানে'? তাছাড়া- বৃদ্ধের স্বগতোক্তিতে অসহায়তার করুণ আর্তি শ্রেণীদ্বন্দ্বকে ইঙ্গিত করে।

'শকুন' গল্পের কাহিনী শুরু হয়েছে কয়েকটি ছেলের-একটা শকুন ধরাকে কেন্দ্র করে। ভাগাড়ের পাশে শবদেহের পচা মাংস খেয়ে শকুনটা ধুকচে। জামু-রফিকসহ ক'জন মিলে শকুনটাকে তাড়িয়ে ক্লান্ত -শ্রান্ত করে ধরে ফেলল। শকুনটা হাপিয়ে উঠেছে। সবাই মিলে উঁচু-নিচু জমির উপর দিয়ে, শেয়াকুল আর সাঁইবাবলার বনে, পগারে দৌড়াদৌড়ি করে শকুনটাকে ধরতে পেরেছে। এদিকে আবার শকুনের গা থেকে পচা গন্ধ বেরুচ্ছে। তারা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শকুনটার পালক ছিড়ে ফেলল। অনেক ধস্তাধস্তি ও নির্যাতনের পরে শকুনটা মারা গেল। পরদিন সকালে ওরা দেখতে পেল শকুনটা মরে পা দুটো উপরের দিকে গুটিয়ে আছে। মরা শকুনটার পাশে রয়েছে অধস্ফুট একটা মানব শিশু। শিশুটির খবর পাড়ায় রটে গেল। সবাই দেখতে আসলে ভিড় জমে গেল। সবাই জানতে পারল-এই শিশুটার জন্ম সম্পর্কে। গল্পের শেষে কাদু শেখের বিধবাবোনের অসুস্থ ফ্যাকাশে চেহারায় উপস্থাপন-সামাজিক অনাচার অসঙ্গতিকে নির্দেশ করে।

হাসান আজিজুল হকের 'শকুন' গল্পটি তৎকালীন সমাজের শ্রেণীদ্বান্দ্বিক অবস্থার ইঙ্গিত দান করে। শকুনের মৃতদেহের পাশে মানব শিশুর মৃতদেহ আর্থ-সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও অব্যবস্থপনাকে দায়ী করে। গল্পের বিষয়বস্তুতে দেখা যায় গ্রামের কয়েকটা ছেলে মিলে একটা শকুনি মেরে ফেলে রাখে। শকুনিটার শরীর থেকে সমস্ত পালক ছিড়ে কুৎসিত বস্তুতে পরিণত করে। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ছেলেগুলো বাড়ী ফেরার পথে তাল গাছ ও নেড়া বেলগাছের আবছা ছায়ায় সাদা মতো কি যেন আবিষ্কার করল। সেটা অন্য কিছু নয়।-কাদু শ্যাখের রাঁঢ় বোনের সাথে জমিরুদ্দির অবৈধ যৌনমিলনের ফসল-অপূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর অস্তিত্ব। এক পর্যায়ে বিষয়টি গ্রামের অনেকেই জেনে যায় এবং শিশুটির পাশে জড় হয়। গল্পকার মানব শিশুটার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-"দিনের চড়া আলোয় তাকে অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মরা শকুনটার মতই"। মানব শিশুর ভাগ্য-ভাগাড়ে, তাও আবার অবৈধ যৌন মিলনের ফসল। সমাজ কিভাবে মেনে নেবে? তাই বলে কি বেঁচে থাকার অধিকার নেই শিশুটার? অধিকার থাকলে কি অপূর্ণ অবস্থায় শকুনির মতো পরিণতি হয়? যৌনাকাঙ্খা ও চরিতার্থতার অসম অবস্থাকে চিত্রিত করে-লেখক শ্রেণীগত দুরবস্থা ও নিয়ন্ত্রণহীন সামাজিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন-শকুনীর মৃত দেহের উপস্থিতিতে। গল্প থেকে উদাহরণ দেয়া যায়-

"ন্যাড়া বেলতলার একটু দূরে প্রায় সকলের চোখের সামনেই গতরাতের শকুনিটা মরে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বমি করেছে। কত বড় লাগছে তাকে। কত শূন্য, কত ফাঁকা-ঠোটের পাশ দিয়ে খড়ের টুকরো বেরিয়ে আছে। .... মরা শকুনিটার কাছে পড়ে রয়েছে অর্ধোস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনির দল। চিৎকার করতে করতে উন্মত্তের মত"। (পৃ.২১)

Dhaka University Institutional Repository

এ গল্পে শকুনের উপস্থিতি-অত্যাচার ও নির্যাতনকে ইঙ্গিত করে। কয়েকজন বালকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠায় 'শকুন' নামের রূপকে শোষকের মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর শকুন রূপি শোষকের কদাকার চেহারা–অত্যাচারের প্রতি ঘৃনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বালকদের জিজ্ঞাসা-শকুনকে প্রথম দেখে 'মোল্লা' না 'মোড়ল'-বাক্যের মধ্যে গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে। কারণ সমাজের শাসক ওই মোল্লা মোড়লদের রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন দায়-দায়িত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নেই। নেই তাদের সম্মান। তারা শকুনের মত লোভী। শকুনটাকে নাড়া চাড়া করে এক পর্যায়ে অত্যাচারী শোষক হামবু-র বাবা ও সুদখোর অঘোর বোষ্টমের সাদৃশ্য বিচার, সমাজের শোষক-শাসক শ্রেণীর সাথে শকুনটার জ্ঞাতিত্ব প্রমাণ করে। 'শকুন' প্রতীক ধর্মী গল্প হিশাবেও আলোচিত।

কালের দিক থেকে -'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' (১৯৬৪) গল্প গ্রন্থটি আইয়ুব খানের শাসনের সময় প্রকাশিত। একদিকে আইয়ুবী শাসনের তথাকথিত জৌলুস প্রদর্শন অন্যদিকে জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ প্রকাশ, অত্যাচার নির্যাতন, দারিদ্র, হতাশায় জন মানুষের হাহাকারে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস ভারী হতে থাকে। সমাজ ও শ্রেণী সচেতন গল্পকার হাসান আজিজুল হক-সেদিকটায় দৃষ্টি রেখে গল্প রচনা করেছেন। তৎকালীন পাকিস্তানের রুগ্ন চেহারা অবক্ষয় ও গ্লানির মধ্য দিয়ে মানুষকে কিভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হয়েছে-জীবন কিভাবে পদদলিত হয়েছে-স্বৈর শাসকের দাম্ভিক পদভারে, খুব নিকট থেকে গল্পকার সে সব প্রসঙ্গ গল্পে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গল্পে 'বাসেদ' নামের একটি চরিত্র আছে। তাকে জারজ সন্তান নামেই জানে সমাজের লোক। যে সমাজে স্বপ্ন প্রত্যাশা কেবল হতাশায় পর্যবসিত হয়; যেখানে কোন নিশ্চয়তা নেই সুন্দর জীবন যাপনের;-সেখানে যৌন কামনা বাসনার চরিতার্থতাও সোজা পথে হয় না। পেটের ক্ষুধার সাথে যৌনক্ষুধার তাড়নায় 'বাসেদ' নষ্ট পথে 'সখি' নামের মেয়েটির সাথে শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু তার কি শক্তি আছে-অবক্ষয়ের স্রোতে টিকে থাকার? না শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। গল্পকার দেখিয়েছেন তার অপমৃত্যু! বাসনার অচরিতার্থতা! জীবনের অপূর্ণতা।

দ্বন্দ্বের চিত্র আরো পাওয়া যায়- ছেলেদের কথাবার্তায়। -"জামু বলল, সব শালোর হাঁফানির ব্যয়রাম। ওরে শালা, পালাইতে চাও, শালা শিকুনি, শালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম। অঘোর বোষ্টমের চেহারার কথা মনে পড়তে হা হা করে হেনে উঠল সবাই" ।(পৃ.১৮) শকুনের ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থার মাঝে সুদখোরদের প্রসঙ্গ উপস্থাপন ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটেছে নি:সন্দেহে।

গল্পের শেষের বর্ণনা আরো গভীর তাৎপর্য ব্যক্ত করে- "ডানা ঝামড়ে, চিৎ হয়ে পা দুটো ওপরের দিকে গুটিয়ে সে পড়ে আছে। দলে দলে আরও শকুন নামছে তার পাশেই। কিন্তু শকুন শকুনের মাসংস খায় না। মরা শকুনটার পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনের দল। চিৎকার করতে করতে। উম্মতের মত। আশে পাশের বাড়িগুলি থেকে মানুষ ডেকে আনছে মৃত শিশুটি" । (পৃ.২১)

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীদ্বন্দ্বের আরেকটি চিত্র শকুন ধরা ছেলেদের কথাবার্তার মধ্যে ধরা দিয়েছে-"লাভ, তোকে দেখে লোব-ভুতো শিকুনি; তোর গায়ে গন্ধ, তু ভাগাড়ে মরা গরু খাস, কুকুরের সাথে ছেঁড়াছিঁড়ি করিস-তোকে দেখে রাগ লাগে ক্যানে? ছেলেদের কথায় শকুনটাকে দেখে তাদের রাগ লাগে, মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনের খাদ্য, তাদের পোশাক যেন ওর গায়ের গন্ধভরা নোংরা পালকের মত"। (পৃ.১৮)

আরো প্রকট হয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি এসেছে এভাবে-"সুদখোর মাহজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন। কেন মনে হয় শকুনটার বদহজম হয়েছে"।(পৃ.ঐ)

'আমৃত্যু-আজীবন' গল্পের কাহিনীতে আছে গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া কৃষকদের অভাব অনটন ও বিপদ আপদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। করমালি একজন কৃষক। নিজস্ব সামান্য জমি আছে করমালির। স্ত্রী ও ছেলে রহমালিকে নিয়ে তার সংসার। জমি ভাগে নিয়ে চাষ করে ছেলে রহমালিকে নিয়ে। হালের বলদ একটা হঠাৎ মারা যায়। আশঙ্কা, ভয় গ্রাস করে করমালির পরিবারকে। বলদ মারা গেল! কি দিয়ে চাষাবাদ করবে? জমির মালিকতো জমি দেবে না আর। করমালির দু:খ ভারাক্রান্ত করুণ অবস্থা দেখে প্রথমে ছেলে রহমালি বলে আমি একপাশে থেকে লাঙ্গল টানবো একটা গরুতো আছে; তারপর করমালির স্ত্রীও অভয় দিয়ে করমালিকে বলে– 'আমারে দিয়ে হয় না'? অর্থাৎ স্ত্রীও এগিয়ে আসে বলদের অভাব পূরণ করতে। তারপর গল্পে সর্পরূপী এক অশুভ শোষকের অস্থিত্ব সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষনে ওই গোখরা সাপটি করমালিদের পূর্বপুরুষের জীবনব্যাপী ছিলো, এখনও আছে। ওই অশুভ শক্তির সাথে সংগ্রাম করে করমালিদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। আমৃত্যু-আজীবন সংগ্রামশীলতাকে চেতনার রঙে রঞ্জিত হতে দেখা যায় এ গল্পে।

এ গল্পে প্রতীকের আশ্রয়ে করমালি ও রহমালির জীবন যাপনের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রাম বাংলার কৃষিনির্ভর জীবনের সাথে মিশে আছে আশা নিরাশাকে ঘিরে অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাত। অন্ত্যজ জীবনের সংস্কার গ্রাস করে জীবনের অমিত সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধি। এ গল্পে চেতনা প্রবাহের রীতিতে কিছু কুসংস্কারের উল্লেখপূর্বক শ্রেণী সংগ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্পদর্শন ও সর্পটিকে মারার জন্য গ্রামের লোকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, করমালির কোদালের আঘাতে সাপের লেজের কিয়দংশ কেটে যাওয়া শ্রেণীসংগ্রামের ইঙ্গিতবহ।

করমালির বেঁচে থাকার সংগ্রামে তার হৃষ্টপুষ্ট 'ধলা' নামের গরুটা মুখ্য ভূমিকা পালন করত। গরুটার আকস্মিক মৃত্যুতে করমালির সংসারে নেমে আসে দারুণ বিপর্যয়। সেই সাথে উল্লেখিত হয়েছে-'বিল'কে কেন্দ্র করে কিছু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উত্থান-পতনের চিত্র। এ উত্থান-পতনের মূলে রয়েছে যে রাষ্ট্র শক্তি তা করমালিরা কুসংস্কারের ঘোরে স্পষ্টভাবে জানতে পারে না। তবে নিজের সংগ্রাম ও পরিশ্রম করমালিকে চেতনা প্রবাহের স্রোতে ঋজু করেছে। এখানে গোখরো সাপের রূপকে শোষক শ্রেণী

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের জান-মাল কিভাবে গ্রাস করছে তার বর্ণনা আছে। "এইভাবে করমালি নিমেষে আবৃত হলো তার সংসার সাধ বাসনাসহ। তার ফনার নিচে বলশালী অন্ধকারের দাঁত কড়মড় করে ওঠে এবং গ্রামের মানুষের ভেঙে পড়া, ঘুণধরা অথচ ঈশ্বরের মত অমোঘ সংগ্রামকে গ্রহণ করে এবং মুহূর্তে চিবিয়ে যেন গুঁড়ো করে ফেলে। গোখরো তারপর হঠাৎ কাছে এলো। করমালি কোদালের হাতলে হাত রেখে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু সে আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে গম্ভীর নির্ভয় রাজকীয় শালীনতার সঙ্গে চষাজমির ওপর দিয়ে আলটার কোলঘেষে, সামান্য পানিতে অঙ্গ ডুবিয়ে..... অদৃশ্য হলো"। (পৃ.১৮৯-৯০)

যুগ যুগ ধরে বংশ পরমপরায় করমালি-রহমালিদের জীবন প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকে। শ্রেণীগতভাবে বিত্তশালীরাও শোষণ-বঞ্চনার পরিকল্পিত ফাঁদে তাদের আটকে রাখে। মানুষেরা পরাজয় মেনে নেবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। মানুষের সংগ্রাম চলবেই কালের অমোঘ নিয়মে। কখনো হয়তো শ্রেণীগত ব্যবধান দূর হবে। করমালির ব্যথিত আশাহত হৃদয়ের কথা- "কেউ মারতি পারে না। ওরা মারা যায় না কোনদিন"- এ গল্পে স্থান পেলেও, শেষ পর্যন্ত গল্পকার আবহমান বাংলার পেশিবহুল কৃষকদেরকে খাল বিলের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে তাদের অসম সাহসিকতার কাহিনীই ছোট গল্পের উপাদানে সাজিয়ে শ্রেণী-চেতনার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। -'ওরা মরা যায় না' বলতে শোষণকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে শোষকদেরকে প্রতিহত করেইতো করমালিদের বেঁচে থাকতে হয়। "কেবল সে তার ভাগ্যকে নিয়তিকে তার সংগ্রামকে যে সংগ্রামে অন্ত নেই, উত্তেজনা নেই এবং যে সংগ্রামে বার বার পরাজয় এসে করমালির সাহস দেখে লজ্জা পায়। সেই সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করল"।(পৃ.ঐ)

এমন করেই বিল-করমালির জীবনের সাথে তার জন্মের আগে থেকে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে। দীঘল পুষ্ট ধলা বলদটার আকস্মিক মৃত্যু, নিষ্পাপ কিশোর বালকের অল্প বয়সে প্রাণ ত্যাগ এসব শোষক-শ্রেণীর শোষণের দৃষ্টান্ত। করমালিদের মত অনেক জীবন দলিত মথিত হয়েছে- ওই অশুভ শোষকের কর্তৃত্বপরায়ণ শক্তির কোপানলে পড়ে। এ শক্তি সহজেই কাবু করা যায় না। গল্পে আছে- "অসংখ্য সময়ের মধ্য দিয়ে অফুরান ভাবে চলে চলে যে বয়সের ভারে পৃথিবীর মত শক্তিশালী হয়ে গেছে।"(পৃ.২০০) করমালি এ শক্তির সাথে যুগ যুগ ধরে খাপ খাইয়ে আসছে। 'মাটির মত প্রবীণ'- শক্তিকে বিশেষভাবে সমীহ করে। কখনও বা বিমোহিত হয়ে যায়। এর যেন শেষ নেই। এ শক্তি যেন করমালির কাছে ঈশ্বরের মত দুর্জয়, রহমালির কাছে ব্যক্ত ও হয় সেভাবে-"তানারে দেহিসনি-উরে-কপাল। তানারে দেখিলিনে-আমার জমিতি রুধিষ্ঠান করিছে"। (পৃ.২০৩)

শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের মত বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে করমালিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হয়। সে প্রতিদ্বন্দ্বীকে, তার শ্রেণীশত্রুকে গ্রামের আরো অনেককে নিয়ে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সর্পরূপী সেই শক্তি করমালির প্রতিরোধ সংগ্রামকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়। সাপের লেজের অল্প কিছু অংশের কর্তন সেটাকে আরো বাস্তব করে তোলে। আমৃত্যু আজীবন এভাবেই মানুষকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়,

Dhaka University Institutional Repository

অপর শ্রেণীর সাথে দ্বন্দ্ব করে টিকে থাকতে হয়। ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করলে শ্রেণীশত্রু খতম করা সম্ভব। করমালিদের মত কৃষকদের সংগঠিত করবে কোন শ্রেণী? তারা তো বিত্তহীন। বৃত্তবানদের ঘেরা টোপও কটু কৌশল তো শকুনের মতো সোচ্চার। ছেলে রহমালির আশঙ্কা-"তোমার তো ট্যাহা নেই বাজান, ধলা দামড়াটা মরিছে-আর তো গরু কিনতি পারব না- এবারের ভাগ-চাষডা কি করে করা?- আমরা এবার মারা যাবানেরে বাজান-আচমকা চিৎকার করে করমালি, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়ায় আর আকণ্ঠ পিপাসার্তের মত ঠান্ডা পানির লোভেই যেন দুহাত বাড়িয়ে রহমালিকে বুকে টানে, মোডে মারা যাচ্ছি এবার- বর্ষাটা ক্যাবল শুরু হইছে, মালিক শোনবে গরু মরিছে, জমিগুলোন সব কেড়ে নেবেন। কাল একবার মালিকের বাড়ি যাতাম, ধান চাব কিছু। এ্যাহন জমি নিয়ে নেবেনে, ধান পাবনানে এক ছডাক।"(পৃ.২০৫) করমালির যাওয়া লাগেনি জমিওয়ালার বাড়ি। জমিওয়ালা নিজেই এসে বলল "এই হপ্তার মধ্যি আবাদ শুরু না হলি জমি আমি তোর কাছে রাখতি পারব না করমালি"। গল্পের শেষে দেখা যায়-করমালি-মালিকের কাছে তার সামান্য জমির দলিল রেখে বলদ কেনার টাকা নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে বৃষ্টির মধ্যে আকস্মিক বজ্রপাতে মারা যায়। শ্রেণী বৈষম্যের চিত্র গল্পের শেষেও দেখা যায়। "জমিডা ব্যাচবো পারবো না আমি। এটুকু জমিই আছে আমার-বেচলি থাকপে কি? ব্যাচপো না আমি। আপনে শতিনেক ট্যাহা দিয়ে রাখে দ্যান জমিডা। ফসল তাও আপনের। মাঘ মাসে ট্যাহা দিয়ে দলিল ফেরত নিয়ে নেবানে। লোকটা সব বুঝে বলল, ট্যাহা নিয়ে কি করবি? জমি দিলি আর কি টাহা শুধতি পারবি"? (পৃ.২০৪) সমালোচক আবু জাফরের মতে "আমৃত্যু আজীবন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই মানুষকে বাঁচবার, টিকে থাকবার চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু প্রকৃতির বৈনাশিক ঐ শক্তি করমালি ও রহমালির মতো মানুষের জীবনে আসে নানাভাবে-করমালির জীবনে সবশেষে এলো অশনির ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। করমালির শোকাবহ মৃত্যুর সঙ্গে তার জমির মালিকের নিষ্করুণ ব্যবহার এবং সেই কারণে সৃষ্ট শ্রেণীগত প্রতিযোগ ও স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। কিন্তু রহমালি-বাবার অকাল মৃত্যু ও মালিকের দুর্ব্যবহারে ভেঙ্গে পড়েনি। অন্ধ নিয়তির মতো বক্র কুটিল এবং মৃত্যু কঠোর এই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্যে সে ইস্পাত কঠিন প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকলো"।[২]

'পরবাসী' গল্পের পটভূমিকায় আছে দেশ-বিভাগজনিত হানাহানি, রক্তপাত। রাঢ়বঙ্গের সাঁওতাল অধ্যুচিত জনপদে হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়। মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান, হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান- এ মনোভাব জিঘাংসাকে বাড়িয়ে দেয়। বশির, ওয়াজদ্দিরা মুসলমান। তাদের হিন্দুস্থানে থাকার অধিকার সাম্প্রদায়িক ভেদ রেখায় নিষিদ্ধ। বশিরের চোখের সামনে ওয়াজদ্দি খুন হয়। বশিরের ছাব্বিশ বছরের মেয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। সাত বছরের শিশু ছেলে বল্লমের আগায় গাঁথা বীভৎস দৃশ্য বশিরকে দেখতে হয়েছে। তার আর স্থান নেই হিন্দুস্থানে।সে পাকিস্তানে যাবে। মুসলমানের দেশ পাকিস্তান হলেও ওয়াজদ্দির মনে দ্বন্দ্ব ঘণীভূত হয়।

---

২. হাসান আজিজুল হকের গল্পে সমাজ বাস্তবতা, প্রকাশ-১৯৯২,-ঢাকা। পৃষ্ঠা-১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

চারদিকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে। বশির স্মরণ করিয়ে দেয় ওয়াজদ্দিকে। "আচ্ছা লোক বটো বাপু তুমি-সারাটা দিন আজ খালি কানাকানি হলচে-একানে ফিশির ফিশির, ওকানে গুজুর গুজুর, তুমি কিছুই শোন নাই? পাকিস্তানে হিঁদুদের লিকিন্ একছার কাটচে- কলকাতায় তেমনি কাটচে মোচলমানদের" ।(পৃ.১৪৪) বশিরের মনে সাম্প্রদায়িক বোধের জন্ম নিলেও ওয়াজদ্দি নিজের জন্মস্থান ছাড়তে মোটেই রাজী নয়। বশিরের মনে অনেক প্রশ্ন উঁকি দেয়। সে নিজের মনে বলে-"হাজার হলেও পাকিস্তানটো মুসলমানদের দ্যাশ, সিখানে মোচলমানদের রাজত্বি" ।(পৃ.১৪৫) ওয়াজদ্দি ক্ষেপে যায়।- "তাইলে পাকিস্তানে যাস নাই ক্যানে"? বশির আফসোস করে বলে- "আমাদের কি সায়োস হয় হয় চাচা ঘর সংসার লিয়ে কোতাও যেতে? তবু দ্যাশটা। ওয়াজদ্দি আর আবেগ চেপে রাখতে পারে না। দেশমাতৃকার প্রতি প্রবল টান রয়েছে তার। চোখে মুখে রাগের বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়ে সে বলে-"তোর বাপ কটো? এ্যাঁ-কটো বাপ? মা কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো। বুইলি"? (পৃ.ঐ)

এ গল্পে সাধারণ মানুষের দেশপ্রেম চিহ্নিত হবার পাশাপাশি দেশ বিভাগে জড়িত কর্তা ব্যক্তিদের প্রতি বশির ওয়াজদ্দির মতো খেটে খাওয়া কৃষকদের অসন্তোষ ও দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানে চলে আসলেই ওয়াজদ্দিদের মুক্তি মিলে গেল তা নয়। নাড়ির টান রয়েছে তাদের। দেশ প্রেমের প্রবল আকর্ষণও তারা এড়াতে পারবে না। শেষে জীবন দিয়ে সে সত্যই প্রমাণ করল ওয়াজদ্দি। ওয়াজদ্দির মৃত্যুর পরে বশিরের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। বশির প্রাণরক্ষার জন্য পাকিস্তানের দিকে ধাবিত হয়। ধুতি পরা হিন্দু লোককে হত্যা করার মধ্য দিয়ে সে তার জিঘাংসাবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। এ হত্যা বশিরের মনের দ্বন্দ্ব জিজ্ঞসাকে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে সহায়তা করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন কর্তৃক ওয়াজদ্দির পরিবারের হত্যা ও বশির কর্তৃক ধুতি পরা হিন্দু লোককে হত্যা করার প্রসঙ্গ শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব ও ব্যবধানকেই ইঙ্গিত করেছেন গল্পকার। বশিরের স্মৃতিতে এ চেতনা আরো বেগবান হয়েছে এভাবে-"বাড়িটা ততক্ষণে পুড়ে শেষ। ওরা চলে গেছে। বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের সাত বছরের ছেলেটা। ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ কালো একখন্ড পোড়া কাঠের মত পড়ে আছে ভাঙা দগ্ধ ঘরে। কাঁচা মাংস-পোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারি" । (পৃ.১৪৫-৪৬)

বশিরের বুকফাটা চিৎকার এ গল্পে দ্বন্দ্বের বহি:প্রকাশ ঘটাতে সহায়তা করেছে। "আল্লা তুযি থাকিস মানুষের দ্যাহোটার মধ্যি ----- কোতা, কোতা থাকিস তু, কুনখানে থাকিস বল" । (পৃ.১৪৬) গল্পের শেষে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। "এক সঙ্গে দুটি টর্চের আলো পড়ে, বশিরের মুখে একটি আর একটি মৃত্যু যন্ত্রণা খিন্ন হতবাক সেই মুখের ওপর। আলো সরে গেলে বশির দেখল সেই মুখ ঠিক যেন ওয়াজদ্দির মুখ-রক্তাক্ত, বীভৎস, তেমনিই অবাক। চোখের ওপর থেকে ধোঁয়াটে পরদাটা যেন সরে গেল, আর তার চোখের পানিতে ধূসর হয়ে এলো দুটি পৃথিবী-যাকে ছেড়ে এলো এবং যেখানে সে যাচ্ছে"। (পৃ.১৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময় রচিত বাংলা ছোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রতিফলন অনুসন্ধান করা- এ গবেষণার লক্ষ্য। ১৯৪৭ সালে বর্তমান বাংলাদেশ পকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এদেশের জনগণের পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে উচ্চাশা ছিল কিন্তু অচিরেই তাদের আশা হতাশায় পরিণত হয়। তারা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলাকে শুধু তাদের শোষণের ক্ষেত্র হিশেবে গ্রহণ করছে না বরং পূর্ববাংলার সকল প্রকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তারা পদদলিত করতে চাচ্ছে। গণতান্ত্রিক বৈশিষ্টকেও তারা আমল দিচ্ছেনা। এর ফলে হতাশাগ্রস্থ জাতি পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ১৯৭১ সালে সশস্ত্র সাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করে। মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে এত বড় পরিবর্তন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সেকালে রচিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার প্রতিফলন রয়েছে। সুতরাং আমাদের গবেষণার সময়সীমা ১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করতে গিয়ে একটি দীর্ঘ প্রেক্ষাপট বিচার করতে হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে অতিসংক্ষেপে বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশের পরিচিতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে শ্রেণীচেতনার প্রতিফলন আমরা অনুসরণ করেছি। দেখাগেছে সব যুগের সাহিত্যে শ্রেনীচেতনা- অল্পবিস্তর প্রতিফলন রয়েছে। আমরা প্রতিনিধিত্বশীল রচনা হিশাবে চর্যাপদ, শূন্যপূরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চন্ডি মঙ্গল , ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও মৈমনসিংহগীতিকার কোথাও কোথাও শ্রেণীচেতনা ও শ্রেনীদ্বন্দ্বের প্রকাশ খুজে পেয়েছি। আধুনিকযুগের সাহিত্যেও তার উদাহরণ পাওয়া গেছে। নমুনা হিশাবে কয়েকটি বাংলা প্রহসন, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধসাহিত্য এবং কবিতার উল্লেখ করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা অনুসন্ধান করেছি, বাংলা চোটগল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহ্য, সেখানে উদাহরণ হিশাবে উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেনচন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গল্পকারদের শ্রেণীচেতনামূলক গল্প।

চতুর্থ অধ্যায়ে মুল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সময়ে অনেক ছোটগল্পকার আবিভূর্ত হলেও গুরুত্বের বিচারে ছয়জনকে বাছাই করা হয়েছে। তারা হলেন সৈয়দওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, সরদার জয়েনউদ্দীন, আবুইসহাক, আলাউদ্দীন আল আজাদ, হাসান আজিজুল হক।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অত্যন্ত বড় মাপের একজন কথাসাহিত্যিক। ঔপন্যাসিক হিশাবে তিনি যত পরিচিত ছোটগল্পকার হিশাবে তেমন নন। তাঁর দুটি গল্প সংকলন আছে- 'নয়নচারা'

Dhaka University Institutional Repository

এবং 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প', প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল-১৯৪৬ সালে সেজন্যে আমাদের আলোচনায় আসেনা। দ্বিতীয় বইটিতে নয়টি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করেছি দুইতীর, একটি তুলসীগাছের কাহিনী, কেরায়া, পাগড়ি ও মালেকা - গল্পগুলো।

'দুইতীর' গল্পে উচ্চবিত্ত পরিবারের হাসিনা ও নিম্নবিত্ত থেকে উঠে আসা আফসারউদ্দিনের দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়নে শেণীদ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। একটি তুলসী, গাছের কাহিনী- ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পটভূমিতে রচিত। দেখা গেছে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রেরণায় একদল নিম্নবিত্তের সরকারী চাকুরে ঢাকায় এসে একটি পরিত্যক্ত বাড়ী দখল করেছিলেন। অচিরেই সরকার তাদেরকে সে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। ইসলামী সাম্যবাদে বিশ্বাসী এ সরকারও যে মূলত উচ্চবিত্তের অনুসারী এবং মুসলমান হলেও নিম্নবিত্তরা যে তাদের কাছে সমান মর্যাদার অধিকারী নয়, সেই শ্রেণীবোধ রূপ লাভ করেছে। 'কেরায়া' গল্পে আছে মহাজন এবং মাঝিমাল্লার দ্বন্দ্বের কাহিনী। তারা দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি। 'পাগড়ি' গল্পে শোষকশ্রেণীর খানবাহাদুর এবং শেষিত পাগলি স্ত্রীর দ্বন্দ্ব রূপলাভ করেছে। 'মালেকা' গল্পের বিষয় হলো স্কুল শিক্ষিকার সঙ্গে প্রধান শিক্ষয়িত্রির দ্বন্দ্ব এবং তাদের সাঙ্গে স্কুলপরিদর্শনে নিয়োজিত ব্যক্তির দ্বন্দ্ব।

শওকতওসমান রচনা করেছেন শতাধিক ছোটগল্প সেগুলোর মধ্যে শ্রেণী-চেতনাও শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখা গেছে- উদবৃত্ত, থুতু, ইলেম, পিঁজরাপোল, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস, হিংসাধার, বালকের মুখ, চিড়িয়া, সৌদামিনীমালো, নেমকহালাল, প্রাইজ, ইতা টিফিন, সাদাইমারত, দুই চোখ কানা, বকেয়া ও ভাগাড় গল্পে।

উদবৃত্ত গল্পে অভারের তাড়নায় অমিরণের দেহপসারিণীর কাজ করা ও রাষ্ট্রীয় উদাসীনতায় দুর্ভিক্ষের ভয়বহতার বিস্তার ও তদজনিত হতাশা ও ক্ষোভ শ্রেণীচেতনাকে ইঙ্গিত দেয়। "থুতু" গল্পে খাবারে থাইসিসের জীবানু মাখা থুথু দিয়ে উচ্চশ্রেণীর প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা- শ্রেণীদ্বন্দ্বের কারণেই ঘটেছে। ইলেম- গল্পে কাস্টমস কর্মকর্তাদের ঘুষ গ্রহনের জন্য সাম্পান চালক জহির মিয়া তার ছেলেকে ইলেম শিক্ষা থেকে বিরত রেখে, বইপত্র ছুড়ে ফেলে দেয়ার মাঝে শ্রেণীদ্বন্দ্ব মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'প্রাইজ' গল্পে ভিখারী সাজার প্রতিযোগিতা চলছে ধনী ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। অল্পবয়স্ক এক ভিখারীরছেলে কিছুনা বুঝেই সেখানে প্রবেশ করেছে। ছেলেটার পরিচয় জানার পর-চড় থাপ্পড় মেরে ভিখারী ছেলেটার বের করে দেয়ার মধ্যে-শ্রেণীচেতনার উল্লেখ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

'দুইচোখকানা' গল্পে- কারখানার কর্মচারীদের বেতন ভাড়া বাড়ানোর দাবি ও গল্পে উল্লেখিত 'মুনশীর-কারখানা থেকে ছাটাই করে দেয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ, শ্রেণীদ্বন্দ্বের আবহ সৃষ্টি করেছে।

'বকেয়া' গল্পে- পাঁচুর মেয়ে টুনির- খাদ্যও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু-হয়। পাঁচুকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেছে জমিদার। মৃত্যুর পরে লাশ কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেয় পাঁচু। জমিদার বাবুর খাস পুষ্করিণীতে সাদাকাপড়ে আবৃত টুনির মৃতদেহ দেখে, জমিদার নায়েবকে নির্দেশ দিলেন- পাঁচশো কাঙালী ভোজন ও সাতগ্রামের ব্রাহ্মন যোগাড় করতে। গল্পকার ব্যঙ্গের মাধ্যমে, শ্রেণীচেতনাকে তুলে ধরেছেন।

'ভাগাড়' গল্পে বিত্তবান শ্রেনীর ভুমিকায় আছে মনসবআলী, তার দোসর তহশীলদার। ক্ষুধা দারিদ্র্যে অনেক লোক মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে- তারাও তো কম নয়। মনসব আলির ভয় হয় সেজন্যে। শোষণ জুলুম ঢাকা দিতে আল্লাহর-রাহে গরু কোরবানী করে অভাবগ্রস্থ মানুষদের কে খাওয়ানোর বিশাল আয়োজন করে। জনগণ সে গোশত না নিয়ে সব ভাগাড়ে ফেলে দেয়। তারা কটাক্ষ করে বলে- 'হুজুর গুশত খাইতে বা'ত লাগে' এ কথাটির মধ্যে ও শ্রেণীদ্বান্দ্বিক আবহের সৃষ্টি হয়েছে।

সরদার জয়েনউদ্দীনের ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে ৬ টি গল্প: করালী' কাজী মাস্টার, সবজানের সংসার, বকসো আলী পন্ডিত ও তালাক। 'করালী'- গল্পে জমিদারের বিরুদ্ধে ক্ষেত মজুরদের প্রতিবাদ শ্রেণীদ্বন্দ্বের নামান্তর। 'কাজীমাষ্টার' গল্পে কাজী মাস্টারের সাথে গনিমন্ডলের দ্বন্দ্ব-প্রসারিত হয়েছে পাঠশালা প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। 'সবজানেরসংসার' গল্পে আছে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের সাথে সবজান ও তাঁর স্বামীর বেঁচে থাকার লড়াই সংগ্রাম। শেষে সবজান প্রেসিডেন্টের লালসার শিকারে পতিত হলেও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য ঠিকই বহাল রয়েছে। 'বকসোআলী পন্ডিত' গল্পে ৩। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ ও সোভিয়েত রাশিয়ার জার শাসনের উল্লেখ শ্রেণী চেতনাকে ইঙ্গিত দেয়। 'তালাক' গল্পে নূরজাহানের উপর তাঁর স্বামী হাশেম মৌলভীর অত্যাচার করে, বিশেষ করে ধর্মের নামে মৌলভী নূরজাহানকে পুরুষ ডাক্তরের কাছে চিকিৎসা করতে দিতে রাজি নয়। নূরজাহান বেপরোয়া হয়ে, সকল বাধা অতিক্রম করে জীবনে বেঁচেথাকার আসায় দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে করে বলে- 'আমি যাবই'। এখানে শ্রেণীসংগ্রাম চিহ্নিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাকের গল্প থেকে নেয়া হয়েছে- বিস্ফোরণ, খুঁতি, জোক, ও উত্তরণ গল্প।

'বিস্ফোরণ'- গল্পে- অতাউল্লাহ খাঁ নামের বড়ব্যবসায়ীর সাথে মাঝি ইয়াসিন ও তার স্ত্রী পরিবানুর মধ্যে দ্বন্দ্বে গল্পের কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে। শেষে দেখাযায় ইয়াছিন আতাউল্লা খাঁর বুকের উপর চেপে বসেছে স্ত্রী পরিবানুর ইজ্জত রক্ষা করতে। এটাও শ্রেণী সংগ্রামকে ইঙ্গিত দেয়। 'জোঁক' গল্পে শ্রেণীচেতনা বর্ণিত হয়েছে ক্ষেতমজুর ওসমানের সাথে মহাজনের। ক্ষুধা-দারিদ্র্য সহ্য করে ওসমানদের মত কৃষকরা পাট চাষ করে, আর ফল ভোগ করে জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরীরা। পাট কাটার সময় ওসমানের পায়ে জোঁক দেখে তার ছেলে তোতা শিহরে উঠলে, ওসমান ওই মানুষরূপী জোঁকগুলোকে বড়জোঁক বলে। এখানে শ্রেণীচেতনা প্রকাশ পেয়েছে। করিমখাজী, নবুখাঁ সহ চাষীরা- জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরীর বিরুদ্ধ সংগঠিত হয়। তারা প্রতিবাদ করে বলে- 'হ. চল। রক্ত চুইষা খাইছে। অজম করতে দিমুনা, যা থাকে কপালে'- এ কাথার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম উচ্চকিত হয়েছে।

আকবর সাহেবের সাথে পুত্র আফজালের দ্বন্দ্বে রচিত হয়েছে 'খুতি' গল্প। আকবর সাহেব যে কোন উপায়ে ধন দৌলত বাড়াতে চায়। এজন্য সে সুদ গ্রহণ করতেও পিছপা হয় না। সে ভাবে ছেলে থানার বড় দারোগা। বিত্ত- বৈভবের প্রাচুর্য থাকবে ছেলের ঘরে। কিন্তু ছেলেকে পিতার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান নিতে দেখা যায়। এখানে দ্বন্দ্বঘনীভূত হয়েছে ছোট দারোগার বাড়ীতে জনৈক ব্যক্তির বড় চিতল মাছ আনা প্রসঙ্গে। আকবর সাহেব ভেবেছিল চিতল মাছটা তাঁর ছেলে বাসায় আসবে।

আলাউদ্দীন আলআজাদের গল্পের সংখ্যা একশত বিশটি তার মধ্য থেকে কাঠের নকশা, কয়লা কুড়ানো দল, শিষ ফোটার গান, মহামুহূর্ত, ধোঁয়া, মোচড়, চেহারা, জবানবন্দী, মাঝি, চারগুন্ড, ধানকন্যা, ছায়ামৃগ, সুন্দরী সুন্দরী, সৃষ্টি প্রভৃতি গল্পের আলোচনা করা হয়েছে।

'কাঠের নকশা গল্পে আছে নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানোর আন্দোলন। পরিণতিতে রাজমিস্ত্রির জেলে যেতে হলো । এদের মধ্যে রহমান ওস্তাগার রাতারাতি ধনী হবার জন্যে উপরওয়ালার সাথে হাত মিলালেও রাজমিস্ত্রীদের আরেক দল মজুরী বাড়ানোর আন্দোলনে সংগঠিত হয়।

'কয়লা কুড়ানো দল' গল্পে রেলস্টেশনের পাশে পড়ে থাকা কয়লা কুড়িয়ে হোটেলে যোগান দিয়ে মনু, লালু, গেদুদের দিন কাটে। সুবেদালী কনস্টেবলের সাথে স্টেশন মাস্টারের দ্বন্দ্ব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কনেস্টবল প্রথম দিকে মনু, লালু, গেদুদের, কাছ থেকে জোরপূর্বক কয়লার দাম আদায় করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের কাতারে ভিড়ে গিয়ে স্টেশনমাস্টারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

'শিষফোটার গান' গল্পে শ্রেণীচেতনা ফুটে উঠেছে মিঞাবাড়ীর বিরুদ্ধে চাষিদের পঞ্চায়েত করে সংগঠিত হয়ে খামারের ধান পাহারা দেয়ার মধ্যে। মজিদ, মুনছুর আলীরা ধানের শীষ ফোটার আনন্দে আত্মহারা । ধানের নায্য দাবী আদায় করতেও তারা প্রস্তুত হয়ে গেছে।

বর্গা কিষাণদের সাথে জোতদারের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত হয়েছে মুহামুহূর্ত গল্পটি। এলাকার জমির একচেটিয়া মালিক জোতদার। এবার নাকি ধানের ভাগ দেবেনা কৃষকদের। কৃষকরা দা, সড়কি নিয়ে দাড়িয়ে যায় জোতদারের ভাড়াটে পুলিশ ও লাঠিয়াল বাহিনীর বিরুদ্ধে। লেঠেল সর্দারের মনে অনুভূতি জাগে সে তো গরীব চাষীদের দলে । আবশেষে সে গরিব চাষীদের পক্ষে দাড়িয়ে মহামুহূর্তের জন্মদিল।

ধোঁয়া গল্পে পাহাড়ী এলাকায় চাকুরিরত অবিদের কালী নামের পাহাড়ী মেয়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কালী অধিকার নিয়ে আবিদের বাংলোয় গিয়ে হাজির হয়। আবিদ কালীকে অস্বীকার করে তাঁর স্ত্রীর সামনে। কালী নির্ভীকচিত্তে- বলে তার গর্ভে আবিদের সন্তান আছে। কুলি মজুররাও কালীর সাথে এসে প্রতিবাদ জানায়। আবিদের স্ত্রী রাহেলা সব বুঝতে পারে। সারিবদ্ধ কুলি মজুরদের সামনে আবিদ কাঁপতে থাকে।

আহসান নামের মেধাবী ছাত্রের সংগ্রামী জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে 'চেহারা' গল্প। এক বাল্য বন্ধুর সাথে অনেক দিন পর দেখা হয় তার। আহসানের চেহারা দেখে প্রথম চিনতে পারেনি বাল্য বন্ধুটি। পরে বন্ধুর মেসে এসে জানতে পারে কিসের আদর্শে আহসানের এমন অবস্থা। আহসান জনমানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে।

'মাঝি' গল্পে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রমান মেলে - জহর আলী মাঝির জাহের ভূইয়ার উপর প্রতিশোধ নেয়ার ঘটনায়। জহরআলী মাঝি নৌকা পারাপারের ন্যায্য ভাড়া নিতে গিয়ে জুতোপেটা খেয়েছিল জাহের ভূঁইয়ার কাছে। মাঝি প্রতিশোধের অপেক্ষায় ছিল। সুযোগ পেয়ে জাহের ভুঁইয়াকে জুতা পেটা করল।

'চারগুন্ডা'-গল্প রচিত হয়েছে চারজন গুন্ডাকে নিয়ে। গুন্ডামী করে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। ওদের মধ্যে ইবু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে তাঁতবুনার কাজ করে। কালোবাজারীর কারণে সূতার যোগান বন্ধ হয়ে গেলে তাঁতীরা বিপদে পড়ে। ইবুসহ চারগুন্ডা গুদাম ঘরের তালা

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙ্গে। তাতীরা তাদের সুতার দাবীতে সমবেত হয়। পরের দিন পত্রিকায় গুদাম লুণ্ঠনের সংবাদ ছাপা হয়।

'ধান কন্যা' গল্পে বৈষম্যের শিকার ফরিদ। তার বাবা শেখ জমির, দেওয়ান সাহেবের গালে থাপ্পড় মেরেছিল। দেওয়ান সাহেব সেকথা ভোলেনি। সুদও ঋণের জালে ফরিদকে জড়িয়ে ফেলে। তহশীলদার দেওয়ানের পক্ষে কাজ করলে ফরিদ তহশিলদারের সাথে সংঘর্ষে অবতীর্ন হয়। পরিণামে জেলে যেতে হয় তাকে। তার স্ত্রী কনকতারা গলায় ফাঁস নিয়ে মরে যায়। এসব ঘটনা শ্রেণীদ্বন্দ্বের সূত্রে গাঁথা।

'ছায়া মৃগ' গল্পে আপন ভাইকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। ওসমান নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে নূরজাহানের কাছে গোপন করেছে ওসমান নিজের আর্থিক দুরবস্থাকে। রেডিওতে স্থায়ী চাকরি, কলোনীতে বাসা, এখন ওসমান অনেক উপরের লোক। তার ছোট ভাই- বাসায় থেকে পড়তে চাইলে- ওসমান অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ছোট ভাই হাশমত ভাষা আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক। বড় ভাই ওসমানকে ও তাঁর অধিকারে কথা জানিয়ে দেয় সে।

'সুন্দরী: সুন্দরী'-গল্পে বিধবা মাহিলার সংগ্রামী জীবনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুন্দরীর স্বামী মারা যাবার পরে জীবন যুদ্ধে থেমে থাকেনি সুন্দরী। অনেকে সুন্দরীকে ব্যবহার করতে গিয়ে ও ব্যর্থ হয়েছে। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিশাবে কাছারী ঘরে আগুন দেয়ার ঘটনায়- দারোগা তদন্ত করতে এলে সুন্দরী নিজেই দোষ স্বীকার করে। যদিও আয়নদ্দি সবদারালিরা আগুন দিয়েছিলো কাছারি ঘরে।

'সৃষ্টি' গল্পে- মাহমুদ পন্ডিতের আদর্শের সংগ্রাম চিহ্নিত হয়েছে। সংসারের ঘানিটেনে শরীরে ক্লান্তিরছাপ পড়লেও শিক্ষাবিস্তারের সোনালী স্বপ্নে পন্ডিত বিভোর। বাধা হয়ে দাঁড়ায় কাশেমালী চৌধুরী। পন্ডিতের স্কুল বন্ধ করে সে জায়গায় কারখানা খুলতে চায় কাশেমালী। পন্ডিত বাধা দিতে গেলে কাশেমালী পন্ডিতের মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়। পন্ডিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও আদর্শের বাণী আওড়াতে থাকে। - 'কিন্তু এখানে বড় বেদনা। আমার বেদনা তোমাদের বেদনা হয়ে উঠুক এই আমি চাই। আর কিছু না।'

Dhaka University Institutional Repository

হাসান আজিজুল হকের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ১২টি আমাদের গবেষণার সময়সীমার মধ্যে পড়ে- 'সমুদ্রেরস্বপ্ন শীতেরঅরণ্য'[১] ও আত্নজা ও একটি করবী গাছ[২]। এ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্য থেকে-গুরুত্ববিচারে আত্নজা ও একটি করবী গাছ, শুকুন, আমৃত্যু- আজীবন, পরবাসী ও খাঁচা- গল্পের আলোচনা করা হয়েছে।

আত্নজা ও একটি করবী গাছ- ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পটভুমিতে রচিত। দাঙ্গা কবলিত ভারতের একজনপদ থেকে প্রাণ- নিয়ে পালিয়ে আসা এক বৃদ্ধের জীবনের দু:খ দুর্দশার কাহিনী বর্নিত হয়েছে এ গল্পে। মুসলিমলীগ, কংগ্রেসের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আদূরদর্শিতা ও ব্রিটিশ বেনিয়াদের কুটকৌশলের কারণে সাধারণ মানুষের জীবন যে কত দুর্বিসহ হয়েছিল তা অনুমান করা যায় বৃদ্ধ কর্তৃক বিষবৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে কন্যাকে বখাটে ছেলেদের হাতে তুলে দিয়ে আক্ষেপ করে বলছে- এখানে যখন সে আসে তখন- একটি করবী গাছ লাগিয়েছিল, করবী গাছের ফল থেকে বিষ পাবার আশায়। নিজের মেয়েকে বখাটেদের হাতে তুলে দেয়া বিষ পান করার চেয়ে তো কম নয়। এখানে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়েছে বৃদ্ধের স্বগতোক্তিতে।

প্রতীকাশ্রয়ী আবহের মাধ্যমে 'শকুন' গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে। সুদখোরদেরকে শকুনের রূপকে উপস্থাপন করা হয়েছে গল্পে। মৃত- শকুনীর পাশে - মৃত মানব শিশুর উপস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কুৎসিত দিকের ইঙ্গিত দেয়। শকুন যেমন ভাগাড়ে মড়ার লোভে পড়ে থাকে, সমাজের বিত্তবানরাও শকুনের মত অর্থলোলুপ হয়ে গেছে। অত্যাচার অনাচারের চরমসীমায় পৌছে গেছে। শকুনের সাথে সুদখোর মহাজনের চেহারার মিল আছে বলে ছেলেদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। এ সবকিছুই যে বৈষম্যের সূতায় গাঁথা সেটার ইঙ্গিত আছে গল্পে।

'আমৃত্যু - আজীবন'- গল্পে সাপরূপী শোষকের লালসাবৃত্তি একজন কৃষকের জীবনকে কিভাবে গ্রাস করে, তার উদাহরণ আছে। করমালির সামান্য জমি আছে। স্ত্রী ও ছেলে রহমানকে নিয়ে-জমিভাগে করে দিনযাপন করে কোনোরকমে। করমালিদের পূর্ব পুরুষের জীবনেও ওই গোখরো সাপের অস্তিত্ব ছিল। সাপের সঙ্গে- যুদ্ধ করেই করমালিরা বেঁচে থাকে। সাপের কামড়ে হালের বলদের মৃত্যু হলে- জমির মালিক অজুহাত দিয়ে জমি কেড়ে নিলে করমালির আকস্মিক মৃত্যু হয়। তারপরও চলছে রহমালিদের জীবন সংগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

'পরবাসী' গল্প হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে রচিত। দেশ ভাগ হয়ে গেছে। হিন্দুরা থাকবে হিন্দুস্থানে আর মুসলমানেরা পাকিস্তানে। বশির ওয়াজদ্দিরা মুসলমান, অতএব তাদের যেতে হবে পাকিস্তানে। কিন্তু তারা সেটা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। আর চোখের সামনে ওয়াজদ্দির খুন হওয়া, ছাব্বিশ বছরের মেয়ের আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া এবং সাত বছরের শিশুর বল্লমের আগায় গাঁথা দেখে বশির উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এক হিন্দুকে হত্যা করে সে পাকিস্তানের দিকে ধাবিত হয়। আপাত দৃষ্টিতে গল্পটি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ বলে মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে শ্রেণীদ্বন্দ্বই বিকৃত হয়ে সাম্প্রদায়িতকার রূপ নিয়েছে। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ছিল না; সেটা ছিল হিন্দু জমিদার-মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্তির জন্যে শোষিত নিঃস্ব ও দরিদ্র মুসলমানের লড়াই। এই মৌলিক দ্বন্দ্বটি মতলববাজ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কারসাজিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক. আলোচিত মূলরচনা সমূহ

এক. সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ঃ ১৯৮৭)

নয়নচারাঃ নয়নচারা, জাহাজী, পবাজয়, মৃত্যুযাত্রা, খুনী, খন্ডচাঁদেরবক্রতায়, সেই পৃথিবী, দুইতীর ও অন্যান্য গল্প: দুইতীর, একটি তুলসীগাছের কাহিনী, পাগড়ি, কেরায়া, নিষফল জীবন নিষ্ফলযাত্রা, গ্রীষ্মের ছুটি, মালেকা, স্তন, মতিনউদ্দিনের প্রেম।

দুই. সরদার জয়েন উদ্দীন

১. বীর কষ্ঠীর বিয়ে, (ঢাকা: ১৯৫৫)

২. নয়ানঢুলী- (টাকা: ১৩৫৯)

৩. খরস্রোত (ঢাকা: ১৩৬২)

৪. অষ্টপ্রহর (ঢাকা: ১৩৭৭)

৫. বেনা বেনাজীর প্রেম- (ঢাকা: ১৩৮০)

তিন. শওকত ওসমান- গ্রল্প সমগ্র, সময় প্রকাশন। (ঢাকা: ২০০৩)

চার. আবু ইসহাক

১. হারেম, মুক্তধারা, (ঢাকা: ১৯৮৭)

২. মহাপতঙ্গ (ঢাকা: ১৯৬৩)

পাঁচ. আলাউদ্দীন আল আজাদ

১. জেগে আছি, মুক্তধারা, (ঢাকা: ১৯৭৪)

২. যখন সৈকত, বইঘর, (চট্টগ্রাম: ১৩৭৪)

৩. ধান কন্যা: (ঢাকা: ১৯৫১)

৪. মৃগনাভি (ঢাকা: ১৯৫৩)

৫. উজান তরঙ্গে (ঢাকা: ১৯৬২)

৬. যখন সৈকত (ঢাকা: ১৯৬৭)

৭. শ্রেষ্ঠগল্প (ঢাকা: ১৯৮৭)

ছয়. হাসান আজিজুল হক

১. রচনা সংগ্রহ (তিন খন্ডে সমগ্র গল্প) জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন। (ঢাকা: ২০০২)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ : সহায়ক গ্রন্থ

১.অরবিন্দ পোদ্দারঃ মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, ৩য় মুদ্রণ, উচ্চারণ, (কলকাতাঃ ১৯৮১)।

২.অনীক মাহমুদঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, বাংলা একাডেমী, (ঢাকাঃ ১৯৯৫)।

৩.আহমদ কবিরঃ সরদার জয়েনউদ্দীন (জীবনী গ্রন্থ) ১ম সং (বাংলা একাডেমীঃ ১৯৮৯)।

৪.কার্লমার্কসঃ পুঁজি, ১ম খন্ড ১ম অংশ প্রগতি প্রকাশন, (মস্কোঃ১৯৮৮)।

৫.কাজী নজরুল ইসলামঃ নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, (ঢাকাঃ১৯৭৩)।

৬.জীবেন্দ্র সিংহ রায়ঃ কল্লোলের কাল, কথা শিল্প, (কলকাতাঃ১৯৭৩)।

৭.ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত)ঃ কাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা (কলকাতাঃ১৯৯২)।

৮.বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, (ঢাকাঃ১৯৮০)।

৯.বংলাদেশের ছোটগল্প (১ম খন্ড) লেখক পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, (ঢাকাঃ১৯৭৯)।

১০. বদরুদ্দীন উমরঃ ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (চট্রগ্রামঃ১৯৮০)।

১১.বাংলা বিশ্ব কোষ, (২য় খন্ড), মুক্তধারা (ঢাকাঃ১৯৭৫)।

১২. ভ.ই লেনিনঃ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য প্রসঙ্গে (মস্কোঃ১৯৭৩)।

১৩. মোল্লা এবাদত হোসেনঃ চর্যাপরিচিতি, (রাজশাহীঃ১৯৭০)।

১৪. রনেশদাশগুপ্ত, আয়াত দৃষ্টিতে আয়াতরুপ, (ঢাকাঃ১৯৮৬)।

১৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী(ঢাকাঃ১৯৯১)।

১৬. বাংলা একাডেমী চরিতভিধান, বাংলা একাডেমী, (ঢাকাঃ১৯৯৭)।

১৭. শামসুজ্জামান খান ও সেলীনা হোসেন সম্পাদিতঃ চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, (ঢাকাঃ১৯৮৫)।

১৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ- জীবন ও সাহিত্য,সৈয়দ আবুল মকসুদ (ঢাকাঃ১৯৮১)।

১৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শ্রেণী সময়ও সাহিত্য, (ঢাকাঃ১৯৮৬)।

২০. সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী (ঢাকাঃ১৯৮৫)।

২১. সুকুমারসেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (কলকাতাঃ১৯৭৬)।

২২. সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা (ঢাকাঃ১৯৮৬-।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. সমরসেনঃ কয়েকটি কবিতা, অনুষ্টুপ, (কলকাতাঃ১৯৮৯)।

২৪. সুকান্ত ভট্টাচার্যঃ সুকান্ত-সমগ্র, (কলকাতাঃ১৩৯৫)।

২৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা (কলকাতাঃ১৯৫৭)।

২৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ, (১ম খন্ড) ২য় সং, (কলকাতাঃ১৩৮৭)।

২৭. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ (কলকাতাঃ১৯৮২)।

২৮. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ (কলকাতাঃ১৯৮৮)।

২৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা উপন্যাসঃ দ্বান্দ্বিকদর্পন, (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীঃ১৯৯৩)।

৩০. সৈয়দ আজিজুলহক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প; সমাজ চেতনা ও জীবনের রূপায়ণ ।বাংলা একাডেমী, (ঢাকাঃ১৯৯৮)।

৩১. ডঃ সরোজমোহন মিত্র। বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প (কলকাতাঃ১৯৯৭)।

৩২. ধনঞ্জয় দাশ, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (কলকাতাঃ১৯৭৫)।

৩৩. বিশ্বজিত ঘোষ সম্পাদিত :সোমেন চন্দ রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, (ঢাকাঃ১৯৯২)।

34. Marx, karl : Theories of surplus Value, Part-1, Moscow, 1975.

35. Marx, karl and Engels,Friedrich: on literature and art , Moscow,1975.

36. Kelle, V. and Kovalson, M. Historical Materialism and outline Marxist theory of society, Moscow:1973.

প্রবন্ধ

১. রবীন্দ্র ছোটগল্পের আঙ্গিক পর্যালোচনা: আনোয়ার পাশা, পঞ্চদশবর্ষ; চুর্তথ সংখ্যা বাংলা একাডেমী পত্রিকা ।(ঢাকাঃ১৩৭৭)।

২. বাংলাদেশী গল্পগ্রন্থ: জেগে আছি। এস. এম. লুতফর রহমান ।সপ্তবিংশ বর্ষঃ দ্বিতীয় সংখ্যা। বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকাঃ১৩৮৯)।

৩. রবীন্দ্র ছোটগল্পে চরিত্র-চিত্রণ ও বাস্তবতা বোধ-অনিক মাহমুদ। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা। (ঢাকাঃ১৯৮৯)।

4. বাংলা ছোটগল্প ও রবীন্দ্রনাথ : মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া। পন্ঞ্চমবর্ষঃ বার্ষিক সংখ্যা, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা (ঢাকাঃ১৩৮৪)।